রিক্সার গান

রিক্শার গান

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

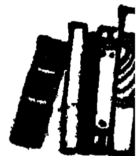
প্রথম সংস্করণ :
৭ই কার্তিক,
১৮৮১ শকাব্দ

পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়
ক্যাশ প্রেস,
৩৩ বি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা ৬



উৎসর্গ

"রিক্‌শার গান"

হাওড়া রামকৃষ্ণপুর নিবাসী আমার অনুজোপম

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

হাতে সমর্পণ করলাম।

ব. ভ. ম.



অখিল ঘোষকে চিন্তিতভাবে চুপ করে থাকতে দেখে বলল—"অবশ্য, আপনার যা পাওনা…"

উত্তর হোল—"আমি সেই ভয়ই করছিলাম। মস্ত বড় দয়া দেখাচ্ছি বলছেন, আপনিও আবার উল্‌টে দয়া না দেখান।"

তড়িৎ একটু ধাঁধা খেয়ে গিয়ে বলল—"বুঝলাম না তো।"

"পাওনার বেশিই দিতে চাইছেন তো—সে সব দিনে অত পাওনা যে হবেই না।"

হেসে উঠল তড়িৎ; বলল—"তা বেশ, হিসেবমতো পাওনার চেয়ে কমই নেবেন সেদিন।"

একটু থেমে বলল—"আমার সাধ্যি কি এ-জন্মে দয়া দিয়ে আপনার দয়া শোধ করি? আপনি আজ যা…"

চাপা দিয়ে দিলেন অখিল ঘোষ; বললেন—"আগে দেখুন অত দয়ার ভার সইবে কিনা। ঐ রিক্‌শাখানা নিন, আসুন আমার সঙ্গে। চ'ড়ে চালাতে পারবেন না, হ্যাণ্ডেল ধরেই নিয়ে আসুন…ছ'হাতে।"

কারখানার পাশে ফাঁকা জায়গাটা প্র্যাকটিস করবার জন্যেই ছেড়ে রাখা, একটা বড় চক্রাকারে রিক্‌শার চাকার দাগ পড়ে গেছে। উঠে চালাতে গিয়ে কিন্তু তড়িতের মুখ শুকিয়ে গেল, অখিল ঘোষের মুখের দিকে চেয়ে বিমূঢ়ভাবে বলল—"এ-যে দশমুনী বোঝা একটা, অত জোরে চালায় কি করে—এর ওপর আবার লোক নিয়ে?"

উত্তর হোল—"এইজন্যেই তো বলেছিলাম—অত দয়ার বোঝা সইতে পারলে হয়। টের পেলেন তো, নেমে আসুন এবার।"

হ্যাণ্ডেল বশে রাখাও প্রায় দু'চাকার সাইকেলের মতোই দুরূহ, মনে হয় তিনটে তিন দিকে ধাওয়া করছে। তড়িৎ কিন্তু নামল না। বুঝল, জিনিসটা যখন এত চলেছে, আর, তার চেয়ে দুর্বল লোককেও যখন হনহনিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে দেখছে নিত্য—তখন ভেতরকার একমাত্র রহস্য নিশ্চয় অভ্যাস। দেখল, তাই-ই। জ্যোৎস্না-রাত্রি, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে মেহনত করল, অবশ্য জিরিয়ে জিরিয়ে; আরও করত, একটা উৎসাহের জোয়ার এসে গেছে, অখিল ঘোষই বারণ করলেন, এইতেই হাতে পায়ে ব্যথা ধরবে।

দুটো দিন দিতে হোল বাদ, তার পর ক্রমে ক্রমে সহজ হয়ে আসতে লাগল। প্রথমটা নিরুৎসাহ করলেও, অখিল ঘোষ যথাসাধ্য সাহায্যই করলেন। এখানে রপ্ত হয়ে যাওয়ার পর রাস্তায় বের করালেন রিক্‌শা, নিজে রইলেন রিক্‌শা নিয়ে আগে-

আগে। প্রথমে নির্জন রাস্তা, তার পর অপেক্ষাকৃত জনবহুল, তারপর বাজার। চলার নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করিয়ে একেবারে পাকা হয়ে লাইসেন্স নেওয়াতে দিন-পনরো লাগল। তারপর নিজেই গাড়ি বের করল তড়িৎ। ওর প্রথম দিনের সওয়ারিও হোলেন অখিল ঘোষ।

বেশ খানিকটা হালকা-ঘন দু'রকম ট্রাফিকের মধ্যে দিয়ে ঘোরালেন, বাজারে নেমে কিছু কেনাকাটাও করলেন—ফলের দোকানে, খাবারের দোকানে; তারপর ফিরে গিয়ে রিক্‌শা থেকে নেমে বললেন—"এবার যা করছি সেটা কিন্তু অন্যভাবে নেবেন না, দোহাই।"

কিছু বুঝে ওঠবার আগেই পকেট থেকে দু'টাকার একটা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরলেন, বললেন—"নিন।"

তড়িৎ হকচকিয়ে গেল একেবারে, মেহনতে মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছিলই, তার ওপরও একঝলক রক্ত পড়ল ছড়িয়ে—নিশ্চয় অপমানেই। অখিল ঘোষ বাঁ হাতটা পিঠের ওপর রাখলেন; বললেন—"না, বলেছিই তো অন্যভাবে নিতে পারবেন না। এটা শুভ-বউনি—ওকালতিতে আছে, ডাক্তারিতে আছে, গরীব ব্যবসা বলে আমাদেরই বা থাকবে না কেন?…এও তো মা-লক্ষ্মীই; তাঁর মর্যাদা এটা…"

প্রায় একসঙ্গেই দুটো বিরুদ্ধ অনুভূতির সংঘাতে—বিশেষ করে বোধহয় এই শেষের কথাটিতে, তড়িতের হঠাৎ মনে হোল যেন চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসবে, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল—"দিন।"

—মাথায় ঠেকাল নোটটা, তারপরে হঠাৎ মুখ তুলে তর্ক তুলল—"কিন্তু, এ তো আপনি আমাকেই ঘুরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন, আমারই স্বার্থে; ভাড়া নোব কি বলে?"

অখিল ঘোষ বিস্ময়ের ভান করে বললেন,—"সে কি! বাজারে আমার দরকার ছিল না?—দেখলেন আবার, ফল এসব কিনলাম এক গাদা!"

"দলিল পাকা করে রাখছেন, তা কে জানত বলুন"—বলে হাসতে হাসতে তড়িৎ নোটটা পকেটে রাখছিল, অখিল ঘোষ আবার বিস্ময়ের অভিনয় করে বললেন—"তা বলে সবটা পকেটস্থ করেন যে! বাঃ, আমার পাওনা আট আনা কে দেবে?"

একটা হাসি উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা।

অখিল ঘোষ নিমন্ত্রণ করে বসলেন—রাত্রে ওঁর ওখানেই খেতে হবে আজ। আপত্তিই করল তড়িৎ, কোন উপলক্ষ্য তো নেই, মিছামিছি…

বিস্মিতই হোলেন অখিল; বললেন—"উপলক্ষ্য নেই কি মশাই! জাতে তুললে তো

পঙ্‌ক্তিভোজ দেয় একটা, জাতে নামিয়েই বা দোব না কেন? ক্ষতিপূরণ বলেও তো একটা কথা আছে।"

(তিন)

অন্যভাবেও সাহায্য করতে লাগলেন অখিল।

তড়িৎ যে তার এই নূতন কাজটা প্রচ্ছন্নতা দিয়ে ঘিরে রাখতে চায় সেটা আগেই টের পেয়েছিলেন—যখন সে বলে, সাতটার পর গা-ঢাকা হয়ে এলে গাড়ি বের করতে চায়। অখিল একটু দম্ভ বা ব্যঙ্গভাবে নিজের কথা বলেছিলেন—তিনি যে কোন কুণ্ঠার বালাই না রেখে দিনের বেলাতেই শহরের বুকের ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেছেন গাড়ি। তড়িৎ লজ্জিত হয়ে কথাটা ঘুরিয়েও নেয়।

অখিল কিন্তু পরে ভেবে দেখলেন ওর পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক এই কুণ্ঠা। বয়স কম, নূতন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে, তিনটে পাস দিয়েছে এবং লক্ষ্যটাও সেই পথেই এগিয়ে যাওয়া। এর ওপর নিজের নিজের প্রকৃতিও এসব বিষয়ে কাজ করে বড় বেশি, ছেলেটি লাজুক; এমন অবস্থায় ও-যে শ্রমকে এতখানি পর্যন্ত মর্যাদা দিতে পেরেছে আপাতত এই যথেষ্ট ওর পক্ষে। যেভাবেই হোক, টুইশনের লোভ ছেড়েই তো রোজগারের এই পথটা নিলে বেছে। অখিল অন্যভাবেও সুবিধা করে দিলেন ওর।

কুণ্ঠাটা নিশ্চয়ই বাঙালী সম্বন্ধেই বেশি। অখিল ওদিকটার সম্ভাবনাটা কমিয়ে নিয়ে এলেন। অল্প সময়ের মধ্যে নিয়মিত রোজগারটুকুও হয়ে গেল ভালো, উনি মাসিক ব্যবস্থায় একজন খদ্দের যোগাড় করে দিলেন সাড়ে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত নিয়ে যাবে প্রত্যহ, আধ ঘণ্টা আন্দাজ থেকে আবার নিয়ে আসা, মাসকাবারে চল্লিশ টাকা ভাড়া। বললেন—চেষ্টায় আছেন, এরপর ঐ পথে যেতেই যদি সুবিধামতো আর একটা যোগাড় করে ফেলতে পারেন তো বাঁধা সময়ের মধ্যে ঐ প্রয়োজনীয় ভাড়ার কিছু বেশিই হয়তো এসে যেতে পারে।

ব্যবস্থাটুকু অমনিই হোল না, কিছু গচ্চা লাগল অখিলের। খদ্দেরটি অন্য এক রিক্‌শাওয়ালার হাতে ছিল, তার কাছ থেকে নিতে দৈনিক পাওনার থেকে বেশ খানিকটা ছাড়তে হোল অখিলকে। লোকটা বোধহয় গড়পড়তা বেশিই কামিয়ে নেবে ঐ সময়টায়, তবু একটা নিশ্চিত আয়ের বাঁধা খদ্দের ছেড়ে দিতে হোল তো। তড়িতের একটা বাড়তি সুবিধা এই হোল যে, শহরের বাইরের দিকে যাওয়ায় বাঙালী বা পরিচিত অন্য

কারুর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাটা আরও এল কমে। একটানা দূরের সফর, প্রথমটা বেশ কষ্টই হোত, তারপর ক্রমে ক্রমে সেটাও এল সয়ে। খদ্দেরটি বিহারী; বেশ অবস্থাপন্ন এবং ভদ্র ; সাধারণত একলাই যান, কোনদিন যদি কাউকে সঙ্গে নিলেন বা বেশি সময় রয়ে গেলেন তো তার জন্য নিজে হতেই ভালো করে দেন পুষিয়ে। মাস-কাবারী ব্যবস্থা হ'লেও একবার বলাতেই দিনের দিন ভাড়াটা চুকিয়ে দিতে লাগলেন। বেশ চলতে লাগল। বাঁধা সময়টার ওপর আর খানিকটা খাটলে আট আনা, দশ আনা, কোনদিন বা এক টাকা পর্যন্ত এসে যায়।

বেশ চলা মানে অদৃষ্টের অনুকূলতা। কিন্তু অদৃষ্টকে তো দেখা যায় না ; তা না যাক, কিন্তু এটা তো স্পষ্ট যে অদৃষ্ট মানে তার এ-ক্ষেত্রে অখিলই। মনটি কৃতজ্ঞতায় ছলছল করতে থাকে, কিন্তু প্রকাশের তো উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন দৈব-যোগে আয়টা বেশ ভালোরকম হওয়ায় আবেগের বশেই পাওনার চেয়ে কিছু বেশি দিতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুক্তি ঠিক করে রেখেছিল—অখিলেরই ঠিক করে দেওয়া খদ্দের তো ; ভদ্রলোক সেদিন দুজনে মিলে যাওয়ায় এবং বেশিক্ষণ থাকায় টাকা-তিনেক দেন—কিন্তু বেশি দেওয়ার কথাটা তুলতেই অখিল এমন একটা বিস্মিত গম্ভীর ভাব দেখালেন যে, একটা যুক্তির কথাও মুখ দিয়ে বের করতে পারল না তড়িৎ। অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, যেন একটা অযথা অনুগ্রহ দেখাতে গিয়ে অন্যায়ই করে বসেছে। কিন্তু কৃতজ্ঞতা জিনিসটা মনের একটা উত্তাপ, তাকে চেপে রাখা যায় না, চাপা থাকলে অশান্তিরই করে সৃষ্টি। সেই ভাবেই চলছিল, এমন সময় একদিন একটা ব্যাপার হোল।

বেহারী ভদ্রলোকটির ওখানে উপস্থিত হওয়ার সময়টি তড়িৎ ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক রেখে যায়, তিনিও একেবারে প্রস্তুত থাকেন, এ পৌঁছুলেই গিয়ে রিক্‌শায় ওঠেন। সেদিন গিয়ে দেখে—বৈঠকখানায় কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করছেন, গায়ে গেঞ্জি, পায়ে চটি। ওকে দেখেই ভেতরে চলে গেলেন এবং একটু পরে সেই ভাবেই বেরিয়ে এসে ওর কাঁধে হাতটা দিয়ে বললেন—"একটু এদিকে আসুন।"

বারান্দা থেকে নেমে একফালি সবুজ ঘাসের লন। তড়িতের কাঁধে সেইরকম ভাবেই হাত দিয়ে বৈঠকখানার দরজা থেকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন—"আজ আমার বাড়ি থেকে দু'জন আত্মীয় এসেছেন, তাঁদের নিয়ে দুপুরবেলাই আমি হয়ে এসেছি।... আপনি আপনার প্রাপ্য ভাড়াটা নিন্‌ এই।"

তড়িত বিস্মিত হয়ে বলল—"আপনি যাবেন না, অথচ আমি ভাড়া নোব!"

"আপনার তো ক্ষতি হোল।"

"ক্ষতি কিসের? সময়টা তো হাতেই রইল, কামিয়ে নোব আমি।"

"নাও পেতে পারেন ভাড়া…"

"তেমনি বেশিও পেয়ে যেতে পারি। সেটা চান্সের কথা, কিন্তু না গিয়েও ভাড়াটা নেওয়ার তো কোন যুক্তি পাচ্ছি না খুঁজে।"

ভদ্রলোক যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন; সেইজন্যেই হালকাভাবে একটু হেসে বললেন—"যুক্তি যথেষ্ট আছে, আপনি যদি এখন খুঁজে না পান। আগেও এরকম হয়েছে দু'একবার, দিয়ে দিয়েছি ভাড়া, আপত্তি করেনি।"

তড়িৎ হেসে ফেলল অদ্ভুত যুক্তিটায়; বলল—"তাদের উদারতার প্রশংসা করছি, কিন্তু অনুকরণ করতে পারব না, মাফ করবেন। তবে আপনার এই উদারতার জন্যে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ; কিন্তু নিই কি করে বলুন?"

ভদ্রলোক আবার বিব্রতভাবে মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক চেয়ে নিলেন, তারপর হঠাৎ যেন একটা ভালো যুক্তি পেয়ে গেছেন এইভাবে বললেন—"কেন, এই দেখুন, আপনি এতটা পথ তো মিছিমিছিই এলেন, ফিরে যাবেন খালি গাড়ি নিয়ে…"

"আমি আসবার সময় পেলে সওয়ারী তুলে নিই, আজ পাইনি; যাওয়ার সময় চেষ্টা করব, পেয়েও যেতে পারি।…তবু বেশ, আপনি যখন জিদ করছেন, এই ভাড়াটা আমি নিতে পারি; চার আনা আর চার আনা—আট আনা।"

ভদ্রলোক একটু চুপ করে রইলেন, ভাড়াটা দেওয়ার জন্যে ডান হাতটা সরিয়ে নিয়েছিলেন, আবার কাঁধের ওপর রেখে বললেন—"আপনি নিন্ সমস্তটা আমার অনুরোধ। আমি বুঝছি কেন নিতে চাইছেন না, মনে করছেন অনুকম্পা দেখাচ্ছি, অনু-কম্পার পয়সা কেন নেবেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, অনুকম্পা মোটেই নয়। আমার আত্মীয়ার এটা কঠিন পীড়া, এ সময়ে কারুর মনে এতটুকু নিরাশার ছায়া পর্যন্ত পড়ে এটা আমি চাই না, মনে হয় তাতে ওর অমঙ্গল হবে…"

"কিন্তু আমার তো কোন নিরাশাই নেই এতে…"

"বুঝেছি।…কিন্তু আমার মনেও এই ভেবে যদি একটা খুঁতখুঁতুনি থাকে…"

পিঠে হাতটা একটু চেপে দিলেন, গলাটাও হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল। তড়িৎ তাড়া-তাড়ি হাতটা বাড়িয়ে দিল; বলল—"দিন। আমি তাঁর কল্যাণের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।…হয়েই যাবেন ভালো তিনি, ভাববেন না।"

কে কার আয়ুর কথা জোর করে বলতে পারে? তবু মনের পূর্ণতায় কথাটা মুখ

দিয়ে গেল বেরিয়ে। বেরুলও যেন একটা বিশ্বাসের মধ্যে থেকেই। রিক্‌শা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। জ্যোৎস্নারাত্রি, পিচ-ঢালা প্রায় নির্জন রাস্তার ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে চলল রিক্‌শাটা, কতকটা যেন আপনি বয়ে যাওয়া, মনটা যে কোথায় উঠে গেছে, কত উঁচুতে,—দেহের প্রয়াসে আবার যেন নিচে নেমে না আসে।

"ভাড়া যাবে ?..."

পাশেই একজন পথিকের প্রশ্ন। সামনে পথটা ঢালু ; উত্তর-প্রত্যুত্তরে পাছে এই দুর্লভ ভাবাবেশটুকু যায় মিলিয়ে, সেইজন্য কিছু না বলে প্যাডেলে একটা চাপ দিয়ে সজোরে নেমে গেল তড়িৎ।

কিছু একটা করতে ইচ্ছা করছে, সামান্যও হয় তো ক্ষতি নেই—মানুষের কতটুকুই বা সাধ্য, কিন্তু এইরকম যেন মহৎ হয়।...সে যে শেষ পর্যন্ত বিবেকের জিদ ধরে রইল না, নিল ভাড়াটা, এতে চমৎকার একটি আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে। এটা ঠিক নেওয়া হোল না তো, ত্যাগই।...যতটুকু ত্যাগ পারল করতে।

কিছু একটা করতে ইচ্ছা করছে, সদ্য সদ্য হলেই ভালো ; মনের একটা বোঝা নেমে যায় যেন তাহলে।

কিছু করার ইচ্ছা থেকেই মনে পড়ল—যেটুকু করার সেটুকুও যে করা হয়নি। অখিলদাদার (এ-সম্বন্ধটা অনেকদিনই পাতিয়ে নিয়েছে) এত দয়ার কী প্রতিদান দিতে পেরেছে সে ?

কী ভাবেই বা পারবে ?...এই চিন্তাটা নিয়েই আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল, পায়ের জোর দিতে গিয়ে চিন্তার সূত্রটা না যায় ছিঁড়ে।...তারপর একসময় মনে হোল উপায় যেন একটা থাকতেও পারে। শহরের এদিকে এসে পড়েছে, হিন্দুর পথে। প্যাডেলে চাপ দিল তড়িৎ। সময়টা মূল্যহীন থেকে একেবারে অতিরিক্ত মূল্যবান হয়ে উঠেছে, আর একমুহূর্তও অপচয় করা চলে না। মাঝে মাঝে পথিকদের প্রশ্ন খালি গাড়ি দেখে—"ভাড়া যাবে ?" কাউকে দিল উত্তর, কাউকে বা দিল না ; উঁচু-নীচু রাস্তার দোল খেতে খেতে একেবারে অখিল ঘোষের রিক্‌শার আড্ডায় গিয়ে গাড়ি থামাল। একটা হাতঘড়ি রাখে, পথেই শেষের দিকে একবার হাতটা উল্‌টে দেখল, সবসুদ্ধ মাত্র চল্লিশ মিনিট নষ্ট হয়েছে।

অখিলের বাড়িটা রিক্‌শার আড্ডার সংলগ্নই, ফাঁকা যে জমিটা রয়েছে তার অপর দিকে। দু'মাসের ওপর হয়ে গেল চালাচ্ছে রিক্‌শা কিন্তু বার-তিনেকের বেশি যায়নি। যাওয়ার দরকারও হয় না, লাজুক প্রকৃতির বলে চায়ও না অযথা মাথামাখি করতে।

বার-তিনেক যে গিয়েছিল তা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, একবার সেই রিক্শা-চালানো শুরু করবার দিন, তারপর দুটো কী পূজা উপলক্ষ্যে। গিয়ে ঘাড় নীচু করে খেয়ে চলে এসেছে। অখিলের বাড়িতে ওর বিধবা মা, একটি বোন, স্ত্রী, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। বড় ছেলেটি সামনের বছর ম্যাট্রিকুলেশন দেবে, মাঝেরটি মেয়ে, সে আর ছোট ছেলেটি নীচু ক্লাসে পড়ে। এদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, খেতে গিয়ে ঠাঁইয়ে বসবার আগে, তারপর রিক্শার আড্ডাতেও দেখা হয় মাঝে মাঝে।

আজ ওদের বাড়ি যাবে। তার পর···যা ভেবে ঠিক করেছে, যার জন্য তাড়াতাড়ি এসেছে ছুটে। আজ তার স্থবিধা না পায়, অন্যদিন হবে, কিন্তু যাবে আজ, আসা-যাওয়াটা আরম্ভ করে দেবে। জড়তাটাকে সরাবে, অনুভব করছে এই দু'মাসেই যেন আস্তে আস্তে অনেকটা কমে এসেছে। ও জিনিসটা যেন বইয়ে-মুখ-গোঁজা ছাত্রদের সম্পত্তি, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করে যাদের চালাতে হয় তাদের কাছে জমতে পায় না।

একটা স্থবিধাও হয়ে গেল আজ। অখিল কারখানায় নেই, কোথায় বেরিয়েছেন। তাঁকে রিক্শা ফিরিয়ে দিয়ে ভাড়াটা দিতে হবে। তার ব্যবস্থা অবশ্য হতে পারে, অন্য কয়েকবার হয়েছেও, কিন্তু আজ এই অনুপস্থিতির সুযোগটা কাজে লাগল। রিক্শাটা কারখানার মিস্ত্রীর কাছে জমা দিয়ে তড়িৎ সোজা অখিলের বাড়িতে গিয়ে উঠল। বারান্দায় উঠে ডাকল—"অখিলদা বাড়ি আছেন ?"

ছেলে-মেয়ে তিনটিই বেরিয়ে এল। বড়টি বলল—"বাবা তো বাড়িতে নেই, বেরিয়েছেন।"

"কোথায় গেছেন ?···ফিরবেন কখন বলে গেছেন ?"

"রিক্শার পার্টস্ কিনতে গেছেন।"

"তবেই তো !···একটা কাজ ছিল।"—চিন্তিতভাবে একবার মাথাটা ঘুরিয়ে নিল চারিদিকে।

ছেলেটি বলল—"বসুন না, গেছেন অনেকক্ষণ বাবা। শিগ্‌গিরই ফিরতে পারেন।"

মেয়েটির সঙ্গে একটু বেশি মেলামেশা আছে, কারখানায় বেশি যায়। এগিয়ে এসে ডান হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে বলল—"হ্যাঁ, আসুন। গল্প বলবেন। কক্ষনোও তো আসেন না।"

"তোমরা তো পড়ছ এখন।"

"বা-রে ! যারা পড়ে তাদের বাড়ি কেউ আসে না ?"

তড়িৎ হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে বাইরের ঘরে বসল। ঠিক গল্প নয়, যে ধরনের কথাবার্তা আরম্ভ হয়েছিল সেই ধরনেরই চলল কিছুক্ষণ। আসে না কেন তড়িৎকাকা? ওর কথা প্রায়ই হয়…ঠাকুরমা বলেন, ছেলেটি বড় লাজুক…একলা থাকে, ইচ্ছে তো করে নেমন্তন্ন করি মাঝে মাঝে, কিন্তু যা পাতের সঙ্গে মিশে থাকে—যেন শাস্তি একটা…

মেয়েটি মেজো হোলেও বড়র চেয়ে বেশ খানিকটা ছোট; ওই বকে বেশি, একটু বেশি অন্তরঙ্গও তো। বড় ভাই একটা অঙ্ক নিয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ তুলে থামতে ইশারা করছে বোনকে, তারই মধ্যে ছোটটি আর যেন থাকতে না পেরে অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলে উঠল—"আর রতি-পিসিমা, দিদি…চকোরে তড়িৎকাকার সেই রিক্শা-চালানো দেখে, হেসে…"

বড় ভাইকে এবার বেশ সোজা হয়ে ঘাড় তুলেই চোখের ইশারা করতে হোল। এই সময় ভেতর থেকে ডাকও পড়ল ওদের দু'জনের—"অলক, রুবি—ভেতরে এসো তোমরা, মা ডাকছেন তোমাদের।"

ওরা চলে যেতে তড়িৎ বড় ছেলেটির দিকে ঘুরে চাইল; প্রশ্ন করল—"অঙ্কটা শক্ত নাকি বিমল? অনেকক্ষণ থেকে বসে রয়েছ যে?"

বিমল ঘাড় তুলে একটু হাসল; বলল—"শক্তই। সকালবেলা মাস্টারমশাই অনেকক্ষণ চেষ্টা করলেন।…দেখছি একটু আবার।"

"দেখি।" বলে খাতাটা টেনে নিল তড়িৎ।

এইজন্যই এসেছে আজ। টিউটারটি আই-এস্-সির ছাত্র, বেশ যে মনের মতো নয়, সোজাসুজি না জিগ্যেস করেও ক্রমে টের পেয়েছিল তড়িৎ; কতকটা ঐ কারণেই গ্র্যাজুয়েট জেনে অখিল সেদিন তড়িৎকে টুইশনি নেওয়ার কথা বলেছিলেন। তড়িৎ ঠিক করেছে মাঝে মাঝে এইরকম একটা ছুতানাতা করে এসে ব'সে ওদিকে যে ত্রুটিটুকু হচ্ছে সেটা শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এই করেই ও অখিলের প্রীতির ঋণ সাধ্যমতো পরিশোধ করে যাবে; যতটা পারে। এইজন্যেই আজ দৈবক্রমে যে সময়টুকু বেঁচে গেল সেটা তো রোজগারে লাগালই না, বাকী সময়টুকুও নিল এই দিকেই টেনে।

বেশ একটি নূতন ধরনের আনন্দ পাচ্ছে। এইবার থেকে এইরকম করবে মাঝে মাঝে।

ও অঙ্কটা শেষ করে আরও গোটা দুই করিয়ে নিল। তার পর আর কোন্ কোন

পাঠ্য বিষয়ে আটকায় জিগ্যেস করে নিয়ে ইংরাজীর পডাটা দেখছিল, এমন সময় একটা বড় প্যাকেট বগলে করে অখিল এসে পৌছুলেন।

একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলেন—"তড়িতের আজ এত সকাল-সকাল যে? শরীর খারাপ নাকি?"

তড়িৎ কারণটা বলল; অবশ্য আসল কারণটা নয়।...খদ্দেরের কথাটাও নয়।... টাকাটা আজ অল্প সময়ের মধ্যেই এল উঠে, ভাবল বাড়ি ফিরে যাওয়া যাক তাহলে—বই নিয়ে বসা যাবে বরং। ওঁর ভাড়াটা দিয়ে যাবার জন্যে বসে আছে।

"কতক্ষণ?"—জিগ্যেস করলেন অখিল।

"এই আধঘণ্টাটাক্..."

বিমল বলল—"তার চেয়েও বেশি, তিনটে অঙ্ক কষলুম; প্রায় ঘণ্টাখানেক..."

"অত হবে?"—একরকম কথাটা চাপা দেওয়ার জন্যই পকেট থেকে একটা টাকা বের করে বলল—"এই নিন।"

ব্যাগ থেকে আট আনা পয়সা বের করতে-করতে অখিল বললেন—"দেখো তো, আর আজই দেরি করে ফেললাম আমি। তা, তুমি তো ওটা কাউকে দিয়ে চলে যেতে পারতে।"

বিমলকে বলল—"একটু চা দিয়েছিলে কাকাকে?...মনে তো হচ্ছে না, সে বুদ্ধি আছে?...তিনটে অঙ্ক কষিয়ে নিলুম!...একটু বসবে তড়িৎ তুমি"—ব'লে ভেতরে চলে গেলেন।

(চার)

উদ্দেশ্যটা বোধহয় সন্দেহ করে থাকবেন অখিল, তবে কিছু বললেন না। কেমন যেন মনে হোল, ছেলেমানুষ, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, হয়তো পারিবারিক স্পর্শ চায় একটু, টুকে দিলে না-আসতে পারে; তাতে এটুকু থেকে বঞ্চিতই করা হবে।...এ অনুমান যদি নাও হয় সত্য তো, বাঙালীর ছেলে, সৎ, আসে-যায়, মেলামেশা করে এটা চানই অখিল। কিছু বললেন না ওকে প্রথমটা। তারপর যখন মাসে তিন-চারদিন থেকে সপ্তাহে প্রায় নিয়মিতভাবে দু'দিনে এসে দাঁড়াল হাজরি-দেওয়াটা, তখন একদিন তুললেন কথাটা। বললেন—"এ তো তুমি সময় বাঁচিয়ে খুব কাজে লাগাবার পন্থা এক বের করেছ তড়িৎ, দু'দিকেই লোকসান।"

তড়িৎ আমতা-আমতা করে বলল—"লোকসান নয় অখিলদা, পুরনোটা ঝালানো হচ্ছে তো, তাতে বরং লাভই হচ্ছে দেখছি।"

মনে মনে একটু নিশ্চয় হেসে থাকবেন অখিল ; বললেন—"লাভ হয় ভালোই ; আমার কথা—পুরনো ঝালাতে গিয়ে, ওদিকে নতুন না ঝলসে যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে যেও। এত মেহনত করে পড়া…

আর কিছু বললেন না। তবে বাড়িতে বলে দিলেন—যেদিন এইভাবে সকাল সকাল এসে বসবে সেদিন যেন ওকে ভালো করে চা-জলখাবার খাইয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়—মাকে, বধূকে বলে দিলেন যেন বাড়িতে ডেকেই খাইয়ে দেন ওঁরা, টিউটারের মতো বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে নয়। তবে, একদিনেই নয় ; সইয়ে সইয়ে, আস্তে আস্তে বাড়ির লোক করে নেওয়ার মতো করে। খাতির হচ্ছে দেখে কুণ্ঠায় যাতে আসা বন্ধ করে না দেয়।

তাই হোল। মা পূজার্চনা নিয়েই থাকেন বেশি, কিন্তু স্ত্রী সরোজিনী বেশ বুদ্ধিমতী ; কবে থেকে চায়ের সঙ্গে জলযোগের আমদানি হোল, কবে থেকে তাতে একটু আড়ম্বর এসে গেছে, কবে থেকে বাইরের-ভেতরের ব্যবধানটা গেছে ঘুচে, তারপর কবে থেকে নিমন্ত্রণের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে নিমন্ত্রণের ব্যবধানটুকুও গেছে মিটে—কিছুই যেন বুঝতেই পারল না তড়িৎ।

তারপর যখন একদিন রবিবারে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোর পর সরোজিনী জানালেন এবার থেকে ফি রবিবারে এখানেই খাবে, তড়িৎ হেসে বলল—"কেন, অন্য বারগুলোই বা কি অপরাধ করেছে, বৌদি ?"

হাসিটা এমন, সরোজিনীর মনে হোল ওঁর প্রীতির রীতি যেন ধরা পড়ে গেছে। একটু থমকে গিয়ে হেসে বললেন—"আমার নেমন্তন্ন নয়, ভাই, তোমার দাদা বলেছিলেন।…মানে, রবিবারটা কারখানার ছুটি দেন তো, একটু গল্পসল্প করতে পারেন—হয়তো সেইজন্যে।"

প্রীতির, আত্মীয়তার একটা রেষারেষি চলল, রবিবার তড়িৎ বিমলের পড়াশুনা নিয়ে আরও বেশি করে লাগল। ওরই মধ্যে অলক আর রুবির সঙ্গে গল্প, খেলা ; রান্নাঘরের রকে বসে সরোজিনীর সঙ্গেও গল্প হয়, হয়তো অখিলের বোন রতিও রইল। অখিলের মার কাছেও গিয়ে বসে তাঁর পূজা থেকে অবকাশ হোলে। পূর্ববঙ্গের পরিবার, ঠিক বাস্তুহারা নয়, গোলমালের আগেই এদিকে চলে এসেছেন, তারপর এখন সব সম্বন্ধ ছিন্ন, বাস্তুহারারই সামিল। ঐ দুঃখের কথাই উনি বেশি ক'ন। পুকুর বাগান, ক্ষেতখামার,

লোকজন—কিছুর সঙ্গেই, কারুর সঙ্গেই আর সম্বন্ধ রইল না ; আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, আর কি দেখা হবে কারুর সঙ্গে এ-জন্মে ? শোনাবার নূতন লোক পেয়ে আর ব'লে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। সবার সঙ্গে সবার মতোটি হয়ে দিনদিনই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে পরিবারটির সঙ্গে তড়িৎ।

সরোজিনী বোধহয় আরও চান। একদিন রান্নাঘরের বারান্দায় আলাপ-প্রসঙ্গে বললেন—"বিমল—রুবি—অলক, এদের তো একরকম হচ্ছে, মাস্টারও রয়েছে, তুমিও নিজের মতন করেই দেখছ, ঠাকুরঝির বোধহয় ইচ্ছে একটু পড়াশোনা করে···"

রতিও ছিল, রুটি বেলছিল, মুখটা তুলে বলল—"তোমার কানে ধরে বলতে গিয়েছিলুম···"

"সব কথা কানে ধরে বলতে হয়, ঠাকুরপো ?···বেশ, বলোনি, পড়োই না, এমন সুবিধে রয়েছে···"

একটু চুপ করে থাকে রতি, তারপর লেচিতে দুটো টান দিয়ে বলল—"পরের অসুবিধে করে নিজের সুবিধে করে নেওয়া—সে ঠাকুরঝির কুষ্টিতে লেখেনি। আর তড়িৎদা তো নিজেই ছাত্র এখন, নিজের চরখায় তেল দিন।"

মাথাটা আরো নীচু করে নিয়ে মিঠে-মিঠে হাসতে লাগল। তড়িৎ সরোজিনীকেই বলল—"অসুবিধের মধ্যেও না-হয় করলাম চেষ্টা, কিন্তু, হবে কিছু আশা করেন, বৌদি ? —দেখছেন তো গুরুভক্তি ?"

রতি রুটিটা থালায় ছুঁড়ে দিয়ে আর একটা লেচি চাকির ওপর টিপে ধরল, অল্প ভ্রূ নাচিয়ে বলল—"যা গুরু, পড়ার চেয়ে ভক্তি দেখানো আরও শক্ত। মুখ্যুই থাকি তার চেয়ে।"

আর সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, তার পাশে ওর সঙ্গে এই আড়াআড়িও চলেছে সমানে। মাস চারেক গেল কেটে।

বেহারী ভদ্রলোকটিকে দেড়-ঘণ্টা সময় দিতে হয় তড়িৎকে। ওটা একরকম বাঁধা-ধরা, যদি না সেখানে আটকে গেলেন কোনদিন। এর পর ঘণ্টাখানেক আরও খাটে, চেষ্টা করে শেষের ভাড়াটা যাতে বাসার দিকেই হয় ; রিক্‌শা জমা দিয়ে ঘণ্টা-তিনেকের মাথায় ফেরে বাড়ি।

সেদিন ওদিক-থেকে ফিরে আবার বাইরেরই একটা সওয়ারী পেয়ে গেল। সবেমাত্র দূর থেকে এসেছে, ইচ্ছা ছিল না বাইরে যাওয়ার, তড়িৎ একটা মোটা ভাড়া চেয়ে বসল, প্রায় ভরল। জায়গাটা কতকটা নির্জন, একটা খালের মতো বেরিয়ে গেছে, তার

দুদিকে নূতন বাড়িঘর দু'একখানা করে উঠতে আরম্ভ হয়েছে, তারই একটিতে বোধহয় তদারকে এসেছিলেন, ফিরবেন। কি ভেবে একবার ওপরের দিকে চেয়ে নিয়ে রাজী হয়ে গেলেন ভদ্রলোক, উঠে পড়ে বললেন—"বেশ চলো···একটু তাড়াতাড়ি।"

এদেশীয়ই; বাঙালীদের সাধ্যমতো এড়িয়েই যায় তড়িৎ। সওয়ারী নামিয়ে ফেরবার সময় ভদ্রলোকের ডবল ভাড়া স্বীকার করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার কারণটা বুঝল তড়িৎ। দিনের বেলায় একটা খুব পাতলা মেঘের আস্তরণ আকাশে দেখেছিল, লক্ষ্য করবার মতো নয়, এখন একটা গুরুগম্ভীর ডাকে চোখ তুলে দেখল—একটি নক্ষত্রও নেই আকাশে। ভুল হয়ে গেছে, উঠেই জোরে চাপ দিয়ে রিক্শা হাঁকিয়ে দিল। ঘুরে, বোধহয় লোকটার ওপর আক্রোশভরেই একবার বাড়িটার দিকে চেয়ে নিল।···ডবল ভাড়ার লোভ দেখিয়ে বিপদে টেনে এনেছিল।

বোধহয় মাইল দেড়েক কি দুয়েক একভাবে চালিয়ে শহরের প্রায় কাছে এসে পৌছেছে,—আকাশ নোটিশ দিয়েই যাচ্ছিল—কয়েক ফোঁটা জল হাতের খোলা অংশটায় পড়ল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তবু আরও চাপ দিল প্যাডেলে তড়িৎ, তারপর খানিকটা এসে আশ্রয় দেখতে হোল—রিক্শা রেখে কোথায় একটু উঠে দাঁড়াতে পারে। একদিকটা একেবারেই খালি, একদিকে—ডানদিকটায় খোলার বাড়ি—বারান্দা নেই, মুদীর দোকান, পানের দোকান, খানিকটা পড়তি জমি—গোরু-ছাগল বাঁধা।···নাঃ, ভিজতেই হোল, খানিকটা গেছেই ভিজে, মরীয়া হয়ে বেরিয়ে যাওয়াই ঠিক করেছে, আরও গোটাকতক এই ধরনের বাড়ি-ঘর-খাটালের পর একটা কোঠা বাড়ির বারান্দা নজরে পড়ল। তড়িৎ নেমে পড়ল। পাশে রিক্শা রেখে উঠে যাচ্ছিল, আবার ফিরল। হুড-টা ফেলে দিয়েছিল, তুলে দিয়ে সীটের নীচে থেকে ঝাড়নটা বের করে মুছে দিয়েছিল সীটটা, তারপর সেটা তারই ওপর বিছিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠল।

আকাশটা বন্ধুর মতোই ব্যবহার করেছে বলতে হবে। গোটা তিন-চার ছোটো ছোটো পশলায় তাড়া দিয়ে এগিয়ে নিয়ে এসেছে, খুব ভেজায়নি। এই বার, ও একটু ঠাঁই পেতে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ধারাপতনে নামল।

একটা নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বেশ একটু চিন্তিত হয়ে উঠল তড়িৎ। বর্ষা বলে একটা ঋতু আছে আবার, প্রায় চারমাস, কম-বেশি করে। এখনও বৈশাখই চলছে, বোধহয় মাঝামাঝি, কিন্তু মনে করিয়ে দিল কথাটা। কি করবে এবার? রাঁচির বর্ষা আবার শুনেছে অনেক এগিয়েই আরম্ভ হয়।···বাইরের দিকে চেয়ে এই কথাই ভাবছিল, বৃষ্টি চেপে আসতে মনটা অন্তর্মুখীন হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। চিন্তাটা ভবিষ্যতের হোলেও,

একেবারেই সামনের; সেটাকে ছেড়ে কিন্তু একেবারে অতীতে গিয়ে উপস্থিত হোল তড়িং।...দেশ—বর্ধমানের একটি ক্ষুদ্র গাড়া-গাঁ, কোনও সময় কোন বন্যায় দামোদরের জল খানিকটা ঘুরে গিয়ে একটা স্ুঁতী বানিয়ে দিয়েছে, তারই ধারে। জল থাকে না বারোমাস। বৌদিদির গোয়ালে সাঁঝাল দেওয়া, প্রদীপ জ্বালা, শাঁখ বাজানো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। দাদা প্রায় এদিক্-ওদিক্ ঘুরে এই সময় সামনে একটা মাতুর পেতে রমাকে নিয়ে পড়াতে বসেন...দাদার বদনাম, বৌদিদির আঁচলধরা একটু। দাদা তো বলেন, রমাকে পড়াতে হবে ভালো করে, ওকে তড়িতের ভাইঝি হয়ে উঠতে হবে, বাপ না-হয় চাষাই হয়ে রইল।...দাদাই নয়, দাম্পত্য বন্ধনটা ওদের বংশেই বেশ নিবিড়; বাবা-মাকেও মনে পড়লেই একসঙ্গে মনে পড়ে, একটি শান্ত প্রসন্ন ভাব দুটি মুখে।... রতিটা বড় চঞ্চল...

মাঝখানে হঠাৎ রতির কথা কোথা থেকে এসে গেল! একটা কৌতুকের হাসি ফুটতে যাচ্ছিল তড়িতের মুখে, হঠাৎ মিলিয়ে গেল। এস্রাজের রণন উঠল না?...

হ্যাঁ, এই বাড়িতেই; ওদিককার একটা ঘরে। আর গানও যে! 'দেশ' রাগিণীর ধরনটা মনে হচ্ছে যেন। মেয়ের গলাই। তড়িৎ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল।

গান গাইতে জানে না; সময় পেল কোথায় জীবনে এ-পর্যন্ত? তবে বড় সুরগুলা মোটামুটি চেনে, অর্থাৎ শুনলেই বলে দিতে পারে। ওটা হয়েছে বর্ধমানে শেষ তুটো বছর যে-বাড়িতে ছিল সেখান থেকে। বড় বাড়ি, মাস্টার এসে মেয়েদের গান শেখাত, গানের জলসাও হোত মাঝে মাঝে, বিশেষ করে কোন বড় গাইয়ে কি বাজিয়ে যদি এল বাইরে থেকে।...'দেশ' রাগিণীটা বড় ভালো লাগে, ওর তো মনে হয় এমনি বর্ষার সঙ্গে যেন মল্লারের চেয়েও মেলে বেশি করে।...এই রকম বর্ষা-রাত, বিপন্ন, নিরুপায় হয়ে অন্ধকার গৃহকোণ আশ্রয় করা, সেখানে হঠাৎ এই সঙ্গীত, তাও সব কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে 'দেশ',—বড় অদ্ভুত লাগছে তড়িতের। আরও অদ্ভুত লাগছে—সেটা মাঝে মাঝে—একজন রিক্‌শাওলা তলিয়ে গেছে সুরের লহরীতে! মনে হচ্ছে কী যেন একটা হয়ে গেছে জীবনে, যার জন্যে এই জগৎ থেকে আস্তে আস্তে সরে গেছে তড়িৎ, কবে, কি করে। মনে হচ্ছে আজ যেন আবার সেইখানে ঘুরে এসে এ তার একটা অনধিকার প্রবেশ। কেমন একটু লজ্জা-লজ্জা করছে যেন।

আকাশ ঝরে পড়ছে, কখনও গাঢ়, কখনও স্তিমিত; এস্রাজের ছড়ের টানের মতো...

'দেশ'-এর সুর গিয়ে পৌঁছেছে গ্রামের বাড়িতে; দাদা, বৌদিদি, রমা, খোকা।

দাদা বলে—তড়িৎ পড়ুক, যত পারে। ওকে ছেড়ে দিচ্ছি। ছেড়ে দিয়েছে তড়িৎ দাদাকেও। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করেছে ওঁর ওপর কোন চাপ দেবে না। সেই যেদিন শুনল বৌদিদির বালা বাঁধা দিয়ে ওর বই-কেনার খরচ জুগিয়েছেন—আই.এ.-তে ভর্তি হবার সময়—সেইদিনই করেছিল প্রতিজ্ঞাটা, অবশ্য প্রতিজ্ঞার কথা জানতে দেয়নি দাদাকে, বালার কথা যে টের পেয়েছিল, সে-কথাও নয়।…চালিয়ে যাবেই। বেশ তো চলছে রিক্শাতে। খেয়ে-দেয়ে, কলেজের খরচ চালিয়ে, আংশিক বাড়ির ভাড়া দিয়ে এই চারমাসে চৌষট্টিটা টাকা জমিয়েও ফেলেছে।…দাদা যদি কখনও টের পায়? পাবে কোথা থেকে?…বাঙালী ভাড়াটে যে পরিহার করে চলে এমন করে তার একটা হেতু তো ঐ,—পাছে কোনও সূত্রে, কোন রকমে কথাটা কানে উঠে যায় তাঁর। অবশ্য তার সম্ভাবনা কই?—কোথায় মানপুর আর কোথায় রাঁচি; তার ওপর দাদাও তো বাড়ি ছেড়ে রেরুনো কাকে বলে জানেনই না।

দাদার কথা মনে হোলে রুবাইয়ের বড় ভাইয়ের কথাও মনে পড়ে যায়। বড় ভাই ওদিকে সামলাচ্ছে, ছোট ভাই বেরিয়েছে দুনিয়া দেখতে, মানুষ হয়ে দাঁড় করাবে নিজের পরিবারকে।

'দেশ'-এর মূর্ছনা বর্ষার রিমঝিমের ওপর দোল খেয়ে চলেছে। গানটা বোঝা গেলে বেশ হোত। হিন্দী গান, মানে ধরতে পারে না। একরকম মন্দ নয়, ধরতে পারে না বলেই মনে হয় তার মনে যা-সব কথা উঠছে-নামছে যেন সেইসব দিয়েই ভরা। 'দেশ' গান হলেই—যদি না বাংলা হয়ে স্পষ্ট হোল মানেটা—তো ওর মনে হয় যেন অনন্ত বিচ্ছেদ, অনন্ত হুতাশ; যেন বহু দূর, সেই দীর্ঘপথে শুধু বুকের দীর্ঘশ্বাসকে পাঠানো ভিন্ন কোন উপায় নেই আর!

একসময় গানবাজনা গেল থেমে, আজকাল যেমন হয়েছে—সমে এসে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া। বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে রইল খানিকক্ষণ। বৃষ্টিটা থেমে গেছে, তবে সংলাপ খানিকটা ভেসে আসছে, একজন পুরুষের গলা, ভরাট আর ভারী; আর মনে হোল দুটি মেয়ের গলা। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে মনে হোল, আর গাওয়া না-গাওয়া—এই নিয়েই হচ্ছে কথা, একজন বলছে—বৃষ্টি ধরে এসেছে, এই সময় সরে পড়াই ভালো।

কথার মধ্যেই উঠে পড়ে তিনজনে এগিয়ে আসছে বাইরে দিকে। …পুরুষ কণ্ঠে শোনা যায়—"চর্চাটা ছাড়বে না, সুপা…এই তো হয়েছে দুঃখ, বিয়ে হোল তো আমাদের মেয়েদের গান-বাজনা সব গেল ঘুচে, একটু যে চেষ্টা ক'রে…"

"খণ্ডি-হাতার তালের মধ্যে কতদিন থাকবে টেঁকে, মাস্টারমশাই?"—একটা হাসি

উঠল। তারই মধ্যে বারান্দার বিজলি-বাতিটা জ্বলে উঠল, দোর খুলে তিনজনে বেরিয়ে এল।

মাস্টারমশাই অর্থাৎ গান-বাজনার মাস্টার নিশ্চয়। ভেতরে তবলার বোল, সেতারের টুং-টাং চলছে তখনও, তাইতে এই রকমই মনে হয়। মাঝ-বয়সী লোকটি, কাঁচাপাকা চুল, একটু ভারী শরীর, আগেই বেরিয়েছেন, বললেন—"বাঃ, এই তো রিক্‌শাও হাজির, আর দেরি করতে হবে না, বৃষ্টিটাও থেমেছে।···যায়গা রে?"

ওদিক্‌টা ঠিক রেখে গেছে তড়িৎ, চুলের ছাঁটে, খানিকটা সাজ-গোজেও, হঠাৎ বাঙালী বলে কেউ যে চিনে ফেলবেই এমন নয়; রিক্‌শাওলা, সুতরাং এদেশী—এই বিশ্বাসটাই তো কাজ করে গোড়ায়।

একটা কুণ্ঠা ঠেলে আসছে;—কিন্তু না-যাওয়ারও তো কারণ নেই। একটা ঢোঁক গিলে তড়িৎ বলল—"যায়গা, বাবু। কাঁহা?"

জায়গাটা বলল একজন মেয়েই। একটু যেন কিভাবে মুখের দিকে চাইল, তবে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিল তখুনি।

"যায়গা।"

ভাড়াটা বাড়িয়েই বলল তড়িৎ, আগের সওয়ারীর মতো, যাওয়া না-যাওয়া—যা হয়।

ঐ মেয়েটিই আপত্তি করল—ছ'আনা ভাড়া, একেবারে বারো আনা হাঁকবে কেন? বৃষ্টি তো ধরে গেছে।

শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে গড়ন, একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অপর মেয়েটি বলল—"তা চলুক, আবার যদি বৃষ্টি এসে পড়ে, তখন···"

কপালে সিঁদুর, দৃষ্টিটা আপনিই গিয়ে পড়ল তড়িতের।

মাস্টারমশাইও সমর্থন করলেন—"হ্যাঁ, যখন বসতে পারবে না আর, তখন বেরিয়ে পড়াই ভালো।···বারো আনা নেহি, দশ আনা লেগা, যাও।"

আলো জ্বালছে তড়িৎ, উঠে বসতে-বসতে শ্যামবর্ণা মেয়েটি অপটির দিকে চেয়ে একটু চোখ পাকিয়ে বলল—"সব ভাড়াটা আজ তুই দিবি, সুপা···আমার জন্যে তো কেউ হাঁ করে ব'সে নেই, ডবল ভাড়া দেওয়ার কিছু তাড়া ছিল না···"

—একটু নীচু গলাতেই, তবে এমন কিছু লুকিয়ে-চুরিয়ে বলা নয়; আর বাংলাই তো।

বরাবরই ঘন-বসতি শহরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। এদিক্ সামলে, ওদিকেও কান

দেওয়ার বিশেষ কোন চেষ্টা না করেই তড়িৎ যা জানতে পারল তা এই যে, ওরা দুজনেই এখানকার নিয়মিত ছাত্রী—সুপা বলে মেয়েটির নূতন বিবাহ হয়েছে—এবার যাবে শ্বশুরবাড়ি, মাস্টারমশাইয়ের কাছে বিদায় নিতে এসেছিল—দুখানি গানও গায়—(শ্যামবর্ণাটি আর একটু যেন ঘেঁষে গলা নামিয়ে বলল—"তোর গলা আরও মিষ্টি হয়ে গেছে…কি ক'রে রে ?")—শেষের গানটা, যেটা গেয়ে ওরা উঠে এল, গেয়েছিল এই মেয়েটি, যেটি শ্যামা, ছিপছিপে ; এস্রাজও নিজেই বাজিয়েছিল—কনভেণ্টে পড়ে, নাম মল্লী—কোন মতেই বিয়ে করবে না—(বিয়ে আবার মানুষে করে, সব খুইয়ে-খাইয়ে ?)—গান নিয়ে কাটিয়ে দেবে জীবনটা—মানে, গানের সঙ্গেই বিয়ে আর কি ।…এইবার হবে মুশকিল, সুপা চলল—কার সঙ্গে যে আসবে এবার থেকে, ভাড়াটাও পড়ে যাবে বৈকি প্রায় ডবল, একলার ঘাড়েই—বরাবর শহরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, না-হয় সঙ্গী কেউ না-ই রইল—(তোর বর এসে এইখানে থাকুক, সুপা, সব দিক বেশ সামলে যায় ; ইস্‌, যুগ যুগ ধরে আমরাই গিয়ে শ্বশুরঘর করব ; মানুষ নয় তো !)…

কথাবার্তার মধ্যেই আরও আন্দাজ পেল তড়িৎ যে, মল্লী মেয়েটির বাড়ি এখানে নয়, পরের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করছে ।

বাজার পেরিয়ে একটা পাড়ার মধ্যে খানিকটা প্রবেশ করে তড়িৎকে রিক্‌শা থামাতে হোল, সুপা নেমে পড়ল ।

রুমালের গেরো খুলে পয়সা বের করে দিতে যাচ্ছিল, মল্লী বলল—"পারছিস দিতে ? তোর আস্পদ্দা তো কম নয় !"

"বেশ, বেঁচে গেল আমার"—বলে সুপা তাড়াতাড়ি আবার গেরোটা বেঁধে নিল । হাতটা একটু একটু কাঁপছে ।

"কাল ঐ সময় আসবি, মল্লী, বেরুবার খানিকটা আগেই…ও বিশেষ করে বলে দিয়েছে তোর কথা…"

—মুহূর্ত ক'টা যেন বড় চড়া সুরে হঠাৎ বেঁধে দিয়েছে কে । উত্তর হোল—"বয়ে গেছে আসতে…বড় উপকার করেছেন জোড় ভাঙিয়ে টেনে নিয়ে যে…"

মুখটা ঘুরিয়ে চোখ-দুটো রুমালে চেপে ধরল ।

"আসবি…নিশ্চয় আসবি…নৈলে…"

হঠাৎ ঘুরে গিয়ে একরকম ছুটে-ছুটেই গেট ঠেলে ঢুকে গেল সুপা । ও-ও নিশ্চয় নিজেকে সামলাতে পারছে না । আরও অনেক খানিকটা গিয়ে একটা গেটওলা মাঝারি গোছের বাড়ির সামনে রিক্‌শা থামিয়ে নেমে পড়ল মল্লী ।

(পাঁচ)

তড়িৎ বাসায় ফিরল বেশ একটু অন্যমনস্ক হয়েই ; গানের সুরটা মনের কোথায় রুন-রুন করছে, গতি হয়ে পড়েছে মন্থর। ওটুকু অবশ্য কেটে যেতে দেরি হোল না, নিজেই কুকারে রান্নার ব্যবস্থা করা, পড়া ; পরের দিন ঐ রুটিনের পর কলেজ। রাত্রে সেই বেহারী সওয়ারীকে ফেরত আনার পর কিন্তু হঠাৎ মনে হোল 'দেশ'-এর সুরটা আবার এসেছে ফিরে। হঠাৎই যেন অন্যমনস্ক হয়ে উঠল। আর কিছু নয়, বর্ধমান ছাড়ার পর অনেকদিন এভাবে গান শোনেনি। 'দেশ'টা আবার বেশি ভালোবাসে তো। ···যাবে না-হয় আজ ওদিক্‌পানেই ? অবশ্য 'দেশ'ই যে হবে এমন কথা নয় ; তবে গানের আড্ডা, ভালো গান শোনা···

কিন্তু···খুব বড় একটা 'কিন্তু' কোথায় যেন রয়েছে পথ আগলে। আজ তো বৃষ্টিও আনুকূল্য করছে না ; আর বৃষ্টি হোলেও একটি বিশেষ রিক্‌শাওলা ঐ সময় ঐ জায়গাটিতে থাকবে অপেক্ষা করে এই বা কেমন কথা !

গেল না। দুটো দিন কাটিয়ে দিল, আরও চেষ্টা করে আরও একটা দিন। তার পরদিন ঐদিকের একটা সওয়ারী পেয়ে যেতে মনকে বোঝাল—ওকে তো ভাড়া খাটতেই যেতে হচ্ছে।

যাওয়ার সময় ঐখানটায় একটু আস্তে করে নিয়ে কান পেতে রইল। এস্রাজ হচ্ছে বাঁয়া-তবলার সঙ্গে।

ফেরবার সময় মনে হোল ঐখানকার রাস্তাটুকুতে কে আটা লাগিয়ে রেখেছে। এস্রাজের সেই সুরটাই এখন দুলছে, বেশ একটা মাতন চলেছে যেন। প্যাডেলে পা আসছে থেমে। কি করে একটু শোনা যায় ? আজ বৃষ্টি না থাকায় আবার রাস্তায় লোকচলাচল বেশ ভালো রকমই, অর্থাৎ স্বাভাবিক যেটা। এগিয়ে যেতে হোল। খানিকটা গিয়ে মনে হোল—একটা উপায় হতে পারে—ঐখানটায় খানিকটা গড়িমসি করা—খানিকটা এগিয়ে গেল, আবার রিক্‌শা ঘুরিয়ে খানিকটা গেল পেছিয়ে, কে আর এত লক্ষ্য করে রাখছে যে সেই একটা রিক্‌শা জায়গাটাতে দিচ্ছে চক্কর ? আর ভাড়া-খোঁজারও তো কতকটা ঐ পদ্ধতি।

ঘুরে খানিকটা পেছিয়ে গেছে, এস্রাজটা চৌদুনে এসে সমে থেমে গেল। বেশ খানিকটা উজিয়ে গেল তড়িৎ—সময় ছিল—এর পরে কি হবে ?—গান ? সেই মেয়েটির গলায়—দেশ ? ···কারুর গলায় কিছু একটা গান হোক-না···

বাড়ির সামনে দিয়ে আবার ফিরছে, গান বা বাজনা তখনও কিছু ওঠেনি। কয়েক প্যাডেল এগিয়ে গেছে, পেছন থেকে ডাক এল—"এই রিক্‌শা!"

যাবে না ভাড়া। হাত উঠিয়ে সেটা জানাতে গিয়ে মাথাটা ঘোরাতেই পা যেন আপনিই থেমে গেল তড়িতের। হাতটাও নিল নামিয়ে, ঐ বাড়ি থেকেই ডাক। রিক্‌শা ঘুরিয়ে নিয়ে গেল।

মাস্টারমশাই আর সেই মেয়েটি—মল্লী। মাস্টারমশাই বললেন—"তোমাদের সেদিন যে নিয়ে গিয়েছিল।···আজ কিন্তু মামুলী রেট, তা বলে দিচ্ছি বাপু।"

মেয়েটির কিন্তু সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তবে সেদিনকার মতোই ক্ষণমাত্র; তখুনি ফিরিয়ে নিয়ে বলল—"আসি তাহলে মাস্টারমশাই—"

পায়ে হাতে দিয়ে প্রণাম করে রিক্‌শায় এসে বসল।

একটা ছোট বাজারের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। খানিকটা এসে মল্লী প্রশ্ন করল—"রাস্তাটা তো জানাই আছে?"

প্রশ্নটার বিশেষ তাৎপর্য না থাকলেও একটা উদ্দেশ্য আছে, তাই বাংলাতেই করেছে, বেশ খানিকটা ভেবেচিন্তেই। ছোটখাট এক-আধটা কথা বাঙালীরা এদেশীয়দের সঙ্গে বাংলাতে কয়ও, সে-হিসাবে এমন কিছু অস্বাভাবিকও নয়; উত্তর হোল—"হ্যাঁ, আছে।"

বাংলাতেই দিল উত্তরটা তড়িৎ। দিয়ে ফেলল, কিংবা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল বলাই ঠিক; অন্যমনস্ক ছিলই, তার ওপর রাস্তার ট্রাফিকটা কাটাতে আরও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা খুঁজে ঠিক করতে যতটুকু দেরি হোল, চুপচাপই গেল, তারপর মল্লী আবার জিগ্যেস করল—"শহরের সব রাস্তা আছে চেনা?"

সাবধান হয়ে গেছে তড়িৎ। এমনি হিন্দী ভালো জানে না বলে সাধারণত অল্পকথার ওপরই কাজ চালিয়ে যায়, এ-ক্ষেত্রে আরও সংক্ষিপ্ত করে উত্তর দিল—"হাঁ, কুছ-কুছ।"

আর একটু থেমে প্রশ্ন হোল—"কতদিন চালাচ্ছ রিক্‌শা?"

"থোড়া রোজ।"

"তবু···"

"চার মাহিনা।"

আর কোন প্রশ্ন হোল না।···কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করছে তড়িৎ। বাজারের

পরে রাস্তার ধারে একটা পুকুর, তাইতে খানিকটা ফাঁক গেছে, মাঝামাঝি এসে মল্লী বলল—"একটু দাঁড়াবে।"—হুকুমের টোন; অন্তত বেশ একটু গম্ভীর। ব্রেকটা টিপে ধরে ঘুরে চাইল তড়িৎ।

সেই তীক্ষ্ণ, সপ্রশ্ন দৃষ্টিটা এবার একটু বেশিক্ষণ মুখের ওপর ফেলে রাখল মল্লী; প্রশ্ন করল—"তুমি হিন্দুস্থানী?…নেমে দাঁড়িয়েই উত্তর দাও, আর রিকৃশা চালাতে হবে না।"

ভ্রূ-দুটো একটু অবাধ্যভাবে কুঁচকে উঠল তড়িতের, কিন্তু কিছু না বলে আস্তে আস্তে নেমে এসে সামনে দাঁড়াল, বোধহয় আলোর পোস্ট দেখেই দাঁড় করিয়েছে মল্লী। একটু যে থতমত খেয়ে গিয়েছিল তড়িৎ সে-ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে; প্রশ্ন করল—"কি?"

"তাহলে বাঙালীই দেখছি?"

"হ্যাঁ।"

"রিকৃশা চালাচ্ছো যে?"

"কি হয়েছে তাতে?"

রাগারাগি না হলেও বেশ সোজাসুজি উত্তর-প্রত্যুত্তর চলছে। মল্লী বলল—"কি মানে?…পুলিসে হ্যাণ্ডওভার করা যায় তোমায়।"

"রিকৃশা চালাবার জন্যে? বাঙালীর বিরুদ্ধে আইন আছে কোন?"

"চিটিঙ-এর বিরুদ্ধে আইন আছে তো। বাঙালী হয়ে হিন্দুস্থানী সেজে ভাড়াটে তোলা; বিশেষ করে মেয়ে-ভাড়াটে।"

"বিশেষ করে মেয়ে-ভাড়াটেই তুলতে যাব কেন?…আপনিই ডাকলেন।"

"হিন্দুস্থানী জেনে ডেকেছিলাম।"

"বাঙালী জানলে ডাকতেন না?"

"তা…হয়তো ডাকতাম, ঠিক বাঙালী জানলে।"

"তা হলে বাঙালীর রিকৃশা-চালানো—অবস্থাগতিকে যে অন্যায় নয় এটা তো মানছেন?"

"তা মানব না কেন? কিন্তু, কথা হচ্ছে এ-প্রবঞ্চনা কিসের জন্যে?"

"আপনি ধরে নিয়েছেন প্রবঞ্চনা, ওটাও তো অবস্থাগতিকের জন্যে হতে পারে…"

রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে, রিকৃশাও, যদিও ট্রাফিক পাতলাই এখানটা। এরা একেবারে পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, কথাবার্তাও নিছক তর্কে এসে দাঁড়িয়েছে, স্বরও চাপা, লোক

জড়ো করবার উদ্দেশ্য কারুরই নেই। তবু দু'একজন মুখ ঘুরিয়ে দেখেই গেল, একটা খালি রিক্‌শাওলা মাথা ঘুরিয়ে হঠাৎ হর্নের প্যাক্‌প্যাকানিটা বাড়িয়ে দিল খানিকটা। উত্তরটা পেয়ে মল্লী মুখের দিকে চেয়ে একটু চুপ করে রইল। রাস্তার আগে পিছে দেখে নিল, তার পর সামনে খানিকটা দূরে একটা খালি রিক্‌শা আসতে দেখে রুমাল খুলে ভাড়াটা বের করে বাড়িয়ে ধরল; বলল—"এই নাও। আমি যাব না এ-রিক্‌শায়।"

রাস্তারটাকে ডাক দিল।

তড়িৎ বলল—"আপনি যাচ্ছেন না যখন ভাড়া নোব কেন?"

মল্লী আন্দাজে কিছুটা বাঁ হাতে সরিয়ে নিয়ে বলল—"আচ্ছা, এই অর্ধেকটা নাও, খানিকটা তো এসেছি।...কিন্তু খবরদার, আর এভাবে..."

তড়িতের মুখটা হঠাৎ বড় বেশিরকম থমথমে হয়ে গেল। বেশ জিদের ওপরই বলল—"ও-ও নোব না।...না হয় নিতুম, কিন্তু যা ভাষা ব্যবহার করছেন আপনি..."

"ভাষার কি দোষ হোল আবার!"—একবার যেন অনিচ্ছাকৃতভাবেই মল্লীর দৃষ্টিটা ওর চেহারার উপর দিয়ে ঘুরে এল। তড়িৎ উত্তর করল—"প্রথমত, বেশ ভদ্র নয়।... এই ধরুন, আমিও তো আপনাকে জানি না, তার ওপর বয়সে ছোট হোলেও 'আপনি' কথাটা ব্যবহার করছি..."

অপর রিক্‌শাটা চড়াই ঠেলে এসে দাঁড়িয়েছে, মল্লী ঘুরে দেখে বলল—"না, চলা যাও।"

তড়িৎ প্রশ্ন করল—"কৈ, গেলেন না?"

"এইতেই যাচ্ছি।"

"যদি প্রবঞ্চনা নেই মনে করেন, তাহলেই চলুন।...কিন্তু সেও তো আপনার মনের ভেতরের কথা; বাইরে থেকে আমি টের পাব কি করে?"

রিক্‌শাওয়ালাটা দাঁড়িয়েই আছে। মল্লী গলায় একটু অধৈর্যের সুর মিশিয়েই বলল—"আচ্ছা, চলুন তো এখন—"

ওরা যাত্রা করতে রিক্‌শাওয়ালাটাও প্যাডেলে একটা চাপ দিল, তার পর একবার মাথাটা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বেশ জোরে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

ভাড়াটা হাতেই ছিল, তবু বাড়ির গেটের সামনে এসে হাতের তেলোয় একবার বিছিয়ে গুনে নিতে বড় দেরি হতে লাগল মল্লীর, তারপর যেন হঠাৎ হুঁস হতে আবার জড়ো করে নিয়ে বাড়িয়ে ধরে বলল—"এই...ছ'আনা।"

পকেটে ফেলে প্যাডেলে চাপ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল তড়িৎ, মল্লী একটু ভেতরে গিয়ে আবার বেরিয়ে এসে ডাক দিল—"শুনুন!"

তড়িৎ ব্রেক চেপে ঘুরে চাইল। প্রশ্ন করল—"আমায় ডাকছেন?"

"হ্যাঁ।"

ফিরে এল তড়িৎ। মল্লী একটু যেন জড়োসড়ো হয়ে গেছে, আমতা-আমতা করে বলল—"একটা হয়তো ভুল করেছি।···কিন্তু কথা হচ্ছে বাঙালী—বিশেষ করে ভদ্রলোক ···তাদের তো রিক্‌শা চালাবার কথা নয়···মানে, চালায় না তো···।"

যেন গুছিয়ে বলার আশা ছেড়ে দিয়েই বলে শেষ করল—"মাফ করবেন আপনি।"

"এতে মাফ করা-করির কি আছে?" একটু হাসল তড়িৎ।

"আছে বৈকি, অন্যায় হয়ে গেছে। ভদ্রলোক বলে ধরে নিয়েই তো আমার কথাবার্তা সেইভাবে কওয়া উচিত ছিল। তারপর না হয়···যদি দেখতাম···"

"কিন্তু অভদ্র এবং চীটু বলে ধরে নেওয়াই তো স্বাভাবিক হয়েছে। আমি অন্যায় কিছু দেখছি না, মাফ করারও কিছু নেই এতে।"

একটু জিদ করেই মল্লী বলল—"না, হয়েছে অন্যায়।···আচ্ছা থাক্ সে-কথা···আমার একটা অনুরোধ···"

গেট আর বাড়ির মাঝখানে একটা মাঝারি-গোছের বাগান, তার গাছপালার কতকটা আড়ালে রয়েছে এরা, কি ভেবে পেছনে একবার দেখে নিয়ে মল্লী বলল—"একটা অনুরোধ রাখবেন আমার? আসবেন আমাদের বাড়িতে?"

তড়িৎ একটু বিস্মিত হয়েই বলল—"আসব!···কি করতে?···না, আসতে পারব না আমি···"

"আমার জ্যাঠামশাই—এখানে আমার যিনি অভিভাবক আর কি—খুব খুশী হবেন আপনার সঙ্গে আলাপ করে। তার কারণ, তাঁর বড় আপসোস—শারীরিক মেহনতকে অবজ্ঞা করে আমাদের জাতটা জীবন-যুদ্ধে ক্রমাগতই যাচ্ছে পেছিয়ে। বরাবরই এই দুঃখ তাঁর, এখন আবার রিটায়ার করে এই আলোচনা নিয়েই থাকেন, এই নিয়েই কাগজে কাগজে প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—Dignity of labour···কথাটা আপনি বোধহয় বোঝেন?···"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল তড়িৎ, প্রশ্নটাতে আবার সচেতন হয়ে উঠে বলল— "শুনি কখনও কখনও।···কিন্তু ও-অনুরোধ করবেন না আমায়, আমি ভেতরে যেতে পারব না। পেটের দায়ে রিক্‌শা চালাচ্ছি, অন্য কোন উপায় না

দেখে। আদর্শ প্রচার করা তো উদ্দেশ্য নয়।…আচ্ছা, আসি তাহলে নমস্কার—

প্যাডেলে চাপ দিয়েই আবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকটা চেপে ধরল; বলল—"বরং আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে—আমি যে রিক্‌শা চালাচ্ছি একজন বাঙালী, এ-কথাটা আপনি প্রকাশ করবেন না—কারুর কাছেই নয়। অনুরোধটা রাখবেন আশা করতে পারি?"

মল্লী একটু মূঢ়ভাবে চেয়ে বলল—"তা রাখব না কেন।—আপনি যদি চান। কিন্তু…"

তড়িৎ আবার প্যাডেলে চাপ দিয়েছিল, বাধা দিয়ে একটু হেসে বলল—প্রবঞ্চনাটা চালিয়ে যেতে সাহায্য করা হবে, এই তো? তার জন্যে এবার আমিই ক্ষমা চেয়ে রাখছি। নমস্কার।"

(ছয়)

এর পর মল্লী খুঁজেছে। বাঙালীর ছেলে, রিক্‌শা চালায়, ভদ্র বলেই মনে হয়, হয়তো একটু-আধটু শিক্ষিতও; 'dignity of labour' বাক্যটা ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছিল মল্লী, যাচাই করবার জন্য, উত্তর পেলে—"শুনি কখনও কখনও"; সব মিলিয়ে একটা কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক; তার ওপর যে অপ্রীতিকর ব্যাপারটুকু হয়ে গেল—ছেলেটি তাতে যে দৃঢ়তার সঙ্গে আত্মমর্যাদার পরিচয় দিল, তাতে একটা শ্রদ্ধা অনুকম্পা মিশ্রিত অনুতাপও আসে; মল্লী খুঁজেছিল।

কিন্তু খোঁজ মানে তো যে-রিক্‌শাগুলার ওপর নজর পড়ে, একটু ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেওয়া। দিনের বেলায় তড়িতের রিক্‌শা বেরোয় না। রাত্রে অত নজরে রাখাও শক্ত। রাত্রে নিয়মিত ভাবে বেরুবার মধ্যেও পড়ে শুধু সপ্তাহে তিনদিন করে গান শিখতে যাওয়া আর আসা। মল্লী যতটা পারে রাখে দৃষ্টি সতর্ক, কিন্তু ফল হয় না। তারপর ক্রমে ক্রমে ঝোঁকটাও গেল কেটে। একটা নিছক কৌতূহলই বৈ তো নয়। সামান্য একটু যে অনুতাপ তাই বা কতদিন থাকে মানুষের?

গোড়ায় গোড়ায় কয়েকদিন মাস্টারমশাইয়ের কক্ষ থেকে বেরিয়ে মনটা যেন অহেতুক প্রত্যাশায় হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠেছে—দু'দিন যে রিক্‌শাটা পাওয়া গিয়েছিল, আবার হয়তো পাওয়া যেতেও পারে; তার পর সে-ভাবটাও গেল মিটে। আর একটা

কথাও তো চিন্তার মধ্যে এসে পড়ে,—ধরা যাক, যেতে যেতে হঠাৎ পড়ে গেল চোখে ; ডাক দেওয়া যাবে না তো। সমস্ত ব্যাপারটুকু আস্তে আস্তে মন থেকে মিলিয়ে গেল।

মাস-তিনেক বেরিয়ে গেল।

তবু পড়ত্তে পারত নজরে ; কিন্তু মল্লী যেমন খুঁজছে তড়িৎ ওদিকে তেমনি সাবধানে পরিহার করে গেছে। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির ও-পথটা ছেড়েই দিয়েছে একরকম। যদি বা গেল, ঐখানটায় গিয়ে উল্‌টোদিকে মুখ ঘুড়িয়ে তাড়াতাড়ি প্যাডেল করে বেরিয়ে গেছে। শহরের অন্যদিকে মল্লীদের বাড়ির রাস্তায় একেবারেই যায় না।

যে ব্যাপারটুকু হয়ে গেল তার একটু ধাক্কা লেগেছেই মনে। একটা হালকা আশঙ্কাও যে লেগে রয়েছে এটা না মেনে উপায় নেই। এদিকে কাজটা করে করে একটা বেপরোয়া ভাবও এসে গেছে ; একটা সুস্থ আত্মবিশ্বাস। মেহনতের হোলেও অল্প-সময়ের কাজ, স্নায়ু-পেশীগুলো দৃঢ় হয়ে উঠেছে ; স্বাধীন উপজীবিকা, তার সঙ্গে স্বাস্থ্যের আনন্দ, তবু একটা কুণ্ঠা কোথায় যেন লেগেই থাকে, মনে হয় বাঙালী মহলে এই সত্যটুকু নিয়ে দাঁড়াতে না হলেই যেন ভালো। ওর আর একটা ভয়, বাঙালী মহলে জানাজানি হয়ে গেলে কি করে যেন কথাটা মানপুরে পৌছে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অবশ্য মল্লীকে সেদিন যতটা বুঝল তাতে হালকা মেয়ে বলে মনে হয় না ; কথাও তো দিল একরকম ; তবু ভয় হয় কে জানে, মেয়েই তো,—ভেতরে কতটা দুর্বল, কতটা লঘু কে তার খবর রাখে ? হয়তো শহরে চারিয়েই পড়েছে খবরটা বাঙালী মহলে—হয়তো বা এই আকারে যে একটি বাঙালী যুবক পশ্চিমা সেজে রিক্‌শা চালিয়ে বেড়াচ্ছে—প্রবঞ্চনা করে ; মুখে মুখে আরও কী ভাবে শাখা-পল্লবিত হয়েছে খবরটা কে জানে ?

সব মিলিয়ে রিক্‌শাটা যেন ধীরে ধীরে গৌণও হয়ে এসেছে ওর জীবনে। অন্ততঃ আর একটা ক্ষেত্রে ওর মনটা দিন-দিনই কৌতুকে-আনন্দে প্রসারিত হয়ে উঠেছে। অখিলের বাড়ি নিয়ে, বিশেষ করে পড়াশোনার দিকটা। এটাকে অবলম্বন করে ওর রাঁচির জীবনযাত্রার একটা বেশ বড়গোছের পরিবর্তন এসে গেছে।

অখিলের বাড়িটা ছোটখাট পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট হলেও একটা অভাব অনেকদিন থেকেই অনুভব করেছে সবাই ; একটা বৈঠকখানা। যখন বাড়িতে হাত দেওয়া হয়, তখন বেশ হিসেব করে খরচপত্র করতে হচ্ছে, প্রয়োজন মেটে এই গোছের একটা বাড়ি তুলে ফেলতে হয়েছিল—কাঁচা উঠোন, ইটের দেয়াল, খোলার ছাউনি। তারপর আস্তে আস্তে পাকা উঠোন হয়েছে, রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ছেড়ে বাকী

ঘরগুলার খোলা চাল সরিয়ে ছাতও দেওয়া হয়েছে। ওরই মধ্যে একটা ঘর ভেতর-বার দুদিকেই ব্যবহার হয়। এইতেই ছেলে-মেয়েরা পড়ে, কেউ এল-গেল, বসে। চলে যাচ্ছিল একরকম।

এরপর কারবার বেড়েছে, নানারকম লোকের যাতায়াত হচ্ছে, আলাদা বৈঠকখানার প্রয়োজন অনুভব করছে সবাই। এখন টাকার সেরকম অনটন নেই, তবে কাজের চাপেই সময় করে উঠতে পারছিলেন না অখিল, সম্প্রতি হাত লাগিয়েছেন। খানিকটা উঠেছে ঘরটা।

এইসময় একদিন একটা ব্যাপার হলো। বর্ষাকাল, পাহাড়ে দেশের বর্ষা আরও অনিশ্চিত, আকাশ ভালো দেখেই বেড়িয়েছিল তড়িৎ, ফিরে এল প্রবল বর্ষণ মাথায় করে। রিক্শাসুদ্ধ সোজা বাড়িতেই এসে উঠেছিল, মাথা গা হাত মোছা হোলে সরোজিনী একেবারে রান্নাঘরে ডেকে নিলেন। বৃষ্টি পড়লেই এখানে ঠাণ্ডা, ভিজেছেও খুব, উনুনের সামনে একটা ছোট টুল দিয়ে বললেন—"বোসো।"

উনুনে চায়ের কেট্‌লি চড়িয়ে দিয়েছেন। রতি চা আর চিনির কৌটো এনে সামনে রেখে দিয়ে চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কথা নেই কারুর মুখে, সরোজিনী মুখটা বেশ গম্ভীর।

কতকটা নিস্তব্ধতার অস্বস্তিটুকু কাটাবার জন্যেই তড়িৎ বলল—"খুব ভিজে গেছি আজ।…হঠাৎ বৃষ্টিটা নামল কিনা?…থামবেও যে কখন…"

রতি প্রশ্ন করল—"বাসায় যাবেন?"

কণ্ঠস্বরে একটু ব্যঙ্গ আছে।

সরোজিনী কেট্‌লি নামিয়ে চা ছেড়ে দিলেন। ভাবটায় বোধ হচ্ছে যেন কান পেতে রয়েছেন উত্তরটা কী হয়।

তড়িৎ বলল—"যেতে হবে না?"

সরোজিনী ঘুরে বসলেন, বললেন—"না, যাওয়ার তো কথাই আসে না এই দুর্যোগ মাথায় করে, তোমার এ-আদাড়ে কাজও ছাড়তে হবে, ঠাকুরপো। কাজ বলব কি আদাড়ে শখ- বলব তাও তো বুঝতে পাচ্ছিনে, অন্য উপায় থাকতেও যেমন কামড়ে পড়ে আছে।…কিন্তু ধরো যদি অসুখেই পড়ে গেলে, বিদেশ-বিভুঁই, কেউ আত্মীয়-স্বজন কাছে নেই…"

"এর চেয়ে আত্মীয়-স্বজন আর কোথায় পাব?"—একটা কথা বলতে পেরে যেন

বাঁচল তড়িৎ। সমস্ত ব্যাপারটুকু হালকাও করে দেওয়ার জন্য জুড়ে দিল—"ক'টা আত্মীয়-স্বজন ডেকে একেবারে হেঁশেলে ঠাঁই দেয়।"

সরোজিনী চা ছাঁকতে ছাঁকতে বললেন—"তা বেশ তো, এমন আত্মীয়-স্বজনের কথাও তো শোনা উচিত ; ছেড়ে দাও এ-কাজ।"

"আপনি বললেন—যদি অসুখে পড়ি তো দেখবে কে…"

"তাই অসুখে না পড়লে চলবে না ?"—চা'টা হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন সরোজিনী। রতি টিপ্পনী করল—"বাঃ, কত আত্মীয়,—পরীক্ষা করতে হবে না ভালো করে ?"

চায়ে চুমুক দিয়ে ওর দিকে চোখ তুলে চেয়ে হাসল তড়িৎ।

অখিল এসে উপস্থিত হোলেন। কারখানায় ছিলেন, সেখান থেকেই তড়িৎকে এদিকে রিক্শা নিয়ে আসতে দেখছেন। একটা কাজে আটকে ছিলেন, এসেই উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করলেন—"খুব ভিজে গেছ নিশ্চয় ?"

সরোজিনী বললেন—"বেশি আর কৈ ? এখনও শখ মেটেনি, বাসায় যাবেন বলছেন।"

"সেকি !"—বলে একরকম শিউরে উঠলেন অখিল ; বললেন—"যাওয়ার তো কথাই ওঠে না এ-রাত্রে,—প্রায় এক মাইল পথ—আমি আর একটা কথা ঠিক করে ফেলেছি তড়িৎ, তোমায় ও-বাসাও ছাড়তে হবে।"

"ও বাসা ছেড়ে… ?" প্রশ্নটা অর্ধেক পথে ছেড়ে দিল তড়িৎ।

অখিল বললেন—"এ-বাসায় আসা। অবশ্য এও জানি তুমি তাতে রাজী হবে না, হোলে রিক্শা ছেড়ে টুইশনি নিতে রাজী হতে। তবে আমি তার ব্যবস্থাও ঠিক করে ফেলেছি। আমার বেশ একটু আয়ও বাড়বে মাঝখান থেকে।"

তড়িৎ মুখ তুলে চাইল।

"বাইরের ঘরটা তুলছি তো। ওর সঙ্গে আরও দুখানা ছোট ছোট ঘর জুড়ে—ভাঁড়ার আর রান্নাঘর—চারিদিকে একটা দেয়াল টেনে আলাদা বাসাই করে দিচ্ছি তোমায়। এসে থাকো, ভাড়া দাও। আর আপত্তি থাকতে পারে না।…না, আর ছাতটাও পেটাব না এখন। ভাড়া বেশি পড়ে যাবে…"

সরোজিনীকে সাক্ষী মানলেন—"কি গো" ?—

সরোজিনী মাথা নীচু করে শুনছিলেন, একটু মুখ টিপে হেসে বললেন—"তা বইকি ; এমন কি আত্মীয় যে ছাড়ব আমরা ?"

আত্মছন্দটা অনেকদিন চালিয়েছিল তড়িৎ। তারপর বড় ঘরটা শেষ হয়ে যখন ভাঁড়ার-রান্নাঘরের বনেদ খোঁড়া হবে, অখিলকে বলল—"দাদা, আর কত লজ্জা দেবেন ছোট ভাইকে ?"

এসে উঠল ঘরটাতে।

ঐ পর্যন্তই অবশ্য ; আর সব ব্যবস্থা নিজের। সব ব্যবস্থা বলতে প্রধানত আহারের ব্যবস্থা ; সেটা আগের মতো কুকারেই চলছে। ঘরটা বড়, ক্যাম্বিসের পার্টিশন দিয়ে হাত-তিনেক চওড়া একটা ফালি আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, তাতেই ভাঁড়ার, তাইতেই কুকারটা পাকশালার কাজও করে যায় আপন মনে। ওদিকটা তড়িতের চৌকি পাতা, একটা টেবিল, দেবদারু কাঠের শেল্‌ফে বই, একটা লোহার চেয়ার।...ঘরটি বাড়ি থেকে কি ভেবে একটু আলাদা করেই ফেঁদেছিলেন অখিল, হাত-চারেকের একটা বারান্দা দিয়ে মূল বাড়ির সঙ্গে যোগ করা ; এতেও পার্থক্যের ভাবটা বজায় রয়ে গেছে।

মিটে আসতে লাগল পার্থক্যটুকু। জোর করে আপন হয়ে যেমন ঘাড়ে পড়া যায় না, তেমনি আবার সহজে আপন হয়ে গিয়ে তো দূরে পড়ে থাকাও কঠিন। একদিন ও-বাড়ির বাইরের ঘর থেকে ছেলেমেয়েদের পড়ার চৌকিটা এ-ঘরের একপাশে এসে উঠল, টেবিলের পাশে বিমলের পড়বার চেয়ারটা, তড়িতের শেল্‌ফের পাশে বিমলের বইয়ের শেল্‌ফটা এসে হাজির হোল। পড়ার হাঙ্গামটা মিটে গিয়ে ও-ঘরটা খাঁটি বৈঠকখানা হয়ে রইল।

অখিল বললেন—"এ-যে উল্টো উৎপত্তি হোল, তড়িৎ। সেখানে যেটুকু সময় পাচ্ছিলে তবু নিজের করে পাচ্ছিলে।"

যেটা অনুভব করেছে অন্তর দিয়ে সেটা বলতে পারল না তড়িৎ—একটু সময় দিয়ে যদি এতগুলিকে নিজের করে পাওয়া যায় তো দিতে হয় না ?...মুখ ফুটে কিন্তু বলা যায় না ; বলল—"সময় তো নিজেরই রইল, অখিলদা ; ও আর কে কেড়ে নেবে ?"

অখিল ওর কোন কাজেই বাধা দেন না, হেসে বললেন—"বেশ, যেমন বোঝ।"

আর রবিবারে-রবিবারে নয়, বিমলকে পড়ানোটা নিয়মিত হয়ে গেল। সকালে ছাত্র-মাস্টারটি এলে ওরা বারান্দায় বেরিয়ে যায়। তড়িৎ কুকারে রান্না চাপিয়ে ভেতরে নিজের বই নিয়ে বসে। সে চলে গেলে, বিমল ভেতরে এসে তার চেয়ারটিতে বসে যায়। বাকী সব ছুটি পেয়ে চলে যায় বাড়ি।

বাড়িতে যে-কথাটা সবাই অনুভব করছিল, সরোজিনী একদিন সে-কথাটা প্রকাশ করেই বললেন, হয়তো অখিলের নির্দেশেই—"ঠাকুরপো, আমার সাতখুন মাপ, যা মনে

হচ্ছে বলি ভাই, তারপর তোমার যেমন অভিরুচি। অবিশ্যি আগেও বলা হয়েছে…"

তড়িৎ হেসে বলল—"বলুন।"

"আর হাত পুড়িয়ে এরকম ভাবে কতদিন যাবে? চোখের আড়ালে হচ্ছিল, দেখতে হচ্ছিল না, সে একরকম ছিল।…"

তড়িৎ হেসেই বলল—"হাত যদি পোড়ে, সে তো রতির হাত, বৌদি…"

"রতিই বা সবটুকু করতে পায় কোথায় সব দিন? গিয়ে দেখে নিজেই চাপিয়ে দিয়েছে কখন, না-হয় নিজেই নামিয়ে নিয়ে বসে গেছে খেতে।…যাক সে কথা, এটা তো অস্বীকার করতে পারো না যে, বিমলের ভারটা নিজের কাঁধেই নিয়েছ একরকম তুলে…"

"মস্তবড় একটা ভার!"—বলে একটু চুপ করে রইল তড়িৎ, তার পর আবার বলল—"তাও কোথায়? মাস্টার তো এসে পড়াচ্ছেই বৌদি।"

"কার পড়ানোটা আসল তা কি আমরা বুঝি না ঠাকুরপো? বিমলও বলে। তাই বলছিলাম যখন নিয়েছ ভার তখন পুরোপুরিই নাও-না কেন?

নিরুত্তর দেখে বললেন—"তোমার আপত্তিটা কোথায় বোধ হয় আন্দাজ করতে পারি—বসন্তের চাকরিটা যাবে, ছেলে পড়িয়ে নিজের পড়া চালাচ্ছে বেচারি। কিন্তু তা কেন? ও যেমন রুবি আর অলককে পড়াচ্ছে তেমনিই পড়াবে—বই বাড়ছে ওদের, বেশি সময় দরকারও তো, বিমল পুরোপুরি তোমার হাতে থাক্‌।"

"একটা আপত্তি না হয় ঐ করে মিটল, কিন্তু আরও তো থাকতে পারে, বৌদি।"

"কি, বলো।"

একটু লজ্জিতভাবে চোখ তুলে হাসল তড়িৎ; বলল—"পুরো ভার নেওয়া মানে টিউটারি সম্বন্ধ এনে ফেলা তো? পড়াব, তার বদলে খেতে পাব, থাকতে পাব। আমি কিন্তু সে-সম্বন্ধ নিয়ে এ-বাড়িতে আসিনি, বৌদি। তার পর, যা পেয়েছি তাতে ও-লাভের সম্বন্ধে লোভ নেই আমার। যেমন আছি থাকতে দিন-না আমায়।"

আবার একটু হাসল।

দুজনেই একটু চুপ করে রইল। ঠিক হাসি নয়, একটি নিবিড় তৃপ্তি সরোজিনীর মুখখানি আলো করে দিয়েছে, এক সময় ঘাড়টা একদিকে একটু হেলিয়ে নিয়ে বললেন,—"কী এমন রাজ্যপাট পেয়েছ ভাই, দাদা-বৌদির হাতে?…বেশ, যেমন পছন্দ সেইভাবেই থাকো। আপন ভাবো বলেই দেখে কষ্ট হয়—কুকারে খাওয়া, এক কোণে রয়েছ বলে ঘরের ভাড়া দেওয়া…"

"না বৌদি, ঘর-ভাড়া আমি আর দিতে পারব না, অখিলদাকে তুমি বলে দিও…"

—ওর কথায় বাধা দিয়ে এমন ভাবে চমকে উঠে কথাটা বলল তড়িৎ, আপত্তিটাও ওর মুখে এমন অদ্ভুত ধরনের যে, সরোজিনী একটু বিস্মিতভাবে চেয়েই খিলখিল করে হেসে উঠলেন, ওর প্রশ্নটাও একটু গোলমেলে হয়ে গেল—"ওমা, কেন !"

সামলে নিতে যাচ্ছিলেন, তার আগই তড়িৎ সেইরকম বিপন্ন ভাবেই বলল—"না, বৌদি, একে তো দিতে আমার হাত কাঁপছিলই, তার উপর উনি মুখটা এমন করুণ করে—একটু হেসে হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন যেন—যেন…না বৌদি, ভাড়া আমি দিতে পারব না এ-মাস থেকে…"

এর পর কি করে রান্নার কুকারটা সম্পূর্ণ রতির এলাকায় চলে গেল, তারপর সেখান থেকেও কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তার আর কোন হিসাব রাখা হয়নি।

বর্ষায় রিক্‌শার কামাইও হয় মাঝে মাঝে। এইরকম দিনে শুধু যে বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয় তাই নয়, বাড়ির সঙ্গে যোগটা হয় আরও নিবিড়। এবার বর্ষাটা পড়েছেও বেশি করে। একবার যদি আরম্ভ হোল তো আর থামতেই চায় না; চারদিন, পাঁচদিন, সাতদিন—চলেছে তো চলেছেই। দিনের বেলায় যদি বা একটু ধরন হোল, সন্ধ্যা থেকে তো আর বিরাম নেই।

সবাই বেশ জমে বসে, তড়িতের ঘরে, কি বাইরের ঘরে, গল্পগুজব হয়, ক্যারম খেলা চলে। চা-পানের সময়টা শীতেল হাওয়ায় রান্নাঘরেই জমে ভালো। তড়িৎ অনুযোগ করে—"রিক্‌শাটি বের করতে যাব, অমনি যেন টনক নড়ে আকাশের, একে খলুমি বলব না বৌদি ?…মুখ টিপে টিপে হাসছ যে ?"

রতি ছোট্ট করে বলে—"আমি আকাশেরই দিকে। অমনি তো যাবে না বদ অব্যেসটা…"

(সাত)

হয়তো যেতোই ছেড়ে। প্রয়োজন এসেছে কমে, তার ওপর বর্ষায় প্রায় নিয়মিত কামাইয়ের জন্যে অভ্যাসটাও অনেকখানি শিথিল হয়ে এসেছে; আস্তে আস্তে বোধহয় ছেড়েই যেত, এমন সময় একটা ঘটনায় অবস্থাটা আবার পালটে গেল।

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে, কার্তিক মাস, পূজার আর অল্পদিন আছে। এই সময়টা

রাঁচির 'সিজ্‌ন', চারিদিক থেকে নানারকম লোক এসে পড়ে,—স্বাস্থ্যান্বেষণে, বেড়াতে। বিশেষ করে বাঙালীর জীবনে একটা স্পন্দন আসে, নানারকম আমোদ-অনুষ্ঠান, বক্তৃতা প্রভৃতির ধুম পড়ে যায়। তড়িৎ যদি সন্ধান পেল তো বক্তৃতাগুলো বাদ দেয় না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অ-বাঙালী পাড়ার একটা স্ট্যাণ্ডে রিক্‌শা নিয়ে একটু অন্যমনস্ক ভাবে অপেক্ষা করছিল, দুটি বাঙালী ভদ্রলোক একটু হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত হোল; একজন প্রশ্ন করল—"কেরায়া যায়গা?—রামকৃষ্ণ মিশন?"

অন্যমনস্ক ছিল বলেই তড়িৎ একটু যেন চকিত হয়ে উঠে প্রশ্ন করে ফেলল—"কেয়া হ্যায় উহা?"

উত্তর হোল বেশ একটু বিরক্তিসূচক—"খেলে কচু-পোড়া! কেয়া হ্যায় উস্‌সে তোম্‌হারা কেয়া? লেকচার হ্যায়, বুঝা? তোম যায়গা কি নেহি বোলো না।"

"নেহি।"—হঠাৎ প্যাডেলে একটা চাপ দিয়ে রিক্‌শাটা রাস্তার দিকে ঘোরাল।

আর রিক্‌শা নেই। সঙ্গীটি একটু অধৈর্য হয়ে বলল—"বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে, না হয়..."

প্রথম ভদ্রলোকটি বলল—"যাস্তি কেরায়া দেগা...ডবল..."

"নেহি"—বলে তড়িৎ ততক্ষণে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে; জোরে চালিয়ে দিল রিক্‌শা। নিত, দেরি হয়ে যাচ্ছে শুনেই আর নিল না। দুটি আরোহী, আবার দুটিই বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

হালকা গাড়ি খুব জোরে চালিয়ে অল্পসময়ের মধ্যেই গেল পৌঁছে। রিক্‌শাটায় তালা লাগিয়ে ভেতরে গিয়ে লেকচার শুনতে বসে গেল। অদ্বৈতাশ্রম থেকে একজন সন্ন্যাসী কলকাতায় যাওয়ার পথে নেমেছেন, তিনিই দিচ্ছেন বক্তৃতা; ভিড় হয়েছে।

বেশ মনোজ্ঞ বলবার ঢং, তেমনি পাণ্ডিত্য। নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে একমনে শুনছিল তড়িৎ, ধারেই বসেছিল, একটা বিরতির মুখে হঠাৎ দৃষ্টিটা দূরে মাঝামাঝি একটা জায়গায় গিয়ে পড়তে সমস্ত শরীরটা যেন ওর হিম হয়ে গেল।

সেই মেয়েটি; নামটা মনে আছে—মল্লী।

ঠায় ওর দিকে তাকিয়ে আছে মল্লী, বড় বড় চোখদুটো কৌতূহলে যেন জ্বলছে; বেশ বোঝা যায় তড়িতের মনটা যে পরিমাণ বক্তৃতার দিকে, ওর মনটা সেই পরিমাণ বক্তৃতা থেকে বিচ্ছিন্ন। পাশে একজন গৌরকান্তি বৃদ্ধ, মল্লী যেমন তাঁর কাছ ঘেঁষে বসে আছে, বুঝতে আর বাকি থাকে না ইনিই ওর সেই অভিভাবক, জ্যাঠামশাই।

বাঘও নয় ভাল্লুক নয়, কিন্তু যে বিপুল আগ্রহ নিয়ে চেয়ে ছিল মল্লী তার জন্ত এবং নিশ্চয়ই ওর জ্যাঠামশাই সঙ্গে থাকার জন্তও, প্রথম ধাক্কাটা সামলে ওঠার পরও অস্বস্তিটা কোনমতেই কাটিয়ে উঠতে পারল না তড়িৎ। চোখ ঘুরিয়ে নিয়েও কয়েকবার আবার দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল, বেশ মনে হোল মল্লী ফেরায়নি চোখ। ধারেই বসে ছিল তড়িৎ, একসময় আস্তে আস্তে উঠে পড়ল।

খানিকটা গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একবার ঘুরে দেখে, ওরা দুজনেও উঠে দাঁড়িয়েছে।··· বেরিয়েও আসছে ভিড়ের পেছন দিয়ে। মল্লী রগ-দুটোয় আঙুল টিপে এমন একটা ক্লান্ত ভাব মুখে টেনে এনেছে, বেশ বোঝা যায় মাথা-ধরা বা মাথা-ঘোরার ওজুহাত করেছে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে। তড়িৎ যতক্ষণে বাইরে এসে রিক্‌শার তালা খুলছে, ততক্ষণে ওরা দুজনেও বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল।

মল্লীই প্রশ্ন করল, হিন্দীতেই—"কেরায়া যায়গা ?"

তড়িৎ মাথা নীচু করে আলোটা জ্বালছিল, ঘাড়টা তুলল, একটা অদ্ভুত ধরনের দৃষ্টি-বিনিময় হোল দুজনে। গোটাকতক মুহূর্ত বেরিয়ে গেল মাঝখান দিয়ে, তারপর আলোটা জ্বালতে-জ্বালতেই তড়িৎ জবাব দিল—"যায়গা।"

উঠে বসল দুজনে। তড়িৎ রিক্‌শাটা ঘুরিয়ে চালিয়ে দিল।

"তোমার মাথাটা ছাড়ল, মা ?" খানিকটা গিয়ে বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ, ছেড়েছে।"

"জেরা জোর কর্ দেও ভাইয়া।"—

বৃদ্ধের অনুরোধে তড়িৎ পা চালিয়ে দিল। বৃদ্ধ বলেই চললেন—"বেশ ভিড়।··· তা হোক, হবেই ; কিন্তু অত আলোর ছড়াছড়ি কেন এটা আমি বুঝি না। মাঝখানে একটি আলো থাকলেই যথেষ্ট, তারপর এমন চমৎকার জ্যোৎস্না তো রয়েছেই। এই ধরনের বক্তৃতায় ঠিক উপযোগী হোত পরিবেশটি। তা নয়, খানিকটা শো (show) এখানেও থাকা চাই !···কেমন যেন একপেশে হয়ে পড়েছে না আমাদের জাতীয় জীবনটা —তোমার কি মনে হয় মল্লী-মা ?—যে ধর্মের দিকে এগুবে তার এস্‌থেটিক সেন্সটা থাকবে না, যে সাহিত্যের দিকে এগুবে তার নীতিজ্ঞানটা জলাঞ্জলি দিতে হবে···এমনটি কিন্তু ছিল না এদেশে আগে···"

বয়সের দোষেই বোধহয় বকেন একটু বেশি। বক্তৃতার বিষয়টাও পড়ল এসে—বিষয়বস্তু, ভঙ্গী, জ্ঞানবত্তা—আলাপটা কিন্তু একতরফাই প্রায়। তড়িৎ বুঝছে, মল্লী স্বভাবতই খুব অন্তমনস্ক, উত্তর দিচ্ছে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে—'হাঁ—না—তা বইকি—

তা ভিন্ন আরকি ?'…দু'একবার উল্টা-পাল্টাও করে ফেলল। বৃদ্ধ সংশয় প্রকাশ পর্যন্ত করলেন—"মাথাটা কি তোমার ভালো করে ছাড়েনি মা এখনও ?"

"ছেড়ে গেছে তো জ্যাঠামশাই।…ভাবছিলাম কী সুন্দর বক্তৃতাটা দিলেন স্বামীজি …উঠে আসতে হোল—এখন আপশোস হচ্ছে!"—বেশ সতর্ক হয়েই উত্তরটা দিল। চেষ্টা করে রইলও খানিকটা সতর্ক এবার। তবে আলাপটাই একতরফাই চলল, তারই মধ্যে রিক্‌শাটা এসে বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়াল।

বৃদ্ধই আগে নামলেন, মনিব্যাগটা বের করে প্রশ্ন করলেন—"কেৎনা লেগা ?"

উত্তরের আগে মল্লীর কথা এসে পড়ল। নামতে যাচ্ছিল, একটু থেমে গিয়ে বলল—"আমি বলছিলাম এক কাজ করলে হয় না জ্যাঠামশাই ? যখন সকাল-সকাল চলেই আসতে হোল ওখান থেকে, তখন মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে যদি ঘুরে আসি একবার ? রিক্‌শাটা তো রয়েছেই।"

বৃদ্ধ একটু ভেবে নিয়ে বললেন—"তা মন্দ কি ? মাথাটা ভালো করে ছেড়েও যায় ; ঘরের মধ্যে গুমোটই তো।"

তড়িৎকে প্রশ্ন করলেন—"যায়গা ?"

চিন্তাধারাটা বেশ একটু আবর্ত সৃষ্টি করেই চলছিল তড়িতের মনে। মল্লী যে আরও জানতে চায় ওর সম্বন্ধে এটা বোঝা যায়, যেন খুঁজছিলই ; ওর কৌতূহলটা মার্জনীয়ও ; হিন্দীতে প্রশ্ন করায় বিশ্বাসের সঙ্গে ওর প্রতি একটা শ্রদ্ধাও আসে ; কিন্তু সেই জন্যই—শ্রদ্ধা আসে বলেই আবার লুকোচুরিটা কেমন যেন ভালো লাগছে না—ঐ হিন্দী বলাটাই, তারপর আবার এই একটা ছুতো করে বেরিয়ে যাওয়াটা।

সোজা বাংলাতেই দিল উত্তরটা—

"আমার আর আপত্তিটা কি বলুন ? ভাড়া পেলেই হোল।

দুজনেই বিস্মিতভাবে চাইল, মল্লীর বিস্ময়টা বৃদ্ধের চেয়ে কিছু কম নয়। প্রশ্নটা করলেন অবশ্য বৃদ্ধই—

"তুমি বাঙালী !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।

"বাঙালী রাঁচিতে কেউ রিক্‌শা চালায়—মানে শরীরের মেহনৎ করে জীবিকা উপার্জন করে নিজের—জানতাম না তো আমি!"—বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশংসার দৃষ্টিটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মল্লী সুযোগটা ছাড়ল না, যদিও তার দরকার ছিল না কোন ; বলল—"কেউ আপনাকে বলবে তবে তো জানবেন জ্যাঠামশাই।"

"হ্যাঁ, তাতো বটেই।...বেশ বেশ, জাতটা শ্রমের মর্যাদা ভুলে কোথায় যে নেমে গেছে—দৈহিক শ্রমের কথা বলছি—এমনি তো দশটা-পাঁচটা কলম পিষতে এ-জাতের জুড়ি নেই...তাহলে তুমি বাঙালী ?"—সেইরকম প্রশংসায়-বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি নাম ?...কর কি ?"

মল্লী কৌতূহলে উৎকর্ণ হয়ে একটু চুপ করে রইল মাথাটা নীচু করে, কয়েক সেকেণ্ড, তার মধ্যে উত্তরটা না পেয়ে মুখটা তুলে বলল—"সে-সবের দরকারটা কি আমাদের জ্যাঠামশাই ? বাঙালী, যে কোন কারণেই দরকার হওয়ায় রিক্‌শা-টানাটাকে ছোট কাজ মনে করেন না, এই তো যথেষ্ট..."

একটু অপ্রতিভই হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ ; বললেন—"তাতো বটেই, তাতো বটেই। না, আমি বলছিলাম—অ্যামেরিকার অনেক ছাত্র ক্ষেতে-ফ্যাক্টারিতে রোজগার ক'রে নিজেদের পড়ার খরচ চালিয়ে নেয়, যদি..."

বোধহয় আন্দাজটা খুব কাছাকাছি এসে পড়ার জন্য, তড়িৎ প্রশ্ন করল—"যাবেন কি উনি কোথায় বলছিলেন ?"

"যাবে মা মল্লী ? আমি বলছিলাম না-হয় ছেড়েই দিতে আজ। মেহনৎ হয়েছে, ওখানে ঐ অবস্থা, তারপর এতটা পথও তো, বোধ হয় একটু চা'টা খেয়ে নিয়ে বারান্দায় বসলেই হোত, চা কিম্বা সরবৎ..."

উদ্দেশ্যটা বুঝতে দেরি হোল না মল্লীর, আনন্দ-উত্তেজনায় গলাটা যেমন কেঁপে যাচ্ছে ওঁর। ওরও চেষ্টা যদি আটকাতে পারে তড়িৎকে ; একটু হেসে বলল—"আমার আর মেহনৎ কি জ্যাঠামশাই ? এতটা পথ রিক্‌শা টেনে নিয়ে এসেও তো চলে যাচ্ছে লোকের।"

বৃদ্ধ তড়িতের দিকে চেয়ে বললেন—"তা যাচ্ছে বৈকি, তা বলে মেহনৎ কি কম হচ্ছে...তুমিও না হয় একটু জিরিয়ে চা'টা খেয়ে যাও না।"

তড়িৎও হেসেই উত্তর করল—"মেহনৎ—ওটা তো আমার অব্যেস। বরং জিরুনো, চা খাওয়া—এইটেই বদ অব্যেসের মধ্যে পড়ে, কে আর ডেকে অত খাতির করছে বলুন না ? খাটিয়ে ভাড়া দিতেই গুঁইগাঁই করে।"

এবার সোজাসুজি একটু চাপাচাপিই করে বসলেন বৃদ্ধ ; বললেন—"তবু একটু

যাও-ই না হয় বসে, মল্লীর ইচ্ছেটা বোধহয় তাই। আর একবারেই তো একটা অভ্যেস হয়ে যায় না।"

একটা লোভ হচ্ছেই তড়িতের; সংসক্ত, বিশেষ করে সেখানে তার বৃত্তিটাও অনুমোদন পাচ্ছে এরকম করে; তা ভিন্ন মল্লীরও আর একটা দিক দেখছে তো, দ্বিধা সরে গিয়ে কৌতূহলটা উঠছে জেগে। তবুও চুপ করেই কি বলবে ভাবছিল, তার আগে মল্লীই বলল—"মল্লীর ইচ্ছে-অনিচ্ছের কি আছে এতে বলুন? আসেন উনি, চা ঢেলে আপনার সঙ্গে ওঁকেও দোব। তবে চাইবেন কি আসতে? আপনি এখুনি আবার একরাশ প্রশ্ন করে বসবেন—কি নাম, কার ছেলে, কোথায় বাড়ি, কি করেন—যা উনি বোধহয় চান না…"

তড়িৎ হেসে বলল—"নাম আমার তড়িৎকুমার…তড়িৎকুমার মিত্র। বাড়ি বর্ধমান…"

একেবারে হকচকিয়ে গিয়ে মল্লী ওর মুখের দিকে চাইল, পরক্ষণেই সচেতন হয়ে উঠে যেন নূতন কিছু হয়নি এইভাবে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে হেসেই বলল—"তারপর আপনি এখন এই নিয়ে সবার কাছে আলোচনা করবেন…"

তড়িৎই হেসে বলল—"আলোচনার যুগ্যি এমন কিছু নয় বলেই লজ্জা আর আপত্তি। …তাইলে বসতেই বলছেন একটু?" রিক্শার মুখটা ঘোরাল।

ফটকটা ভেজানই ছিল, ছিটকিনিটা খুলে পাল্লা দুটো ঠেলে দিয়ে বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো…কি জানো?—কোন্‌টে আলোচনার যুগ্যি, কোন্‌টে নয় কিছু বলা যায়? এব্রাহাম লিন্‌কল্‌ন প্রথম বয়সে নিজের রুজি উপার্জন করবার জন্যে কী-না করেছেন?—কোন কাজকেই তো ছোট মনে করেননি। তার পর একসময় তিনিই হলেন কিনা অ্যামেরিকার প্রেসিডেণ্ট।…নাম শুনেছ বোধহয়?"

তড়িৎ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। গাড়িবারান্দায় এসে পৌঁছেছে, রিক্শাটা ছেড়ে দিয়ে ওঁদের সঙ্গে বারান্দায় উঠতে উঠতে হেসে বলল—"তত বড় কেউ যখন হব তখন তো আলোচনা করে নাম বের করতে হবে না…"

মল্লীও লঘুভাবে হেসেই সমর্থন করল—"ঠিক তো, তখন নাম বের হওয়ার জন্যেই আলোচনা হবে—আলোচনার হিসেব থাকবে না।"

বৃদ্ধ বললেন—"না, আমার বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, এই ধরনের ছেলেরাই এগিয়ে যায় জীবনসংগ্রামে নিজের পথ করে। সবাই অবশ্য যে প্রেসিডেণ্ট হচ্ছে এমন নয়…"

মল্লী আরও লঘু করে দিয়ে বলল—"আর প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্যে সবাইকে রিক্‌শা চালাতে হবে এমনও তো নয়।...আপনারা বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থাটা করে দিয়ে আসছি এখুনি।"

অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হোল। বক্তা প্রায় আগাগোড়াই বৃদ্ধ নিজে। আলোচনাটা প্রধানত বাঙালীর অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে। তড়িৎ বোধহয় প্রথমদিন বলেই আলোচনায় বিশেষ যোগ না দিয়ে একরকম নীরব শ্রোতা হয়েই রইল; কতকটা নবপরিচিতদের বুঝে যাওয়ার মনোভাব নিয়ে। মল্লীও একরকম নীরবই রইল, তার কারণ তাকে সতর্ক থাকতে হোল বৃদ্ধ অবাঞ্ছিত প্রশ্ন না করে বসেন হঠাৎ। বার তিন চার কথার মোড় ঘুরিয়েও দিতে হোল তাকে।

(আট)

বৃদ্ধের নাম দেবপ্রসন্ন। ওঁরা ব্রাহ্মণ, পদবী লাহেড়ী। পিতৃবন্ধু, তাই থেকেই মল্লীর জ্যাঠামশাই, নয়তো মল্লী কায়স্থকন্যা, ওর পিতা অনাথ বসু হাজারীবাগের একটি মহকুমায় ওকালতি করেন। লেখাপড়ার জন্য কন্যাকে বন্ধুর অভিভাবকত্বে রেখে দিয়েছেন।

দেবপ্রসন্নর কর্মজীবনের গোড়ার দিকটা কেটেছে বম্বের দিকে। বিলাতে শিক্ষানবিশী শেষ করে উনি ওদিককার বিভিন্ন অঞ্চলে কাপড়ের কলে চাকরি করেন—বম্বে, আমেদাবাদ, সুরাট। উত্তর-জীবনে বাংলাতেই চলে আসেন, মিলের চাকরি নিয়েই। এখানে এসে একটা জিনিস তাঁর চোখে বড় বেশি করে পড়ে; অনেক দেখেছেন, অনেক ঘুরেছেন, বাইরে আর সব জাতির মুক্ত স্বচ্ছন্দ সতেজ জীবন-প্রবাহের সঙ্গে বাঙালীর জীবন-প্রবাহের মন্থরতা—বহুক্ষেত্রে শুদ্ধতাই—ওঁর মনকে বড় পীড়িত করে। ওঁর মনের এই বেদনার প্রতিধ্বনি পান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের লেখায়। তাঁর কর্মিষ্ঠ জীবনের সঙ্গেও নিজের জীবনের মিল রয়েছে; আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, প্রায় শিষ্যত্বই গ্রহণ ক'রে ওঁর মতোই লেখার মধ্যে দিয়ে, আবার নিজের জীবনের আদর্শ দিয়েও স্বজাতিকে কর্মজীবনে আর সব জাতির সমস্তরে তুলে ধরবার ব্রত গ্রহণ করেন। সফল হননি, তার নৈরাশ্য বহন করে চলেছেন।

আর একটা, হয়তো গভীরতর নৈরাশ্য বহন করে রয়েছেন দেবপ্রসন্ন। জীবনে

অনেক কিছু মানেননি এবং সেই না-মানারই অভিব্যক্তি হিসাবে বিলাতেই একজন গুজরাটী ব্যবসায়ীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, সেই সূত্রেই বম্বে-প্রান্তে প্রথম চাকরিও, কিন্তু ওটাও সফল হতে পারেনি জীবনে। বাংলায় চলে আসার সঙ্গে বোধহয় এ-বেদনার সম্বন্ধ ছিল। বয়স তখন একেবারে উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি, কিন্তু আর বিবাহের দিকে গেলেন না।

রাঁচিতে এসে রয়েছেন প্রায় বছর সাত হোল। প্রয়োজন নেই, কর্মজীবন থেকে একটু সকাল-সকালই অবসর গ্রহণ করলেন, তারপর এই বাড়িটি কিনে এখানেই রয়ে গেছেন। মল্লী এসে রয়েছে প্রায় অতদিনই, কনভেন্টে ভর্তি হয়েছিল, এখন কলেজে এসে উঠেছে।

মল্লীদের সঙ্গে দেবপ্রসন্নর যোগাযোগ নিতান্তই আকস্মিক। তখন রাঁচি-হাজারীবাগে বাড়ি কেনা নিয়ে মাঝে মাঝে যাতায়াত করছেন, তারই একক্ষেপে, কলকাতায় ফেরবার পথে মল্লীর পিতা বসন্তবাবুর সঙ্গে গাড়িতে সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয়। একজন বাঙালী হাজারীবাগের সুদূর এক মহকুমায় রোজগারের জন্য বসেছে, সেখানে রেল নাই, অন্য যান-বাহনেরও বিশেষ সুবিধা হয়নি তখনও—এতে একেবারে মুগ্ধ করে তোলে দেবপ্রসন্নকে। বসন্তকুমারও স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, এবং যাত্রাপথের ঐটুকুতেই যে অন্তরঙ্গতা জন্মায় সেটা দীর্ঘ পরিচয়ের মতোই নিবিড় হয়ে ওঠে। বসন্তকুমার বেরিয়েছিলেন হাজারীবাগে কন্যার পড়ার ব্যবস্থা করতে। বেশ মনোমতো হোল না, তাই কলকাতাতেই কোন আত্মীয়ের ওখানে যাচ্ছিলেন, দেবপ্রসন্ন প্রস্তাব করলেন, যদি ওঁর আপত্তি না থাকে তো তিনি দায়িত্ব নিতে পারেন। হাতে স্বর্গ পাওয়া; বসন্তকুমার কন্যাকে নিয়েই চলেছিলেন কলকাতায়, আর আত্মীয়ের বাড়িতে না উঠে দেবপ্রসন্নর বাসাতেই গিয়ে উঠলেন। জায়গা হিসাবে হাজারীবাগের চেয়ে রাঁচি ভালো, তবে বাড়িটার জন্য দাম চাচ্ছিল বড় বেশি। একলা মানুষ, প্রয়োজন কম, একটু ইতস্ততঃ করছিলেন দেবপ্রসন্ন, ভাবছিলেন সময় নিলেও যদি দরটা একটু কমে, মল্লীর থাকা ঠিক হয়ে গেলে আর বিলম্ব করলেন না।

বসন্তকুমার বেশ একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন বৈকি, পরিচয়ের মুখেই একটা ক্ষতি করিয়ে দেওয়া তো। দেবপ্রসন্ন উত্তর দিয়েছিলেন—নিজের জাতের কেউ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে দেখলে সব জাতের লোকই তার যথাসাধ্য করবার জন্যে পাশে এসে দাঁড়ায়। ব্যবসাদার জাত নিজেদের পাঁচজনের মধ্যে থেকে একটা পুঁজি করে দেয়; আমরা বাঙালীরা চাই কোনরকমে একমুঠো খেয়ে নিজেদের শিক্ষা-

সংস্কৃতিটা বজায় রেখে যেতে। তা সেখানে নিজেদের কেউ যখন ঐ একমুঠো খাওয়ার সংস্থান করতে গিয়ে সেই শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে, উচিত নয় কি একটু পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। অবশ্য জাতিত্বের কথা না ভেবে মানুষ বলেই করা উচিত, করেও লোকে; তবে সব সময় যদি সম্ভব না হয় তো, ভগবান জাতির গণ্ডী বেঁধে ক্ষেত্রটা যে কমিয়ে দিয়েছেন বুদ্ধি করে, তার সুযোগটা তো নিতেই হয়।

খানিকটা গুরুত্বের সঙ্গে, খানিকটা আবার লঘু করে দিয়ে বলে গিয়েছিলেন দেবপ্রসন্ন। আসল কথা—ঐ যে একটি লোক অদৃষ্টের প্রতিকূলতা না মেনে, শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যে নিজের একটা স্থান করে নিয়েছে, বাড়ি ছেড়ে, স্বজন বিচ্ছিন্ন হয়ে, আগেকার বাঙালীদের মতো—ঐতেই দেবপ্রসন্নকে লাভের কথা ক্ষতির কথা, সংক্ষেপে বলতে গেলে নিজের দিকটার কথা একেবারে দিয়েছে ভুলিয়ে। কর্মী লোক, কর্মক্ষেত্রটাও এমন ছিল যেখানে প্রতি পদে সূক্ষ্ম বিচার করে চলতে হোত; খুব বেশিরকম প্র্যাকটিক্যাল না হোলে উপায় ছিল না, কিন্তু বাঙালী কেউ বিরূপ পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে বা করতে যাচ্ছে—সাধারণভাবে জাতটা করছে না বলেই—এ-দৃশ্যে একেবারে ওঁকে অভিভূত করে ফেলে। ছেলেমানুষের মতোই উল্লসিত হয়ে ওঠেন, ভাবপ্রবণ এতটা হয়ে পড়েন যে অনেক সময় বিচারের সূক্ষ্মতারও যেন অভাব হয়ে পড়ে। সেন্টিমেণ্টাল লোকের যা হয়।

যেমন হচ্ছে নলিনাক্ষের ব্যাপারে।

দেবপ্রসন্ন যে জায়গায় বাড়ি কিনেছেন সেটা শহরের একটু বাইরের দিকেই পড়ে, যদিও শহর থেকে বেশি দূর বা বিচ্ছিন্ন নয়। জায়গাটা একটু বেশি উঁচু-নীচু, ভাঙাচোরা। এর জন্য, একে তো বাড়ি বেশি নেই, তার ওপর যে ক'খানি আছে তাও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ এখানে তেমন-তেমনি লোক বাড়ি করেছে, যারা গায়ে গা ঠেকিয়ে থাকতে অভ্যস্তও নয়, আর যাদের এই ধরনের পরিত্যক্ত জমি খানিকটা উপযোগী করে নিয়ে বাড়ি করবার সামর্থ্যও আছে; অবসরপ্রাপ্ত বড় চাকরে, যারা কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে কাটিয়ে এসেছে, জমিদার, কি সম্পন্ন ব্যবসায়ী, এই ধরনের মানুষ।

এরই মধ্যে একখানা বাড়ি নলিনাক্ষের।

নলিনাক্ষের পিতা ছিলেন একজন ডাক্তার; বিহার গবর্নমেণ্টে চাকরি করেন, এবং শেষের দিকে সিভিল সার্জেনের পদে উন্নীত হন। শেষের দিকটা বদলি হয়ে ছিলেনও রাঁচিতেই এবং সেই সময়েই বাড়িটা করেন এখানে, তারপর অবসরপ্রাপ্ত হয়ে এখানেই জীবনের বাকিটুকু কাটিয়ে দেন।

নলিনাক্ষ পিতার একমাত্র পুত্রসন্তান। অর্থের অপ্রতুল নেই, সুযোগও প্রচুর, যা করবে খুব বড় আয়তনে করবে এই ধরনের একটা উচ্চাশা বরাবরই পোষণ করে এসেছে, এবং প্রথম-প্রথম হয়তো সেটা উচ্চাশা মনে করার জন্তেই বাপ-মায়ের কাছে প্রশ্রয়ও পেয়ে এসেছে। ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হবে, উকীলের ছেলে উকীল, এই সাধারণ নিয়মে ঠিক হোল ডাক্তারিই পড়বে সে। নলিনাক্ষ কিন্তু পদবীটাকে আর সবার থেকে বিশিষ্ট করে রাখবার জন্ম ঠিক করল, যেখানে আই-এস্‌সি হয়েই ঢোকা যায়, সেখানে এম-এস্‌সি'র তকমা বুকে না করে ঢুকবে না সে। অতদূর পৌছবার পূর্বেই কিন্তু ও নিজের ভ্রান্তিটা আবিষ্কার করে ফেলল। ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হবে এটা তালগাছের ফল তাল হবে, কিম্বা রুইমাছের ছানা কাৎলা হতে পারবে না এই ধরনের উদ্ভিজ্জ বা দৈব নিয়ম। জন্মের দিক দিয়ে কোন উপায় নেই, তাই বলে আর সব দিক দিয়েও যদি মানুষ নিজেকে এইভাবে কড়াক্কড় ক'রে বেঁধে রাখত তো এতবড় মানব-সভ্যতার সর্বমুখী বিকাশটা হোত কি করে ?···আদি মানব ছিল শিকারী, সেই উত্তরাধিকারে আজ পর্যন্ত যত মানুষ জন্মেছে সবাই শিকারী-ই হয়ে থাকত না ?

বি-এস্‌সি'টা একবার ফেল ক'রে দ্বিতীয়বার উদ্যোগী হওয়ার মুখেই নলিনাক্ষ জার্মেনী চলে গেল কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করে আসতে। তার পর যতদিন পিতা জীবিত ছিলেন এই পথ ধরেই চলেছে ; জার্মেনী থেকে ফিরে মোটর-সার্ভিস খুলল একটা, তারপর একটা ওষুধের দোকান। পিতা যখন মারা গেলেন, অকালমৃত্যুই হোল একরকম, নলিনাক্ষ তখন রাঁচি থেকে কলকাতায় ডিম চালান দিয়ে কলকাতা থেকে ইলিস মাছ আর গলদা চিংড়ি এনে রাঁচির বাজারে চালু করবার সংকল্প নিয়ে ব্যস্ত।

পিতা দেখেশুনে মৃত্যুর আগে শহরে আরও দুখানি বাড়ি কিনে রেখে যান, যদি আর সব ব্যবসার পর বাড়ি-বেচার ব্যবসা না ধরে ছেলে তো একরকম করে চলে যাবে। ছেলেকে অবিবাহিতই রেখে যেতে হোল, কেননা বিবাহের ব্যাপারেও খুব বিশিষ্ট কিছু একটা করবার ঝোঁকে ততদিন পর্যন্ত বিবাহ করা হয়ে ওঠেনি নলিনাক্ষের।

দেবপ্রসন্নর সঙ্গে পরিচয় বছর দুই থেকে, নলিনাক্ষ যখন মোটর সার্ভিস গুটিয়ে ফেলে ওষুধের দোকান চালাচ্ছে। একদিন মল্লীকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ বৃষ্টি নামায় উনি যখন বিপন্ন, নলিনাক্ষ মোটরে করে দোকান থেকে বাড়ি আসছিল, ওঁদের দুজনকে তুলে নিয়ে বাড়ি পৌছে দিল। পরিচয় হোল। একজন সিভিল সার্জনের ছেলে, বাঁধা রাস্তায় না গিয়ে ব্যবসা করছে, প্রথম পরিচয়েই মুগ্ধ করে দিল নলিনাক্ষ। আর সবই ভালো ছেলেটির, দুর্বলতাটা কোথায় সেদিকে যে নজর যেতে পারল না

দেবপ্রসন্নর তার কারণ সেন্টিমেণ্টাল মানুষের সেন্টিমেণ্ট যেখানে প্রবল, দৃষ্টি সেখানে অনুসন্ধানী হয়ে উঠতে পারে না। পিতা তখন মারা গেছেন, এর পর ওষুধের দোকান গুটিয়ে নলিনাক্ষ যখন ডিম-মাছের ক্ষেত্রে নেমে এল, তখনও দেবপ্রসন্নর মতামতে কোন প্রভেদ লক্ষিত হোল না, আভিজাত্যের কথা ভুলে সে যে নিম্নস্তরের কাজে স্বচ্ছন্দেই নেমে আসতে পারল এতে হয়তো ওঁর শ্রদ্ধাটা আরও দৃঢ়ই হোল। শুধু বললেন—"ওষুধের দোকানটা না তুলে দিয়ে এর সঙ্গে রেখে গেলেই হোত ভালো।"

নলিনাক্ষ বলল—"একলা মানুষ যে, বুঝছেন না? একলা মানুষ বলেই প্রথমটা ভেবেছিলাম, না হয় থাক, দোকান নিয়েই পড়ে থাকি; তারপর খতিয়ে এর ফিউচারটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম পেট চলছে না এমন নয় তো, দেখাই যাক না নেমে পড়ে। হাজারীবাগে এক পাঞ্জাবী আরম্ভ করেছে, ফেঁপে উঠেছে বলা চলে, তার নজর রাঁচির ওপর পড়বার আগেই আমার বাজারটা হাত করে নেওয়া দরকার।"

মল্লী ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা কিছু বোঝে না অবশ্য, তবু সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে একটা খটকা তো লাগেই। তবে নূতন পরিচয়, সামনা-সামনি কিছু বলত না তখন, নলিনাক্ষ চলে গেলে দেবপ্রসন্নর কাছে সন্দেহটা প্রকাশ করল—"কিন্তু উনি লোকের অভাবের কথা বলছেন, এ-কাজে কি আরও লোকের দরকার নয় জ্যাঠামশাই? রাঁচি কলকাতা, দু'জায়গা নিয়ে ব্যবসা।"

দেবপ্রসন্ন এমনভাবে মুখের দিকে একটু চেয়ে রইলেন যে বেশ বোঝা গেল কোন কারণে এদিকটা তিনি ভেবে দেখেননি। বললেন—"তা তো ঠিকই, তবে লোক নিশ্চয় পেয়ে যাবে।"

"তা যাবেন নিশ্চয়, তবে লাভ করাবার লোক পাবেন, কি লোকসান করাবার লোক পাবেন···একলা মানুষই তো, এতগুলি লোকের ওপর নজর রাখা—তাও এক জায়গায় নয়···"

একটু হাসলেন দেবপ্রসন্ন, বোধ হয় নিজের যুক্তির দুর্বলতাতেই, তারপর যে কারণে এই স্থূল কথাগুলা তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে সেই কথাই এসে পড়ল; বললেন—"কি জানো মা, নলিনাক্ষ যে অত বড় ঘরের ছেলে হয়েও বাঁধা রাস্তায় বড় হওয়ার দিকে গেল না, তারপরে আবার আমরা সেটাকে ছোট কাজ বলে মনে করি তাই নিয়েই নেমে পড়ল, তাইতে ও একটা মস্তবড় সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছে।"

"একটা কাজে লেগে থাকার ধৈর্যের অভাবও তো হতে পারে এটা, জ্যাঠামশাই।"

একটু চুপ করেই রইলেন দেবপ্রসন্ন, যেন নলিনাক্ষের জীবনের গতিটা আগাগোড়া

এই প্রথম দেখতে পেলেন; বললেন—"হয়তো তাই; তবে কি জানো?—প্রত্যেক ব্যাপারেরই দুটো দিক আছে, আর কিছু না হোক, একটা ভালো আদর্শ তো দাঁড় করাচ্ছে নিজের জাতের সামনে। ওর নিজের কথা ধরলে—হয়তো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে একজায়গায় এসে কায়েমী হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারে..."

হঠাৎ চুপ করে একটু যেন বেশি চিন্তাপ্রবণ হয়ে পড়লেন; মন্থরভাবে বললেন—"কথাটা কি জানো মল্লী?—সমষ্টির জন্যে ব্যষ্টির স্যাক্রিফাইস্ দরকার মাঝে মাঝে। ধরা যাক, নলিনাক্ষ পারল না দাঁড়াতে, ওর এই আত্ম-বলিদানে জাতি হবে উপকৃত, তাদেরও অনেকে পড়বে হয়তো, কিন্তু অল্প যে-ক'জন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে—পারবেই পূর্বগামীদের উদাহরণ দেখে—তারা হয়ে থাকবে একেবারে জাতির মেরুদণ্ড...সেদিক দিয়ে যদি স্যাক্রিফাইস্‌ড্‌ও হয়ই নলিনাক্ষ তো, সে স্যাক্রিফাইসের একটা মূল্য যে আছেই সেটা অস্বীকার করতে পার?"

তা করে না মল্লী, শুধু একটু হেসে বলে—"যদিও সে স্যাক্রিফাইস্‌টা ইচ্ছাকৃত নয়..."

ওর জিদেই দেবপ্রসন্নর মুখেও একটু হাসি ফোটে, ছোঁয়াচ লেগে বোধহয় একটু তর্কের জিদও আসে, হেসেই উত্তর দেন—"নয় হয়তো। তবে প্রকৃতিদেবী—কিম্বা বিধাতাপুরুষ, যাই বলো, জাতির স্বার্থে ইন্‌ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তির মূঢ়তা এইভাবে এনে দেন মাঝে মাঝে।"

(নয়)

তড়িতের সঙ্গে যখন পরিবারটির পরিচয় হোল তখন নলিনাক্ষ এ-বাড়ির একজন নিয়মিত আগন্তুক। নিয়মিত হওয়ার একটু কারণও হয়েছে ইতিমধ্যে।

ডিম-মাছের পর্বও শেষ হয়ে গেছে, আপাতত নলিনাক্ষ ঝাড়া হাত-পা। এখন, ভবিষ্যতে কি করবে তাই নিয়ে গবেষণা করছে। দেবপ্রসন্নর সঙ্গে আলোচনা হয়, পরামর্শ চায়। মল্লীও থাকে।

ও আর কিছু যে করবে না ভবিষ্যতে এটা ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সঙ্গে একরকম টের পেয়ে গেছেন দেবপ্রসন্ন। কিন্তু তার জন্যে ওঁর কোন নৈরাশ্য বা খেদ নেই। বড়মানুষ বাপের একমাত্র ছেলে সে যে এইরকমই দাঁড়াবে এটা একরকম মেনে নিয়েছেন। তাতে নিশ্চিন্তও আছেন এইজন্য যে, দেখে শুনে বুঝতে পারছেন ওর এরপর আর কিছু না

করাটাই শ্রেয়। পিতা ছেলের মতিগতি দেখে এমন পাকারকম ব্যবস্থা করে গেছেন যে, কিছু করার শুভ চিন্তাটা মাথায় না ঢুকলে খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তাটাও পারে না ঢুকতে।

ছেলেটিকে স্নেহ করেন। এক ঐ অব্যবস্থিতচিত্ত, তা ভিন্ন এদিকে বিশেষ কোন দোষ নেই। এর ওপর বাপ-মায়ের আদর-খাওয়া ছেলের স্বভাবে যে একটা দুর্বলতা, একটা অসহায়তা বোধ এসে পড়ে তাতে যেন ওকে আরও কাছে টেনে নেয় মন। এই কারণেই মল্লীও ভালোই বাসে, ঠিক প্রণয় কিনা বলা যায় না,—ঐ অসহায় পরনির্ভর-শীলের প্রতি একটা স্নেহ, নিজের স্বভাবের চটুলতার জন্যে হয়তো একটু বিদ্রূপের ভাব আছে, কিন্তু তাও করুণামিশ্রিত ; কঠোর সমালোচনা নয়।

ওদের বৈঠকটা এখন একরকম নিত্যদিনেরই ব্যাপার। নিয়মিতভাবে সভ্য ধরতে গেলে তিনজন, তার মধ্যে মল্লীর সপ্তাহে তিনদিন প্রায় ঘণ্টা আড়াইয়েক করে গানের শিক্ষকের কাছেই কেটে যায়। এ-ছাড়া আজ একজন কাল অন্যজন, এই করে গড়-পড়তায় চার-পাঁচজন হয়েই যায়।

আলোচনার ধরা-বাঁধা কিছু নেই, যখন যে কথাটা উঠল, খবরের কাগজ অবলম্বন করে, কোন পত্রিকা-পুস্তক অবলম্বন করে, বা সহরেরই কোন সদ্য-ঘটনা অবলম্বন করে। বাঙালীর জীবনের সমস্যা নিয়ে আলোচনাটা কিছু বেশিই হয়। এ-জিনিসটার সঙ্গে দেবপ্রসন্নর একেবারে নাড়ির যোগ, ওঁর জীবনের সাধনাই হোল বাঙালীর কল্যাণ-চিন্তা; অন্যের কাছে অতটা না হোলেও জিনিসটা আলোচনার বিষয় হিসাবে মুখরোচক, যাঁরা ওটাকে দেবপ্রসন্ন-বাবুর দুর্বলতা বলেই মনে করেন তাঁরাও অতিথি-বৎসল গৃহস্বামীর দুর্বলতাটুকুকে প্রশ্রয় দিয়ে যান। বিরোধিতা করবারও লোক আছে, এখানকার এক বড় আফিসের উর্ধ্বস্তরের কর্মচারী প্রিয়রতন। প্রথমত প্রাদেশিকতা ত্রুটিশূন্য নয় বলে এর বিরোধিতা সহজ ; দ্বিতীয়ত আর পাঁচজন যাতে সায় দিচ্ছে তাতে সায় না দেওয়ায় একটা সহজ বৈশিষ্ট্য অর্জন করা যায়। প্রিয়রতনের বিরোধিতা করার আরও বড় কারণ আছে ; ব্যক্তি-জীবনে তার মনটা এবং সেই থেকে তার আচরণ অত্যন্ত প্রাদেশিক ভাবাপন্ন।

গান-বাজনাও হয়। সুপা যখন ছিল তাকে প্রায়ই ধরে আনত মল্লী। মাঝে মাঝে গানের শিক্ষক অপরেশবাবুকেও ডেকে নিত, আরও পাঁচ-জনকে নিমন্ত্রণ করে রীতিমতো আসরই বসিয়ে দিত। সুপার বিবাহের পর এদিকটা একটু অবহেলিত। ঠিক নিজের চাড় করে মল্লী আর কিছু করতে চায় না। একে সঙ্গীহারা হয়ে মনটা বেশ সাড়া দেয়

না, তার গান বাজনা বোঝে এমন লোকও বিশেষ নেই এই গোষ্ঠীর মধ্যে। তবু নলিনাক্ষ ফরমাশ করে ব'লে প্রিয়রতন ফরমাশ করে, এবং প্রিয়রতন ফরমাশ করে ব'লে নলিনাক্ষ ফরমাশ করে; মল্লী কখনও কখনও কোন অজুহাত দেখিয়ে কাটিয়ে দেয়, কখনও কখনও নিয়ে বসে এস্রাজটা। গীতবাদ্য সংক্ষিপ্ত হয়ে এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই সময় তড়িৎ এসে উপস্থিত হোল।

প্রথম দিনটা তিনজনের মধ্যেই গল্পগুজব আবদ্ধ রইল, কেননা দেবপ্রসন্ন আর মল্লী যে আশ্রমে যাবে এটা আগে থাকতে জানা, কেউ আর আসেনি সেদিন। এরপর দিন-দশ-বারো আর এল না তড়িৎ। প্রথম দিনের আলাপে দুইজনকেই ভালো করে চেনবার সুযোগ হোল, আকৃষ্টই হোল এবং মল্লীর নিবিড়তর পরিচয়ে নিশ্চিন্তও হোল, তবে এই পরিবেশের মধ্যে এসে পড়া, ওর জীবনের যা গতি, সে-হিসেবে কল্যাণকর হবে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, এমন সময় কতকটা আগেকার মতো আকস্মিক-ভাবেই আবার একদিন এসে উপস্থিত হোল।

পুরুলিয়া রোড ধরে বাইরে একজন আরোহী নিয়ে গিয়েছিল। ফিরছিল খালি গাড়ি নিয়েই, খানিকটা এসে শহরে ঢোকবার মুখে রাস্তার পাশ থেকে একজন ডেকে প্রশ্ন করল—"সওয়ারী লেগা?"

প্রশ্নকর্তা নলিনাক্ষ। মোটর বিগড়ে গেছে, ড্রাইভার বনেটটা খুলে পরীক্ষা করছে, তড়িৎ ঘুরে চাইল। ম্যুনিসিপালিটির মধ্যে আসেনি তখনও, আলো নেই, বাঙালী কি কে ঠিক বুঝতে পারল না। বিপন্ন, সুতরাং অতটা বোধহয় ভাবলও না, উত্তর করল—"লেগা। কাঁহা যাইয়ে গা?"

নলিনাক্ষ পাড়াটার নাম করল।

বেশ একটু চিন্তা করল তড়িৎ, দ্বিধা, আকৃষ্ট হলেও ও-পরিবেশের মধ্যে আর যাওয়া ঠিক হবে কিনা ওর পক্ষে, তারপর জানাল, ওকে যেতে হবে অন্যদিকে।

নলিনাক্ষ সামনে পেছনে বেশ ভালো করে একবার দেখে নিল; বলল—"ডবল ভাড়া দেগা।" কতকটা মিনতির ভাবই মিশিয়ে বলল—"চলো না।"

তড়িৎ একটু ভেবে নিয়ে বলল—"বেশ, আইয়ে।"

নলিনাক্ষর ড্রাইভার বাঙালী, বোধহয় কতকটা দেবপ্রসন্নবাবুরই প্রভাব। তাকে একটা গোরুর গাড়ি ডেকে নিয়ে মোটরটা বাড়ি নিয়ে যেতে বলে নলিনাক্ষ এসে চেপে বসল।

সমস্ত রাস্তাটা খুবই অন্যমনস্কভাবে কাটল তড়িতের। দুর্বলতা এসে যাচ্ছে যতই

এগুচ্ছে, যাবে আরোহীকে নামিয়ে মল্লীদের বাড়ি ?...পাড়ার মধ্যে খানিকটা এসে প্রশ্ন করল—কোন্ দিকে যেতে হবে, কোন্ বাড়ি ? নলিনাক্ষ একটু যেন ভেবে নিল, তারপর নিজের বাড়ির রাস্তা না বাৎলে দেবপ্রসন্নবাবুর বাড়ির রাস্তাই ধরতে বলল।...

একটা চাপা দ্বিধায় তড়িতের শরীরটা একটু একটু কাঁপছে। মল্লীদের গেটের সামনেই দাঁড় করাল নলিনাক্ষ। তড়িৎ বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, দশ-বারোদিনের সংযমটা আর ধরে রাখা যায় না। একটু বাড়তি কারণ হয়েছে তার এর মধ্যে ; মল্লীর এস্রাজের আওয়াজ ভেসে আসছে।

নলিনাক্ষ ব্যাগ বের করে ভাড়া দিতে গেল ডবল। তড়িৎ মুখের দিকে চোখ তুলে অদ্ভুতভাবে একটু হাসল, স্পষ্ট বাংলায় বলল—"আমি এ-বাড়িতে এলে ভাড়া নিই না।"

এত বিস্মিত হয়ে গেছে নলিনাক্ষ যে, হাত আলগা হয়ে ব্যাগটা নীচে পড়ে গেল। তুলে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়াল, তড়িৎ সেইভাবেই হেসে হাত বাড়িয়ে বলল—"না হয় দিন, তবে ডবল নয়।"

নলিনাক্ষ একটা আট-আনি রেখে দিল, এবার ও একটু একটু কাঁপছে, বোধহয় বাক্‌স্ফূর্তিই হচ্ছিল না আশ্চর্যে, এতক্ষণ পরে বলল—"আপনি বাঙালী!...একটু দাঁড়াবেন কি দয়া করে ?"

কতবড় আবিষ্কার করেছে একবার দেখাতে চায় দেবপ্রসন্নকে, মল্লীকে।

তড়িৎ রিক্‌শার মুখটা ঘুরিয়ে বলল—"দাঁড়াব না। গেটটা একটু খুলে দিন তো, ভেতরেই যাব।"

(দশ)

রিক্‌শা চালাবার একেবারে গোড়ার দিকে যখন নিজের জাতি-পরিচয় ঢাকবার চেষ্টাটা খুব বেশি, তড়িৎ নিজের পোশাকটাও সেইরকম করে নিয়েছিল ; পায়ে মোটর-টায়ারের সস্তা চপ্পল, হাফপ্যাণ্ট, সস্তা ছিটের হাফ-শার্ট, মাথায় গান্ধীটুপি। কয়েকমাস যেতে সঙ্কোচটা কিছু কমে আসতে পোশাকেরও সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিবর্তন ঘটে, তারপর মল্লীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর আরও একটু স্পষ্ট হয় সেটা, শেষে দেবপ্রসন্নর সঙ্গে ওরকম খোলাখুলি আলাপ হওয়ার পর ওর পোশাকে এখন আর রিক্‌শা-চালকের বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই বলতে গেলে। ভাবটা, খানিকটা যখন জানাজানিই হয়ে গেল তখন আর ঢাকবার চেষ্টা করা কেন ? হয়তো আরও একটা কারণ আছে ; আগে ছিল শুধু নিজের

মনের জোর, যাতে সাধারণের মতের বিরুদ্ধে ওকে নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় করে রেখেছিল। দেবপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের পর ওর এই বৃত্তিটা একটা মর্যাদা লাভ করল। তাতে স্বজাতি-সঙ্কোচটা একেবারেই না গেলেও, কতকটা বেপরোয়াভাব গেলই এসে, একেবারে ছদ্মবেশের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই একটা সঙ্কোচ এসে পড়ল যেন।

হয়তো আরও একটু কারণ ছিল মনের অতলে কোথাও প্রচ্ছন্ন, যার খবর ও নিজেই পায়নি,—ও চায় না আর ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে, তবু যদিই নেহাত অতর্কিতে আবার ওঁদের সঙ্গে হয়ে যায় দেখা কখনও···এই অর্ধমলিন প্যাণ্ট, হাফ-শার্ট, টায়ারের জুতো—এগুলো থাকা কি এতই প্রয়োজনীয় হবে?

এখন ওর পোশাক পায়ে টাই শু, ধুতি মালকোঁচা এঁটে পরা, হাফ-শার্টও খুব সস্তা ছিটের নয়। পরিচয় ঢাকবার দিকে রইল রাত্রি আর মাথায় গান্ধীটুপি; এতে যতটা হয়।

তড়িৎ যতক্ষণে রিক্‌শার আলোটা নিবুবে, ততক্ষণে নলিনাক্ষ এগিয়েই গিয়েছিল, চৌকাঠে দাঁড়িয়েই বলল—"আজ আমার সঙ্গে কে আন্দাজ করুন তো মল্লীদেবী···"

এমন সময় তড়িৎ গিয়ে পড়ল। দেবপ্রসন্ন একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বললেন—"তড়িৎ না! তোমার রিক্‌শা?"

"আছে"—একটু হেসে তড়িৎ দুজনকে নমস্কার করল, তারপর টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে মুঠোয় গুটিয়ে নিতে নিতে এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। নিশ্চয় পোশাকের পরিবর্তনেই দেবপ্রসন্নর মুখটায় একটু নৈরাশ্যের ছায়া পড়েছিল, সেটা সরে গিয়ে দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কতকটা ইচ্ছা করেই একটা ভালো কুশন-চেয়ার দেখিয়ে বললেন—"বোস ঐটেয় আরাম করে···অনেকদিন আসনি এদিকে। এলে রিক্‌শা নিয়েই?"

এখানে পরিচিত দেখে নলিনাক্ষ আরও বিস্মিত হয়ে একবার এঁর মুখের দিকে একবার তড়িতের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল; বলল—"আমি তো ওঁর রিক্‌শাতেই এলাম। রাস্তায় মোটর বিগড়ে এক বিভ্রাট। ওদিকে রিক্‌শা-চলাচলও তো কম, রাত হয়ে আসছে; কি করব ভাবছি, এমন সময় ওঁর রিক্‌শাটা দেখতে পেলাম। আসতেই চান না; আর বাঙালী সে-কথা তো এখানে এসে ভাঙলেন।···এখন দেখছি আপনাদের চেনা।···আপনিও জানতেন নিশ্চয় মল্লীদেবী; কিন্তু কই আমাকে বলেননি তো এ-শহরে একজন বাঙালী রিক্‌শা-ড্রাইভার আছেন···"

অনেকখানি বকে গেল। প্রথম পরিচয় করে দেওয়ার গৌরবটা ওর ভাগ্যে না

জুটলেও, বেশ উত্তেজিতই হয়ে পড়েছে, অন্তত আজকের যোগাযোগটুকু তো তার জন্যই।

মল্লী হেসে চুপ করেই রইল। আসলে ও-ই চেষ্টা করে করে সতর্ক থেকে দেবপ্রসন্নর মুখ দিয়ে প্রকাশ পেতে দেয়নি কথাটা, ভেতরে ভেতরে এমন চঞ্চল হয়ে পড়েছে যে কথাও যোগাচ্ছে না। উত্তরটা দিল তড়িৎই। নলিনাক্ষের শেষের কথাটা যে একটু খাপছাড়া হয়ে পড়েছিল সেইটাই উদ্দেশ করে বলল—"লুকুবার কথা বলেই প্রকাশ করেননি নিশ্চয়। এ তো একজন বাঙালীর ডেপুটী কমিশনার হয়ে আসা নয়।"

"আমি তো বলি তার চেয়েও বড় কথা। ডেপুটী কমিশনার তো দু'দশ বছর অন্তর একটা করে আসছেই বাঙালী, আই-সি-এস কি আই-এ-এস—এরও অভাব নেই, এলে-গেলে যথারীতি তাদের পার্টিও দিচ্ছি আমরা—বাঙালী বলেই; কিন্তু দৈহিক শ্রমকে তার মর্যাদা দিয়ে যারা বাঙালী জাতটাকে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করছে…"

বাধা পড়ল। দুজন প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। নমস্কার করে আসন গ্রহণ করতে করতে—"কৈ ?…" বলে একজন কি বলতে যাচ্ছিলেন, নলিনাক্ষ বলল—"আপনাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন তড়িৎ…তড়িৎ…"

একবার মল্লীর মুখের দিকে একবার দেবপ্রসন্নর মুখের দিকে চাইল। দেবপ্রসন্ন বোধহয় ভুলে গিয়ে থাকবেন পদবীটা, মল্লী—ব্যাপারটা হঠাৎ এতদূর এগিয়ে যাওয়ায় থতমত খেয়েই নির্বাক হয়ে গেছে, তড়িৎই জুগিয়ে দিল—তড়িৎ মিত্র।"

"তড়িৎ মিত্র।…রিক্‌শা চালাচ্ছেন আজকাল, এই শহরেই!"

বেশে-চেহারায় দুজনকে অবসরপ্রাপ্ত বড় চাকরে বলেই মনে হয়। নলিনাক্ষ যে-ভাবে কথাটা বলল তাতে বেশ একটি চ্যালেঞ্জের ভাব আছে, যেন জেনেশুনেই বড় চাকরির ওপরে তড়িতের এই ছোট বৃত্তিটাকে তুলে ধরে তার মহিমাটা বাড়িয়ে দিল, এই প্রথম সুযোগটুকু হাতে পেয়েই। ঘরের হাওয়াটা কিরকম হয়ে গেছে, কথা কইলেন ওঁদেরই একজন, তড়িৎকে কতকটা যেন ঘটা করেই হাত তুলে নমস্কার করে বললেন—"বাঃ, বড় সুখের কথা। কত দিন ধরে চালাচ্ছেন ?"

"তা প্রায়…"

ওর উত্তর শেষ হওয়ার আগেই ভদ্রলোক মুখটা মল্লীর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—"কই মা, তোমার বাজনা নীরব যে ?"

একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যেই মল্লী একটু হেসে এস্রাজটা তুলে নিতে যাচ্ছিল, নলিনাক্ষই আবার বাধা দিল। ভদ্রলোকের অবজ্ঞার ভাবটা ও

মোটেই বরদাস্ত করতে পারেনি ; বলল—“গানের চেয়ে আমরা ভালো একটা টপিক্‌ পেয়ে গেলাম তো আজ—আজ আর থিয়োরী নয়, তড়িৎবাবু হলেন প্রত্যক্ষ উদাহরণ শ্রমের মর্যাদার—তাই সেই আলোচনাই চলছিল, এমন সময় আপনারা এসে পড়লেন...”

ভদ্রলোক হেসে বললেন—“তাহলে তাই চলুক না। রিক্‌শা টানলুম না বলে টানার মর্যাদা, অর্থাৎ দৈহিক শ্রমের মর্যাদা যে না-বুঝি এমন নয় তো...”

একটু ঠেস দিয়ে কিন্তু তখনই আবার হালকা করে দিলেন মন্তব্যটা ; বললেন—“বরং বেশি করেই বুঝি—এই দেখুন না, শুধু কলম পিষে আর চেয়ার ঘামিয়ে—আমি অবস্‌টিনেট ডাইবিটিস রুগী, ডাক্তারে হাল ছেড়ে দিয়েছে, ওঁর হাই ব্লাড-প্রেসার—অবসরজীবনে শুধু মেদ বাড়িয়ে যাওয়া ভিন্ন আর কাজ নেই...”

হাত দুটো চিতিয়ে স্থূল শরীরের দিকে চাইতে একটি হাসি উঠল। আলোচনার দিক পরিবর্তন করবার জন্যেই আবার প্রশ্ন করলেন—“তা আপনি আর কি করেন? মানে...”

তড়িৎ হেসেই বলল—“বাঃ, আপনারাই তো বললেন রিক্‌শা-টানার চেয়ে বড় কাজ আর কিছুই নেই।”

হাসির ওপর কথাটা পড়ায় এবার বেশ জোরেই হাসি উঠল। বেশ সহজ পথেই আলোচনাটা চলত, কিন্তু আবার বাধা পড়ল। শুধু বাধাই নয়, এমন হোল যে, আলোচনাটা একেবারে বিতর্কের কোঠায় গিয়ে পড়ল।

প্রিয়রতন এসে উপস্থিত হোল, সঙ্গে আরও তিন জন, হাত দুটো কপালে তুলে সবাইকে একটা এজমালি নমস্কার জানিয়ে বলল—“বাঃ, কৈ গান কোথায় মল্লীদেবীর? দেরি হয়ে যাচ্ছে মনে করে হনহন করে চলে আসছি আমরা...”

নলিনাক্ষ আবার আগেকার কথাই বলল—

“গানের চেয়ে একটা বড় জিনিস আজ পেয়েছি আমরা, প্রিয়রতনবাবু। গান আপনি থেমে গেছে বলতে পারা যায়।”

তড়িৎ কিছু বলতে যাচ্ছিল ; ওঁর পক্ষেই সবচেয়ে অস্বস্তিকর তো, তার আগেই প্রিয়রতন বেশ বাঁকা-টোনেই বলল—“গানের মতন স্বর্গীয় জিনিসকে আসর থেকে তাড়ায় তাকেও উৎকৃষ্ট বলতে হবে? তা বেশ, বস্তুটাই কি জানতে বাধা আছে কি?”

“সাক্ষাৎ ডিগ্‌নিটি অফ লেবার। তড়িৎবাবু—এই শহরেই থাকেন।” হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল নলিনাক্ষ।

প্রিয়রতন বলল—"রাঁচিতে থাকা খুবই শ্রমসাধ্য স্বীকার করি—পদে-পদেই চড়াই-ওৎরাই, কিন্তু তাকে তো ডিগ্‌নিটি অফ লেবার বলা যায় না।"

"রিক্‌শা চালান—নিজে—আপনাদের এই চড়াই-ওৎরাই অগ্রাহ্য করে!"

প্রিয়রতন ঘাড়টা ফিরিয়ে চাইল তড়িতের দিকে। অস্বস্তিতে চুপ করে বসে আছে, আরও কেউ যেন কোন কথা এনে এ-প্রসঙ্গ চাপা দিতে পারছে না, ঘরটা নিস্তব্ধ। খানিকটা কৌতূহলী হয়ে একটা অদ্ভুত কিছু দেখবার মতো করে দেখে নিয়ে প্রিয়রতন মুখটা ঘুরিয়ে নিল; বলল—"ও!…তা আমি কিন্তু সায় দিতে পারলাম না তোমার কথায়। মেহনতের কাজ আরও অনেক আছে। একেবারে নীচে নেমে গিয়ে রিক্‌শা চালাতে হবে, কি মুটেগিরি করতে হবে, কি ব্যবসার দিকে গিয়ে মাছ বেচতে হবে, পান বেচতে হবে—এটা আমি বিশ্বাস করি না। আর এটা যেন নিতান্ত একটা শো-ও (show-ও) হয়ে যায়, ঘটা করে লোকে দেখানো। তা ভিন্ন আর একটা কথা আছে।"

"শুনি…"

মুখটা থমথমে হয়ে গেছে নলিনাক্ষর, তবে তর্কের গন্ধ পেয়ে খানিকটা খুশীও ভেতরে ভেতরে, প্রসঙ্গটা তো চাপাই পড়ে যাচ্ছিল। প্রশ্ন নিয়ে চেয়ে রইল।

প্রিয়রতন বলল—"এখানকার লোকের অনুযোগ, আমরা এদের সব জায়গা দখল করে মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছি—ওকালতি, ডাক্তারি, বড় বড় চাকরি, কিছু বড় বড় ব্যবসাও; অবস্থাটা তাইতে যা দাঁড়িয়েছে মনে-প্রাণে তা অনুভব করছি আমরা। এর ওপর আবার ওদের গায়ের জোরের কাজ থেকে হঠাতে গেলে, যাতে নাকি ওরা বিশেষ করে দক্ষ…"

"আগে এই কথাটারই জবাব দিই দাঁড়াও"—বাধা দিয়ে আরম্ভ করল নলিনাক্ষ—"যতদিন অন্যরকম কাজের জন্যে ওরা শিক্ষা পায়নি বা নেয়নি, এগোয়নি সেদিকে, ততদিন গায়ের জোরের কাজেই শুধু দক্ষ এ-কথাটা হয়তো বলা চলত। এখন বলা ওদের পক্ষে অপমানকর। দ্বিতীয় কথা—রুজী নিয়ে ঈর্ষা-বিদ্বেষ সেটা উঁচুস্তরে যে-পরিমাণে আছে, নীচুস্তরে সে পরিমাণে নেই। বাঙালী উকিল হয়ে কি ডাক্তার হয়ে, কি একটা বড় চাকুরে হয়ে এখানকার উকিল, ডাক্তার কি বড় চাকুরের চক্ষুশূল হতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে, গায়ে খেটে দু'পয়সা রোজগার করলে কিন্তু সেটা হয় না…"

"হবে না কেন? আমি তো সে-কথাই বলছিলাম। এক্ষেত্রে বাঙালীরা এখনও প্রবেশ করেনি বলে হয়নি। করলে, বাঙালী রিক্‌শাওলায় এখানকার রিক্‌শাওলায়, বাঙালী কুলীতে এখানকার কুলীতে ঐরকমই অপ্রীতিকর অবস্থা দাঁড়াবে…"

দেবপ্রসন্নবাবু যোগ না দিয়ে পারলেন না। বললেন—“আমি আশা করি, দাঁড়াবে না। আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যারা, আমরা যাকে ছোট কাজ বলি, তাই নিয়ে থাকে, তাদের মন তত সংকীর্ণ নয়। একটা রেষারেষি থাকবেই, সেটা তো নিজের জাতের মধ্যেই রয়েছে সর্বত্র, কিন্তু যাকে বলা যায় বিজাতীয় দ্বেষ-হিংসা সেটা বড় একটা থাকে না দেখেছি। একে তো যা উপার্জন সেটা তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো নয়, তা ছাড়া লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, একটা স্পোর্টিং স্পিরিট থেকে যায়, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটা উদারতার ভাব যেটা, যারা শরীর খাটিয়ে খায় তাদের মধ্যে বেশি। এরা যেটাকে বলে 'খুলে ময়দান' অর্থাৎ 'ওপ্‌ন্‌ কম্পিটিশান', যেখানে কারুর বাধা নেই : তারপর যে পারলে নিজের ক'রে নিতে।”

একটু চুপচাপ গেল ; প্রিয়রতন উত্তর খুঁজছে।

তার আগে নলিনাক্ষ বলল—“যদি থাকেও কিছু, সেটাকে ঘোরালো করে তোলবার অস্ত্র নেই ওদের হাতে। বুদ্ধিজীবীদের হাতে খবরের কাগজ রয়েছে, আইনসভা রয়েছে...”

নবাগতদের একজন একটু হেসে বললেন—“এক কথায় বলুন না মাথায় বুদ্ধি রয়েছে, ঐটিই যে যত সর্বনাশের মূল।” তড়িতের দিকে চেয়ে বললেন—“আপনি ভালোই করেছেন এই বুদ্ধির এলাকা থেকে সরে এসে।”

অযথা একটা খোঁচা, তড়িৎ কিন্তু হেসেই বলল—“বুদ্ধিমানের কাজ করেছি বলুন!”

একটা বেশ হাসি উঠল। তড়িতের ইচ্ছাই ছিল এই অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গটা বদলে ফেলা —তাকে কেন্দ্র করেই সেটা উঠেছে, কিন্তু হতে পারল না।

দেবপ্রসন্ন একটু আত্মস্থ হয়ে চিন্তা করছিলেন, নিজের যুক্তিটা টেনেই বললেন—“আর যদি আমার আন্দাজটা নাই ঠিক হয়, অত স্পোর্টিং স্পিরিট না-ই থাকে ওদের মধ্যে, তবু এগিয়ে আসতে হবে নীচু থেকে উঁচু পর্যন্ত উপার্জনের সব ক্ষেত্রে। নীচুর দিকে কেউ আসছে না বলেই ওদিকটা ভর্তি করা বেশী দরকার। একটা জাত মাত্র কিছু বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে টেঁকে থাকতে পারে না ; তার মাথাটা যথাস্থানেই থাক, কিন্তু সেটা তুলে ধরে রাখবার জন্যে মেরুদণ্ডের দরকার, শ্রমজীবী হোল জাতির সেই মেরুদণ্ড। বাঙালীর সেই মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ছে—পড়েছে বলাই ঠিক।”

প্রিয়রতনও পূর্বের একটা কথা টেনে নিয়ে এল, বলল—“শ্রমজীবী যে জাতের মেরুদণ্ড এ-কথা অস্বীকার করব কেন? আমি বলছিলাম—যারা মেরুদণ্ড তারাই মেরুদণ্ড হয়ে থাকে সেইটেই শোভা পায়, কেননা তারা তাতেই অভ্যস্ত। ভদ্রঘরের ছেলেরা যখন সে

ভূমিকায় নামে তখন সেটা যেন হয় একটা শো—লোক-দেখানো কিছু একটা—কতকটা বিলাত থেকে ফেরার পথে জাহাজেই ধুতি-চাদর প'রে নামা।...তড়িৎবাবু রাগ করবেন না, তর্কের খাতিরে বলতে হোল।...কেমন যেন বেমানান হয় না?"

তড়িৎ বললো—"বাঃ, একটা শো দিচ্ছি, দর্শকদের কে কি বলছে তাতে রাগ করলে চলবে কেন?"

ফের একটা হাসি উঠল। কিন্তু হাওয়াটা মোটেই পরিষ্কার হতে পারছে না। নলিনাক্ষ স্যুট পরেই থাকে, তবু—ইউরোপ-ফেরত বলে কোথা দিয়ে কথাটা লাগলই, একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল—"বেমানান কোনখানটায়? স্নায়ু-পেশীতে উনি তাদের কারুর পাশে যেমন বেমানান নন, তেমনি এই তো আপনার পাশেই বসে রয়েছেন—কুশন-চেয়ারেই।...তা, ওঁর চেয়ে কেউ যে বেশি মানানসই এখানে, এমন তো বোধ হচ্ছে না আমার।"

একেবারে উৎকট রকম ব্যক্তিগত কটাক্ষ; পক্ষ অবলম্বন করেছে ভেবে ঠিক তাল রাখতে না পেরে তড়িৎকেও বিশ্রীরকম জড়িয়ে ফেলেছে, সবাই যেন কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। মল্লীর অবস্থাটা আরও খারাপ, উত্তরোত্তর ব্যাপারটা এত জটিল হয়ে উঠছে যে, কিছু একটা ছুতো ক'রে উঠে পড়বে তারও ফাঁক পাচ্ছে না।

ওকে বাঁচালেন দেবপ্রসন্নই। উনি সেই রকম আত্মস্থ। সব কথা হয়তো কানেও যাচ্ছে না, অসঙ্গতি-আতিশয্য কোথায় এসে পড়েছে সে-দিকে খেয়াল তো নেই-ই। প্রিয়রতনের একটা কথা ধরেই চিন্তা করছিলেন, কতকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বললেন—"যারা নীচের স্তরে রয়েছে, পুরুষানুক্রমে কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত, তারা যে ওপরে উঠে আসতে পারবে না, এ কথাটা এ যুগে অচল। তবু যুক্তি হিসাবে মূল্য আছে বৈকি কথাটার—বিশেষ করে এ যুগটা যখন শ্রম-মর্যাদারই যুগ। তবে বাংলার সামাজিক ইতিহাসটা যেন জগৎ-ছাড়া; শ্রমজীবী সম্প্রদায় অলস-অকর্মণ্য হয়ে জাতিকে একেবারে ধ্বংসের মুখে এনে ফেলেছে। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এইরকম সংকটকালে যাদের—সংস্কারবশেই আমরা অধিকারী নয় বলি, তাদের এগিয়ে এসে আদর্শ সৃষ্টি করতে হয়—মেয়েদের পরতে হয় সৈনিকের বর্ম। এই জন্যেই কবি, রাষ্ট্রপতি—এঁদের লাঙল ধরে উদাহরণ সৃষ্টি করতে হয় সবার সামনে।...তড়িতের কথায় আসা যাক, কোন প্রয়োজনের বশেই ও এ-কাজটায় হাত দিয়েছে কিনা জানা নেই আমার। তবে একটা আদর্শ যে সৃষ্টি করেছে এতে কোন সন্দেহই নেই। আর আদর্শ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্য নিয়েই যদি হাত না দিয়ে থাকে তো, সে তো আরও ভালো;

আদর্শ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্য থাকলে তার সঙ্গে তো একটা 'বাহবা'র প্রত্যাশাও থাকে…"

অনেকটা হালকা হয়েছে, মল্লী আর সুযোগটা হাতছাড়া না করে উঠে পড়ল ; বলল —"চা'টা দেরি করছে কেন দেখি।"

একটু পরে আবার গরম বিতর্কের মধ্যেই গরম চা আর শিঙাড়া এসে পড়ল। ইতিমধ্যে আরও দুজন ভদ্রলোক এসে পড়েছিলেন। চা পর্ব ছাড়িয়েও যখন জোর তর্ক চলছে, তারই মধ্যে আস্তে আস্তে আসর খালি হয়ে এল। ক্রমে আরও স্তিমিত হয়ে এল আসর ; একসময় প্রিয়রত্নও গেল উঠে। তখন আর বিতর্ক নয়, তিনজনেরই একমত, একতরফা আলোচনা চলল কিছুক্ষণ ; বিষয়বস্তু বদলেও গেল।

নলিনাক্ষ উঠতে গেলে তড়িৎও উঠে পড়তে যাচ্ছিল, মল্লী বলল—"আপনি বসুন। …খেয়েই যাবেন একেবারে।"

তড়িৎ বলল—"অনেক রাত হয়ে গেছে, আরও যাবে।"

"সেই জন্যেই বলছি।"

"যেতেই দিন"—অনুরোধের দৃষ্টিতে ঘাড় কাৎ করে চাইল তড়িৎ।

দেবপ্রসন্ন বললেন—"আর কিছু না হোক, আজ আসরটা জমেছিল খুব। একেবারে ছুটিতে পড়ে যাব।"

তড়িৎ একটু হেসে বসতে বসতে আবার দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"আপনাকে তাহলে পৌঁছে দিয়ে আসি নলিনাক্ষবাবু।"

নলিনাক্ষ প্রবল আপত্তি করে উঠল—"না না, সেকি, পৌঁছুতে যাবেন কেন ?"

"যাই না। এত উৎসাহ দিয়ে একেবারে দমিয়ে দিচ্ছেন যে, কিছু উপার্জনও তো হতে পারে।"

সবার হাসির মধ্যেই নলিনাক্ষ বিদায় নিল।

তিনজনে বাইরে বসে গল্প করছিল ; বাগানের মাঝখানে খানিকটা গোল ঘাস-জমি আছে। একসময় পাচকঠাকুর জিগ্যেস করতে এল—খাবারের ব্যবস্থা করবে কিনা।

দেবপ্রসন্ন উঠে পড়লেন ; বললেন—"তোমরা বোসো একটু, আমি আমার ইন্‌সুলিন ইনজেকশনটা নিয়ে নিগে। খেতে আমাদের এইখানেই দাও ঠাকুর, বেশ জ্যোৎস্না আছে।"

ভেতরে চলে গেলেন। মল্লী একটু যেন মনমরাই হয়েছিল গল্পগুজবের মধ্যে ; বলল —"আজ বুঝতে পারলাম কেন আপনি নিজেদের জাতের কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে চান, তড়িৎবাবু। কী যে কুৎসিত কাণ্ডটা হোল—এখন আপশোস হচ্ছে কেন আপনাকে আগেই ছেড়ে দিইনি।"

তড়িৎ বলল—"আমারও আপশোস হচ্ছে। তবে নিজের জন্যে মোটেই নয়, আপনাদের খানিকটা অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটল।"

"নয় কেন কিসের জন্যে? সত্যিই আমরা যে কতটা লজ্জিত আপনার কাছে! জ্যাঠামশাইও নিশ্চয়। অথচ তিনি এত খুশী! দেখতেই পাচ্ছেন সেটা। কিন্তু আপনাকে যে আসতে বলব মাঝে-মাঝে সে মুখ রইল না আমাদের।"

"তাতে বাধা নেই, মল্লীদেবী। অর্থাৎ আসতে বলায়। আসর সামলাবার ক্ষমতাও আছে আমার ; আজই না হয় প্রথম দিন বলে পারলাম না তেমন। কিন্তু…"

"কিন্তু কি?—আসবেন—নিশ্চয়।"

"বলছিলাম— আমি এলেই তো আপনার গান বন্ধ হয়ে যাবে?…"

"আপনি গান-বাজনা জানেন নাকি!…ভালো লাগে?"

"অন্তত ততটুকু জানি যাতে বন্ধ হয়ে গেলে খারাপ লাগে। আমি গেট থেকেই চলে যাচ্ছিলাম। আপনার এস্রাজের সুর শুনেই ওঁর কাছে পরিচয়টা দিয়ে ভেতরে চলে এলাম…"

এ-আপশোস রাখতে আর যেন ঠাঁই পাচ্ছে না মল্লী, একবার অনিশ্চিতভাবে মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"আজ যে বড্ড রাত হয়ে পড়ল…"

ভাবটা, তবুও যদি তড়িৎ চায় তো এনে ফেলে এস্রাজটা। সেরকম কিছু ইঙ্গিত না পেয়ে বলল—"কিন্তু টের পেলেন কি করে আমারই বাজনা? অন্য কেউও তো হতে পারত…" সামলে নিয়ে বলল —"অবশ্য তাতে শোনায় আর তফাত কি হোত?…"

শেষ কথাটা কানে গেল না তড়িতের। ওর মন চলে গেছে সেই বর্ষা-মেদুর রাতে ; অবিশ্রান্ত ধারাপাতের সঙ্গে সেই রাগিণী দেশ…

ইনসুলিন ইনজেকশন নিয়ে দেবপ্রসন্ন বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। তড়িৎ বলল —"তার ইতিহাস আর একদিন শুনবেন।"

(এগারো)

আবার দিন সাতেক যাওয়া বন্ধ রাখল তড়িৎ। পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতর হয়ে ভালোই লাগছে, কিন্তু আর কোন দিক দিয়ে তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। গেলে বিলম্ব হয়ে যাবেই খানিকটা। অখিলদার বাড়িতে এদের সবারই চেষ্টা যাতে তড়িৎ ক্ষণেকের জন্যও মনে না করে সেদিন রাত করে আসার জন্য এক কোন দুর্ঘটনার ভয় ছাড়া অন্য কোনও রকম অসুবিধায় পড়েছিল কেউ, কিন্তু তবুও, অথবা সেইজন্য আরও বেশি করেই যেন কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে তড়িৎ। সব চেয়ে নিরুৎসাহ করছে সেদিন তাকে কেন্দ্র করে নলিনাক্ষ-প্রিয়রতনের সেই বিতর্ক—যেমন অর্থহীন, তেমনি মাত্রাহীন। আবার সেই অনুরাগ-বিরাগের পুষ্পবৃষ্টি আর অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াতে না হচ্ছে রুচি না হচ্ছে সাহস।

গেল না যে তার ফল কিন্তু ভালোই হোল। এই যে আশঙ্কা, এটা অনেক পরিমাণে গেল কমে।

সেদিন তর্কটা তর্কের ঝোঁকেই খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল হয়তো ; কিন্তু তড়িতের প্রতি নলিনাক্ষের প্রশংসার মনোভাব, তাকে নিয়ে একধরনের বীরপূজাই ধরা যাক—এর মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। সেইজন্যই তড়িৎ যে আসছে না এর জন্য মল্লী আর দেবপ্রসন্নর চেয়ে সে কম উদ্বিগ্ন ছিল না, যদিও এ-কথাটা মানতেই হয় যে তিনজনের উদ্বেগের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকবেই। মল্লী অবশ্য নিজের মনোভাবটা চেপে রইল। দেবপ্রসন্ন কবারই বললেন—"আর আসে না যে ?...ছোট কাজ না মনে করে যে করছে এটা ভালো, তবে আবার বিপদ-আপদও আছে এসব কাজে।"

একদিন বললেন—"কোথায় থাকে তাও যে জানা নেই, নৈলে খবরটা নিলে হোত।"

তিনজনেই ছিলেন সন্ধ্যার সময় বাগানে বসে, নলিনাক্ষ বলল—"সেটা বের করা শক্ত নয় ; বলুন না, কালই মোটরটা করে বেরিয়ে প'ড়ে..."

মল্লী বলে উঠল—"অমন কাজ করবেন না!"

একটু অন্যমনস্ক ছিল বলে মল্লীর কণ্ঠে উদ্বেগটা অতিরিক্ত হয়েই ফুটে উঠল।

নলিনাক্ষর সঙ্গে দেবপ্রসন্নও প্রশ্ন করে উঠলেন—"কেন ?"

মল্লী সামলে নিয়েছে এর মধ্যে, গলা সহজ করে নিয়ে বলল—"আপনাকে তো

বলেছিই জ্যাঠামশাই, তড়িৎবাবু মনে হয় যেন পছন্দ করেন না যে ওঁকে নিয়ে কেউ বেশিরকম ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে পড়ে। একটু যেন বেশি লজ্জায় পড়ে যান দেখেছি, আর···"

নলিনাক্ষর মুখের পানে চেয়ে হঠাৎ একটু হেসে চুপ করে গেল।

নলিনাক্ষ কথাটা এগিয়ে দিল—"আর ?···"

"ওঁকে মাঝখানে করে আপনাদের যে তর্ক—রীতিমতো ঝগড়াই বলি, ওটা যে ওঁর মুখরোচক হয়নি সেটা আমি সেইদিনই টের পেয়েছিলাম।"

"ওঁর সম্বন্ধে আমি যেটা অনুভব করি, ওঁর এই সৎ-সাহস নিয়ে আমার যা শ্রদ্ধা ওঁর প্রতি সেটা বলব না ?"—একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করল নলিনাক্ষ।

মল্লী আর একটু স্পষ্ট করেই হেসে বলল—"ঐ তো হয়েছে বিপদ, প্রিয়রতনবাবুও তো ঐ কথাই বলবেন—আমি ওঁর সম্বন্ধে যা ভাবি, ওঁর কাজ দেখলে ওঁর প্রতি যে অশ্রদ্ধা আমার সেটা প্রকাশ করে বলব না ?···মত নিয়েই তো ঝগড়া, একেই তো বলে রাজায় রাজায় লড়াই, উলুখড়ের প্রাণ যায় মাঝখান থেকে।"

বলতে বলতে হাসিটা আরও বেড়েই গেল।

এর পর একদিন তড়িৎ এসে উপস্থিত হোল।

সেও এল যেন তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা খানিকটা বাঁচিয়েই। আজ হাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা, দেবপ্রসন্ন ভেতরেই ছিলেন, বাগানে বসে ছিল শুধু নলিনাক্ষ আর মল্লী।

সন্ধ্যা উৎরে গেছে, এমন সময় একখানি রিক্‌শা এসে ফটকের বাইরে দাঁড়াল। দুজনেই ঘুরে দেখল তড়িৎ নামছে।

কিন্তু তার রিক্‌শা নয়। আরোহী হয়ে এসেছে সে। ভাড়া দিয়ে রিক্‌শাটাকে বিদায় ক'রে এসে একখানা চেয়ারে বসল।

নলিনাক্ষই প্রশ্ন করল—"আপনি ভাড়া করে এলেন তড়িৎবাবু ? আপনার নিজেরটা ?"

তড়িৎ বলল—"নিজেরটায় নিজে উঠে বসলে আসতাম কি করে ?"

বোধহয় অন্যদিকে মন ছিল বলেই নলিনাক্ষ ধরতে পারল না যে রহস্যচ্ছলে বলছে কথাটা তড়িৎ; একটু মূঢ়ভাবেই চেয়ে রইল। মল্লী হেসে বলল—"উনি বোধহয় বলছেন তাহলে টেনে আনত কে ?"

চিত্রটা কল্পনা করে নলিনাক্ষও একটু হেসে উঠল; রহস্যচ্ছলেই সমর্থন করে বলল—"তা বটে, সীটের ওপর হাত-পা গুটিয়ে বসেই থাকতে হোত তো।···কিন্তু আমি

বলছিলাম এরকম লোকসান দিয়ে ক'দিন আসবেন, একে তো আসতেই চান না দেখছি।...ক'দিন পরে এলেন মল্লীদেবী,—দশ-এগারো দিন হয়ে গেল না?"

তড়িৎই উত্তর দিল; বলল—"আট দিন। প্রীতির চক্ষে দেখেন বলেই এগারো দিন বলে মনে হয়েছে। আমিও সেই কথাই ভাবলাম নলিনাক্ষবাবু—এরকম জায়গায়, রোজগার করার পর বাকি সময়টুকু হেলাফেলা করে দেওয়া, তাতে মন যেন সায় দেয় না। এর পর হয়তো আবার আসবও রিক্শা সঙ্গে করে; আজ কিন্তু এইরকমই মনে হোল, একটা ভাড়া করেই চলে এলাম।"

একটু চকিত হয়ে উঠে বলল—"এই দেখুন, লাভ-লোকসানের কথায় আসল কথাটাই ভুলে গেলাম। দেবপ্রসন্নবাবুকে দেখছি না; ভালো আছেন তো?"

মল্লী বলল—"আছেন ভালোই। হাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা বলে আর বেরোননি। চলুন না, ভেতরেই যাওয়া যাক।...রোজই আপনার নাম করেন।"

কথাটা বড় ভালো লেগেছিল বলে ঘরে প্রবেশ করতে-করতেই বলল—"তড়িৎবাবু এসেছেন জ্যাঠামশাই। আজ উনি আমাদের এখানেই এসেছেন—আলাদা রিক্শা ভাড়া করে।"

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে একটা কাগজ পড়ছিলেন দেবপ্রসন্ন, সোজা হয়ে বসে বললেন—"এসো তড়িৎ, বোসো। ক'দিন আসনি, ভালো ছিলে তো?...বিশেষ করে আমাদের এখানেই এসেছ, তাহলে তো বিশেষ করে তোমায় খাতির করা দরকার। তা আমাদের তো..."

মল্লীর দিকে চাইলেন। মল্লীর মনে একটা কথা বেশি করেই এসেছে, তড়িৎ আসা থেকেই। কিন্তু প্রকাশ করার উপায় নেই, একটু কুণ্ঠিতভাবে হেসে বলল—"আপনার যে শিবের সংসার সেটা তো ওঁর জানাই..."

দেবপ্রসন্ন হেসে উঠলেন; বললেন—"ভালো। কিন্তু কিছু যখন নেই তখন কাটান্ দেওয়ার ভাষাটা অন্তত থাকা দরকার।...এই তো হয়েছে?..."

হঠাৎ মনে পড়ে যেতে বলে উঠলেন—"কেন, শিবের সংসারে আর কিছু না থাক, বীণাপাণির বীণাটা তো রয়েছে, মা।...তড়িৎ, মল্লী-মার এস্রাজ শোননি নিশ্চয়?"

তড়িৎ বলল—"মনে হচ্ছে সেদিন যেন তারই ব্যবস্থা ছিল..."

নলিনাক্ষর মনে পড়ে গেল মল্লীর কথাটা। সেদিনকার গ্লানিটা এই সুযোগে যতটুকু পারে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য একটু হেসে বলল—"তা যেমন তর্কের ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেলেন...প্রিয়ব্রতনের যত বেয়াড়া..."

তড়িৎ বাধা দিয়ে বলল—"আমার তো মনে হয় উনি বাঁচালেন, নৈলে আপনি যেরকম আরম্ভ করেছিলেন, প্রশংসার একটানা স্রোতে কোথায় যে ভেসে যেতাম।··· মল্লীদেবী, আরম্ভ করুন তাহলে দয়া করে একটু শীগ্‌গির, আজ উনি আবার একলা রয়েছেন, বাধা দেওয়ার নেই কেউ···"

হাসি উঠল একটা, তারই মধ্যে মল্লী এস্রাজটা নামিয়ে এনে সুর বাঁধতে আরম্ভ করল।

(বারো)

রাত্র হয়ে গেল অনেকখানি। একসময় দেবপ্রসন্ন বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

শেষ হ'লে মল্লী এস্রাজটা কোল থেকে নামিয়ে নিতে যখন চোখ তুলে দেখার ফুরসত হোল, তড়িৎ দেখল, দেয়াল-ঘড়িটায় দশটা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। তৃপ্তি আর প্রশংসার সঙ্গে এই কথাটুকু মিশিয়ে মল্লীর দিকে চেয়ে একটু ম্লান হেসে বলল—"বড্ড দূরে থাকি।"

নলিনাক্ষ বলল—"তাহলে আর-একটা হোক-না মল্লীদেবী। একদিনে যতখানি পেয়ে যান তড়িৎবাবু।"

তড়িৎ উঠেই পড়ল ; বলল—"না, এবার যাই, অনেকখানি রাত হয়ে গেল, আমার আবার অনেকটা দূর।"

মল্লীকে বলল—"বেয়ারাকে বলবেন একটা রিক্‌শা ডেকে আনতে ?"

নলিনাক্ষ বলল—"কেন, আমার মোটর তো রয়েছে। বাসাটাও দেখা থাকবে ; আপনি ক'দিন না আসাতে আমরা ভাবনায়ই পড়ে গিয়েছিলাম, বিশেষ করে দেবপ্রসন্ন-বাবু তো খুবই। না মল্লীদেবী ?"

তড়িতের সঙ্গে একবার দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে মল্লী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, অল্প চকিত হয়ে উঠে বলল—"অ্যাঁ ?···হ্যাঁ, জিগ্যেস করছিলেন তো।···তাহলে পাঠাব না রিক্‌শার জন্যে তড়িৎবাবু ?"

একটু বিমূঢ়ভাবেই চেয়ে রইল তড়িতের দিকে, আপত্তিটা যে কোথায়, তড়িৎ যে গোপন রাখতে চায় ওর ঠিকানা সেটা মাত্র ওরা দুজনেই বুঝছে তো। তড়িৎ-ও প্রত্যাখ্যান করবার সভ্যসভ্য একটা ছুতো খুঁজে পাচ্ছে না, টেনে টেনে বলল—"অ্যাঁ—পাঠাবেন না ?···"

তারপর মাঝামাঝি একটা মনে পড়ে গেল ; বলল—"যাক না, যদি না পায় তখন ওঁর মোটর তো আছেই।"

বাইরে বাইরে এ যেন ভদ্রতার জেদাজেদি পড়ে গেছে। নলিনাক্ষ সেইরকমই ভাবছে, অর্থাৎ এত রাত্রে তাকে কষ্ট দিতে চায় না তড়িৎ, খানিকটা পেট্রোল অপব্যয়ও তো। বলল-ও সেই কথাটা একটু হেসে—"আপনি যদি নিতান্ত সঙ্কোচ মনে করেন মস্তবড় একটা উপকার নিতে হচ্ছে এই ভেবে, তাহলে আর কি করা যাবে?—দেখে আসুক।"

তড়িৎ লজ্জিত হয়ে পড়ল ; বলল—"না না, সঙ্কোচ কিসের? আপনি ও-কথা বলছেন কেন? বললাম তো, না পায়, আপনার শরণাপন্নই তো হতেই হবে।"

"এ অঞ্চলে এত রাত্রে রিকশা পাওয়া দুষ্কর, অন্তত সেই দেরি হয়ে যাবে যা ভয় করছেন।...বেশ, তাহলে আমার কথাই থাক, একটা গৎ হয়ে যাক ততক্ষণ।"

সুর কেটে গেছে ; কি করে এড়ানো যায় তার জন্যে ভেতরে ভেতরে চিন্তাও করছিল মল্লী ; বলল—"বাঃ, এ গররাজী আসরে আমিই বা একা রাজী হতে যাই কেন?...তবে মনে হয় যেন একটা সমাধান হতো আপনাদের দুজনের মধ্যে।"

"কি বলুন।" দুজনেই বলে উঠল।

"বেরিয়ে পড়ুন মোটরেই, তারপর কাছে দূরে যেখানেই রিকশা পান উনি নেমে গেলেই হবে।"

তড়িৎ বলে উঠল—"চমৎকার!"...

নলিনাক্ষকে প্রশ্ন করল—"কি বলেন আপনি?"

নলিনাক্ষ একটু যেন কি ভাবছিল, অল্প হেসেই বলল—"ভালোই তো। মল্লীদেবীর সমাধান যখন, ভালো না হয়ে যায়?"

মল্লী ওর মুখের দিকে চাইল, বিশেষ করে যেন হাসিটুকু লক্ষ্য করেই। বলল—"এতবড় যখন কম্‌প্লিমেণ্ট দিলেন একটা, প্রতিদানে আমি কি করি?...অগতির গতি এক কাপ করে চা হয়ে যাক না হয় ততক্ষণ। আর মিনিট কয়েক দেরি হয়ে গেলে ক্ষতি হবে তড়িৎবাবু?"

দেরি করাচ্ছে নিজের উদ্দেশ্যেই মল্লী। আবার একটু চিন্তার সময় নিচ্ছে। নলিনাক্ষর হাসিতে কিছু একটা দেখে থাকবে। ও থেকে থেকে একসময় বড় ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে ; সীমাজ্ঞান থাকে না, বিশেষ করে ভালো-করা ভালো-হওয়ার ঝোঁক চাপলে। ব্যবসার ক্ষেত্রে তো ঐ ইতিহাসই।

যতক্ষণে চা-খাওয়া শেষ হোল ততক্ষণে মল্লীও একটা ঠিক করে ফেলেছে। ওরা টেবিলে কাপ রেখে দিয়ে উঠবার উদ্যোগ করছে—বলল—"একটা কথা, আমায়ও নিয়ে যাবেন ?"

দুজনেই বিস্মিত আনন্দে চাইল ওর দিকে, নলিনাক্ষ সেইভাবে প্রশ্ন করল—"আপনিও যাবেন !"

"নিয়ে গেলেই যাই। লোভ হয় তো; চমৎকার জ্যোৎস্নাটি, হাওয়াটাও বেশ ঠাণ্ডা..."

"এতে জিগ্যেস করবার কি আছে ? চলুন, চলুন।"

"তাহলে জ্যাঠামশাইকে একবার বলে আসি।"

যেতে যেতে ঘুরে হেসে বলল—"জিগ্যেস করলাম এই জন্যে যে পুরুষের শাস্ত্রে আবার 'পথি নারী বিবর্জিতা'ই তো বিধান।"

রাতটি সত্যিই বড় চমৎকার, বাইরে যেন আরও। যেন তিনজনেরই মত এক হয়ে গিয়ে গাড়িটাকে বেশ আস্তে-আস্তেই চালিয়ে নিয়ে চলল নলিনাক্ষ, সব পরিবেশ নিয়ে যেন চেখে চেখে চলেছে পথটা। মল্লী সমাধানটা করে দেওয়ার পর ওরা কেউই তাড়াহুড়া করেনি, তাতে রাত্রি আরও একটু এগিয়েছে, পথ আরও নির্জন হয়ে উঠেছে, তিনজনের সান্নিধ্যটা যেন আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে।

একটা রিক্‌শা পাওয়া গিয়েছিল গোড়ার দিকেই; সে যেতে চাইল না অত দূর।

তড়িৎ বলল—"ডবল ভাড়া পেলে হয়তো যায়, জিগ্যেস করব ?"

চলতি মোটর থেকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল লোকটাকে, নলিনাক্ষ এগিয়েই গেল, যেন কথাটা কানে যায়নি। আর প্রশ্ন করা হোল না। মল্লী শুধু একটু মুখ ঘুরিয়ে হাসল।

আরও বেশ অনেকখানি গিয়ে একটা চৌমাথায় এসে খানতিনেক রিক্‌শা পাওয়া গেল। তড়িৎ গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, উত্তরও পেল—যাবে, কিন্তু মোটর দাঁড় করবার কোন লক্ষণ দেখল না। যখন একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল তখন আবার মোটর খানিকটা এগিয়ে গেছে। প্রশ্নের উত্তরে নলিনাক্ষ বলল—"তখন ডবল দিতে চাইলেন, এখন এ-টুকুর জন্যে আবার ভাড়া দিতে চাইছেন। মনে হয় পয়সা বেশি হয়েছে, কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরা তো অযথা খরচ করতে দিতে পারে না।"

তড়িৎ একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে গেছে; একবার মল্লীর দিকে চাইতে ত্যাখে

তার মুখটা ওদিকে ঘোরানো। নলিনাক্ষই বলল—"বেশ, মল্লীদেবীর ওপর ছেড়ে দিই আমরা ; উনি যা বলেন।...তবে উচিত নয় বলা আপনার পক্ষ হয়ে ; এই লোকসানের ভয়ে আমার অনেক ব্যবসা বন্ধ করিয়েছেন তো ওঁরা দুজনে।"

এই কুট-চালই যে দেবে নলিনাক্ষ,—এই করে যে তড়িতের বাসা পর্যন্ত গিয়েই পড়বে, ওর হাসিতে সেটা তখনই সন্দেহ করেছিল মল্লী ; তাই সঙ্গও নিয়েছে। বলল—"আমি কেন এর মধ্যে পড়তে গেলাম ? আমার মোটরও নয়, বাড়ি পৌঁছবার তাড়া—সেও আমার নয়। আমি বেরিয়েছি মোটর চড়ে বেড়াতে, বরং যত বেশি চড়া হয় ততই লাভ আমার।"

দু'গালে হাসি নিয়ে আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

এগিয়ে চলল মোটর। শহরের ভেতরে এসে পড়েছে ওরা। নলিনাক্ষ মোটরের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। কথা বিশেষ নেই কারুর। তড়িৎ যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ ; উপায়ই বা কি ?...ভাবটা যেন এই যে, গোপন করা বরাবর যখন চলবে না, আজই হয়ে যাক শেষ। প্রীতির অত্যাচারই তো।

বরং চুপ করে থাকা অস্বস্তিকরই বোধ হচ্ছে ; ওরা দুজনেই কী ভাববে, যেন সত্যই রাগ করে বসে আছে গুম হয়ে।

বাজারটা ছাড়িয়েছে, বেশ একটু হেসেই বলল—"তাহলে থামাবেনই না? কিড্ন্যাপ (kidnap) করা হচ্ছে কিন্তু আমায়। সামনেই পুলিস-স্টেশন...এখনও বুঝুন।"

মল্লী-ই জবাব দিল ; বলল—"কিড্ন্যাপ করে যখন বাড়ি পৌঁছেই দিতে যাচ্ছি তখন আপনার মামলা টেঁকবে না..."

সঙ্গে-সঙ্গেই গা'টা একটু গুটিয়ে নিয়ে বলে উঠল—"আচ্ছা বলুন তো, আপনাদেরও কি বড্ড বেশি গরম বোধ হচ্ছে ?"

সহসা ওর ভাবান্তর দেখে দুজনেই ঘুরে চাইল ; বলল—"না তো!"

নলিনাক্ষ ব্রেক-ও চেপে দিল।

"আমার যেন হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল ; আর কতটা দূর ?"

—বলতে-বলতেই মাথাটা সামনের সীটে নুইয়ে দিল।

বাকি পথটুকু রিকৃশা ক'রে আসতে আসতে ব্যাপারটুকু নিয়ে মনে মনে নাড়াচড়া করেছিল বৈকি তড়িৎ ; মল্লীকে তো চিনছে একটু একটু করে, সত্যই কি বুদ্ধি করে

বাঁচিয়ে দিল না তড়িৎকে ? অবশ্য একেবারে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না, খানিকটা সন্দেহ লেগেই থাকে—হয়তো বাজার দিয়ে আসবার সময় সত্যিই গরম লেগে থাকবে একটু, তারই জের ছিল ওটা।

সন্দেহটা আর খানিকটা কাটল পরদিন।

একটা উদ্বেগ লেগে রয়েছে, সকাল-সকালই গেল। বাইরের লনে চেয়ার দিয়ে গেছে বেয়ারা। মল্লী একলাই রয়েছে, একটা ছোট টেবিল-ক্লথে ফুল তুলছে।

নমস্কার করে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল তড়িৎ—"কেমন আছেন ?"

মল্লী প্রথমটা যেন বুঝতেই পারল না, তার পর ভ্রূ তুলে বলল—"ও, কালকের সেই মাথা-ঘোরার কথা বলছেন ?…সেটা বাজার পেরুতে-না-পেরুতেই চলে গেল ; আশ্চর্য নয় !…বসুন, জ্যাঠামশাইকে ডেকে আনি।"

ঠোঁটে একটা হাসি উঠেছিল, সেটাকে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ভেতরে চলে গেল।

(তেরো)

তড়িৎকে গাড়ি ক'রে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল নলিনাক্ষের ; সে ওকে একটু একলা পেতে চায়। মল্লীর চালে যখন উদ্দেশ্যটা কেঁচে গেল, তখন একটু দমেই গিয়েছিল প্রথমটা, তবে মল্লী রয়েছেও তো সঙ্গে, ও-ভাবটা কেটে যেতে দেরি হয়নি এমন।

নলিনাক্ষের বাণিজ্য-অভিযানটা ওপর থেকে ধাপে ধাপে গলদা চিংড়ি পর্যন্ত নেমে এসে একচোট থেমে গিয়েছিল, তড়িতের মধ্যে উপযুক্ত সহযোগিতার সম্ভাবনা দেখে আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে চাইছে।

ছেলেটি সত্যিই বড়ঘরের আদুরে দুলাল ; তাতে ওর চরিত্রে অনেকগুলি দুর্বলতা এসে পড়েছে, কিন্তু সে তালিকার মধ্যে কোনরকম সংকীর্ণতা নেই, কোন ভণ্ডামি নেই। খেয়ালের পথ ধরে এগুনো অভ্যাস, প্রশ্রয় পেয়েছে, এগিয়ে গেছে ; বাধা পায়নি, সেজন্য যেমন কোন সংকোচের প্রয়োজন হয়নি, তেমনি কোন মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে হয়নি। সব মিশিয়ে ওর চরিত্রটি একদিক দিয়ে দুর্বল হলেও মোটের ওপর নিতান্তই স্বচ্ছ, ভেতরে-বাইরে এক।

ওর ব্যবসার কথাটাই ধরা যাক। বড়মানুষী খেয়াল-খুশি, নিশ্চয় একটা মূঢ়তাই, কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই কোন। যেমন বড় ব্যবসায় নয়, তেমনি

ছোট ব্যবসাতেও নয়; উভয় ক্ষেত্রেই মনের পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে নেমে পড়েছে।

এই সময় ওর পরিচয় হোল দেবপ্রসন্নর সঙ্গে, যেটাকে সবাই ছোট কাজ বলে এসেছে তার প্রতি ওঁর পক্ষপাতিত্ব দেখে, ও নিজের কাজের ভালো জায়গায় একটা সমর্থন পেল। এর দ্বারা ওর চরিত্রে এই একটা পরিবর্তন এসে গেল যে, ও বিশেষ করেই যেন নীচুর দিকের কাজগুলার ওপর বেশি করেই শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠল।

এরপর তড়িতের সঙ্গে পরিচয় হতে এই শ্রদ্ধাটা স্বভাবত তারও ওপর গিয়ে পড়ল। তড়িৎ হয়ে উঠল ওর হিরো (Hero), যে ক্ষুদ্র সঙ্কোচ, ক্ষুদ্র লজ্জা-মান বিসর্জন দিয়ে কর্ম-মাত্রকেই তুলে ধরেছে তার স্বকীয় মহিমায়। দেবপ্রসন্নর মধ্যে যে-বিশ্বাসটা থিয়োরী হয়ে দেখা দিয়েছিল সেটা তড়িতের মধ্যে যেন সাকার হয়ে উঠেছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে ফিরে এসেছে একটা ভরসা, এতদিন একলাই ছিল, এবার তড়িৎকে টেনে নিয়ে আর একবার নব উদ্যমে নেমে পড়বে।

যখন এস্রাজ বাজছিল, ওদের কথাবার্তা হচ্ছিল, নলিনাক্ষ নিজের চিন্তা নিয়ে ছিল। একবার একান্তে পাওয়া দরকার তড়িৎকে। আসে কম, সুতরাং সুযোগও কম, কি করা যায়? পৌঁছে দেওয়ার সুযোগটা হাতে পেয়ে আর ছাড়ল না। মল্লী অন্য একটা ভয়ে সেটা বানচাল করে দিল।

কিন্তু সুযোগের অভাব হোল না, বিশেষ করে দেবপ্রসন্নবাবুর বাড়িতে তড়িতের গতিবিধি ক্রমেই বেড়ে যাওয়ায়। একদিন এখানেই দুজনের দেখা হোল যখন মল্লী দেবপ্রসন্ন কেউই বাড়ি নেই, একটি সান্ধ্য-টি-পার্টিতে দূরে বেরিয়ে গেছেন। নলিনাক্ষ তুলল কথাটা—করবে কোনো কাজ দুজনে মিলে? টাকার জন্য ভাবতে হবে না, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ ওর।

আপত্তি ছিল না তড়িতের। মানুষ হয়ে দাঁড়াবার জন্য বাড়ি থেকে সংকল্প করে বেরিয়েছে, বাঙালীর ছেলে, স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা আছে, কৃষ্টির ওপর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু এম-এ পাস না করলে যে সেখানে পৌঁছনো যাবে না, এমন কোন মোহ ছিল না। মানুষ হয়ে ওঠার মূলে অর্থ যে একটা মস্তবড় সহায় এ-কথাটাও বোঝে; আপত্তি ছিল না। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন জানতে পারল যে নলিনাক্ষের ঝোঁকটা শুধু নীচুর দিকে এবং গলদা চিংড়ি পর্যন্ত ওদিকে পথ বন্ধ হওয়ায় রিক্‌শা নিয়েই কিছু করতে চায়, তখন তাকে দুঃখের সঙ্গে বিরত হতে হোল।

বিরত হোল কয়েকটা কারণে। প্রথমত নলিনাক্ষকে চিনতে পেরেছে সে। নীচু

ব্যবসা নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভাবালুতাও আছে ওর, তার ওপর দেবপ্রসন্নর ডিগ্‌নিটি-অব-লেবার, মল্লীর মুখে আবার তার প্রতিধ্বনি ; ভবিষ্যতে বড় ব্যবসার পথ বন্ধ হয়ে যাবেই নলিনাক্ষের।

কিন্তু তার জন্যও ততটা নয়। রিকৃশা নিয়েই বেশ একটা কিছু করা যায়, খানিকটা অভিজ্ঞতাও হয়েছে ওর, কিন্তু তাতে তো মস্তবড় বাধা। সেই কথাটা, একেবারে নাম ধাম না দিয়ে হোক, অনেকটা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিল তড়িৎ। বলল ওর আপত্তি ছিল না, কিন্তু রিকৃশা নিয়ে বড় কিছু করতে গেলে এমন একজনের স্বার্থে আঘাত দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, যাঁর কাছে জীবনের অনেক কিছুর জন্যই ঋণী সে।

ও-প্রসঙ্গটা এইখানেই আপাতত শেষ হয়ে গেল। নলিনাক্ষ নিরাশ হোল, কিন্তু সংকল্প তার অটুট রইল। তড়িৎকে জানিয়ে দিল তার ছাড়ান্‌ নেই ; রিকৃশা হোল না, আরও অনেক উপায় আছে ব্যবসার, সে ভাবছে।

(চৌদ্দ)

কিছুদিন আসা বন্ধ রইল তড়িতের। কলেজে একটা বছর শেষ হয়ে গেল ; ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে যাওয়ার পূর্বে একটা পরীক্ষা আছে, তার প্রস্তুতির জন্য বইখাতা নিয়ে ভালো করে একটু বসতে হোল। টুইশন করে পড়াশুনা করা, এই করেই চালিয়ে এসেছে বরাবর ; রিকৃশাও বন্ধ রাখতে হোল, যাওয়া-আসাও।

প্রায় মাস দেড়েক পরে, পরীক্ষাটা চুকে গেলে একদিন সন্ধ্যার পর এসে উপস্থিত হলো। ছ্যাখে দেবপ্রসন্ন, মল্লী, নলিনাক্ষ তো আছেই, অতিরিক্ত আরও দুজন উপস্থিত রয়েছে। তার মধ্যে একজনকে চিনতে দেরি হোল না তড়িতের, মল্লীর বান্ধবী সুতপা, এবং বাকি একজনকেও আন্দাজে বুঝে নিল—সুতপার স্বামী নিশ্চয়।

নলিনাক্ষ আর মল্লী স্পষ্টই উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কথার জড়াজড়ি করে বলে উঠল—"এই যে আপনি···বাঃ, কোথায় ছিলেন এতদিন ?···খবরও দিতে হয় একটা···এতদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, ভাবনার কথা তো !···"

দেবপ্রসন্নও হয়েছেন, খুশীর চেয়ে উৎফুল্লই বলা ঠিক, তবে স্বভাবতই সংযত, তড়িৎ হাসতে হাসতে একটা চেয়ারে বসলে, বললেন—"রোগাও হয়ে গেছ দেখছি ; বাইরে কোথাও গিয়েছিলে নাকি ?"

তড়িৎ বলল—"না, ছিলাম এখানেই। অন্য একটা কাজ নিয়ে পড়েছিলাম; ছিলাম তো ভালোই। আপনারা কেমন···?"

নলিনাক্ষ বাধা দিয়ে একটু শঙ্কিতভাবেই ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে উঠল—"অন্য কাজ নিয়ে···আর আপনার রিক্‌শা ?···ছেড়ে দিলেন নাকি ?"

সুতপা আর তার স্বামীর দিকে চেয়ে বলল—"এঁরই কথা হচ্ছিল সেদিন··· তড়িৎবাবু।"

ওরা আন্দাজ করেইছিল, নমস্কার করল। ওদের প্রতিনমস্কার করে তড়িৎ হেসে নলিনাক্ষকে বলল—"আমি ছাড়তে চাইলেও রিক্‌শা ছাড়বে কেন ?···জানেন তো সেই —কমলী নেহি ছোড়তি।"

হেসে কথাটা বলে মল্লীর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়ে দেখে দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে যেন একটু কুতূহলী হয়েই সুতপার স্বামীর দিকে আড়চোখে চেয়ে রয়েছে, তড়িতের সঙ্গে চোখাচোখি হতে একটু যেন নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল—"অন্যদিকের পরিচয়টাও আপনাকে দিয়ে দিই তড়িৎবাবু, এ আমার বন্ধু সুতপা আর উনি হচ্ছেন···"

একটু হেসে বলল—"বোধহয় আন্দাজই করতে পারছেন···সুতপার নতুন বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ি থেকে এই প্রথম এল।···আর, হ্যাঁ ঠিক কথা!···"

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় উৎসাহের সঙ্গে কি বলতে যাচ্ছিল, ওর কথার গায়েই দেবপ্রসন্নর কথাটা এসে পড়ল—

"আর আমাদের অনুপের পরিচয় একটু বিশেষ করে দিতে হয়, তোমার সঙ্গে ওর একটা মস্তবড় মিল আছে তড়িৎ। শ্রমের মর্যাদাই বলো, বা তার সঙ্গে যা এসে পড়ে, সাম্যবাদই বলো—আমরা আরাম-চেয়ারে বসে তার থিয়োরী আওড়াই মাত্র—তোমরা জীবনে তা সার্থক করে তুলছ···অনুপরা হচ্ছে একটা কারখানার মালিক—লোহালক্কড়ের বেশ মাঝারি রকমের কারখানা, কিন্তু সেখানে কে মজুর কে মালিক কিছু বুঝে ওঠবার জো নেই। ওর বাপ সত্যেন আমার বন্ধু, হাতুড়ি পেটা থেকে আরম্ভ করে কারখানার মালিক হয়ে উঠল—ক্রেডিট এইখানে যে, মালিক মনে প্রাণে সেই হাতুড়ি-পেটাই রয়ে গেল।···ছেলেও যে সেইভাবেই তৈরি সেটা দেখেই আন্দাজ করতে পারছ নিশ্চয়···"

আগেই নজর পড়েছিল তড়িতের,—শক্ত বাঁধুনির একটু অবাঙালী-সুলভ রুক্ষ চেহারা, মাথায় সমান করে ছাঁটা চুল, বেশভূষায় ভব্যতা আছে, বাহুল্য নেই—আগেই নজর পড়েছিল, তবু—দেবপ্রসন্নর কথায় আর একবার চকিতে নজর বুলিয়ে নিল। অনুপ

লজ্জিত হয়ে বলল—"আর নিজের কৃতিত্বটা একেবারে লুকিয়ে রাখা অব্যেস জ্যাঠা-মশাইয়ের···উনি না হলে বাবাকে যে চিরকাল হাতুড়ি পিটতেই হোত সেটা আর···"

দেবপ্রসন্ন হেসে চাপাই দিলেন কথাটা; বললেন —"আমার কৃতিত্ব, ভদ্রসন্তান হয়েও হাতুড়ি পিটছে দেখে একটু নজর গিয়ে পড়েছিল—এই তুমি রিক্‌শা চালাচ্ছ, পড়তে বাধ্য তো নজর?—তা তোমায় কি এমন রাজা করে দিয়েছি বলো···"

তড়িৎ উত্তর করল—"সাম্যবাদে যে রাজা নেই, নৈলে নিশ্চয় করতেন।"

একটা হাসি উঠল, দেবপ্রসন্ন তারই মধ্যে বলে চললেন—"আমার কৃতিত্ব অবশ্য আছে—ঘটকালিতে। স্থপার বাবা যখন পাত্রের সন্ধান দিতে বললেন, আমি বললাম—হাতুড়ি-পেটার ছেলের হাতে দিতে পারবেন?"

অল্প যে হাসি উঠল তার মধ্যে অনুপের দিকে চেয়ে বললেন—"রাগ কোরো না বাবাজি, সত্যেন এখন আবার আমার বেহাই তো···"

অনুপ হেসে বলল—"বাঃ, ওটা তো আমাদের কৌলীন্যের পদবী, আপনারই দেওয়া···"

আবার একটা হাসি উঠল, তার মধ্যে দেবপ্রসন্ন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন—"কিন্তু এক কথা —তোমায় জিগ্যেস করতেই ভুলে যাচ্ছিলাম অনুপ, স্থপা-মার গানের ব্যাঘাত হচ্ছে না তো? তার ওপর কিন্তু হাতুড়ির তাল দিলে চলবে না বাপু···"

হাসির গায়ে হাসি এসে পড়েছে; মল্লী বলল—"সে আমি আগেই খোঁজ নিয়েছি, সেরকম হলে ভাঙিয়ে নিতাম না স্থপাকে?···ক্লাসিকাল তো আছেই—বাড়িতে মাস্টার আসেন, তার ওপর কীর্তনের জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত হয়েছে।"

যেন নিজের ব্যবস্থার সাফল্যেই দেবপ্রসন্নর চোখ দুটি উজ্জ্বল; বললেন—"সত্যি নাকি? তাহলে তো শুনতে হবে—কীর্তন বাংলার নিজের জিনিস, কতদিন যে শোনা হয়নি! একদিন তাহলে···"

মল্লী বলে উঠল—"এই দেখুন, আমিও কথায় কথায় আপনার মতন ভুলে যাচ্ছিলাম। স্থপার গান শোনাবার খুব চমৎকার একটা ব্যবস্থার কথা ভেবেছি জ্যাঠামশাই—তড়িৎবাবুর অভাব ছিল, তিনিও তো এসে গেছেন। অনুপবাবুর রাঁচি নতুন তো—ঠিক করেছি গোটাকতক ট্রিপ দোব—হুড্রু, দশমধারা, জোনহা, হাজারীবাগ রোড, কাছের পিঠের জায়গাগুলোতে তো বটেই—শুধু যাওয়া-আসা নয়, রীতিমতো পিকনিক—দেখাশোনা—খাওয়া-দাওয়া।···সেখানেই স্থপার···"

স্বপা বলে উঠল—"বা-রে, বেশ মজা তো! ওঁরা ঘুরে ফিরে টহল দিয়ে বেড়াবেন—পিকনিক করবেন—স্বপা তুই বসে বসে কেত্তন গাইতে থাক্!"

সভয়ে মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে থেকে এমন করে হঠাৎ বলে উঠল যে, সবাই হেসে উঠল আবার একচোট।

মাস দেড়েকের বিরতিতে অভ্যাস খানিকটা ছেড়ে গেছে, তার ওপর রাত জেগে পড়াশুনা করার মেহনতে সত্যই অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তড়িৎ নিজের রিক্‌শা নিয়ে আসেনি, একটা ভাড়া করেই এসেছে। কারণটা অবশ্য জানাল না, তবে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে চাইল, খানিকটা হেঁটে গিয়ে, তবে রিক্‌শা পাবে। বাধা দিল নলিনাক্ষ, পাশেই বসে ছিল, ও যেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে, একরকম ধরেই বসিয়ে রেখে বলল—"না, বসুন, এতদিন পরে এলেন; আমিও যাব, কাজ আছে একটু; কাছারির কাছে নামিয়ে দোব, সেখান থেকে রিক্‌শা করে চলে যাবেন আপনি। সুতপাদেবীর একটা গান হোক, পরে আবার যখন হয়, হবে; আপনি তো শোনেননি।"

তড়িতের নজরটা মল্লীর দিকে যেন আপনিই গিয়ে পড়ল। যেমন মাথা নীচু করে একটু ভ্রূ কুঁচকে শুনছিল, ওর মনে হোল দুজনের মধ্যে যেন একটা বোঝাপড়া হয়েছে, যদি-পৌঁছে দেওয়ার দরকার হয় তো এইভাবে ঠিকানা জানার সম্ভাবনাটা এড়িয়ে যাবে। ওর কথা শেষ হলে মল্লী মুখ তুলে প্রশ্নও করল—"আপনার বুঝি বিলেট রোডে সেই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হবে?"

সুতপাকে অবশ্য গাওয়ানো গেল না, শ্বশুরবাড়ি থেকে একেবারেই প্রথম দিন, বরও সঙ্গে; মল্লীর একটা বাজনার পর বৈঠকটা শেষ হোল।

নলিনাক্ষ তড়িৎকে নিজের পাশেই বসিয়ে নিল। স্টার্ট দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল—"একটা কথা আছে তড়িৎবাবু, তাই আমিও উঠে এলুম। থাকগে রিক্‌শা, আসুন মহুয়া ধরি···"

তড়িৎ একটু বিমূঢ়ভাবেই ঘুরে মুখের দিকে চাইল। সোজা রাস্তা, মোটরটাকে স্পীডে ছেড়ে দিয়ে নলিনাক্ষ বলে চলল—

"মল্লীদেবীর পিকনিকে যাওয়ার কথায় আমার ধাঁ করে ওদিককার ছবিটা যেন চোখের সামনে ফুটে উঠল—উঃ কী মহুয়ার গাছ! চলুন, নিশ্চয় চলুন, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আমার তো আপশোসে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। ব্যবসার এত বিরাট একটা সম্ভাবনা রয়েছে পড়ে, আর আমি কিনা মোটরে-

ওষুধে-মাছে মিছিমিছি সময়টা বরবাদ করলাম! যাকগে, একলা পড়ে গিয়েছিলাম, না ছিল সামলাবার কেউ, না ছিল পরামর্শ দেওয়ার কেউ—এবার তো তা নয়। চলুন দেখে এসে দুজনে মিলে একটা স্কীম্ খাড়া করে ফেলি—দাদন দিয়ে সারা তল্লাটটার মহুয়া নিজের হাতে নিয়ে নি'—মার্কেটের কথা বলছেন?—আপনাকে খুঁজতে হবে না—নিজেরাই সব খুঁজে এসে কনট্রাক্ট্ করে যাবে—পড়তে পাবে না।···উঃ কী আপশোসটা যে হচ্ছে!···"

(পনরো)

হুডরুর ডাকবাংলোর বারান্দা থেকে নেমেই প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে খানিকটা খোলা জায়গা। সমতল। এর ধারে গিয়ে দাঁড়ালে কিন্তু গাটা ছমছম করে ওঠে। ধাপে ধাপে নয়, একেবারে সোজা নেমে গেছে পাহাড়টা।

একটা চেয়ার নামিয়ে নিয়ে এসে বসেছে তড়িৎ। একলাই। আর সবাই বাংলোর মধ্যে ঘুমুচ্ছে। একরকম রাত থাকতেই ওরা বেরিয়ে পড়েছিল; প্ল্যান, সমস্ত দিনটা এখানেই কাটাবে, সন্ধ্যারও খানিকটা; জ্যোৎস্নাপক্ষ, ফিরবে আকাশে চাঁদ স্পষ্ট হয়ে উঠলে।

এ-কাব্যের কবিও মল্লী-ই। মল্লী অবশ্য নিজেকে আড়ালেই রেখেছে; বলেছে—সুপাকে যেরকম লোকের হাতে দিয়েছি আমরা, একটু মোলায়েম করে না নিয়ে এলে চলবে কেন?

দলটি মন্দ নয়, মেয়ে পুরুষে সাতজন। চাকরটাকে বাদ দিয়ে। দুখানা মোটর এসেছে, তার মধ্যে একটা স্টেশন-কার। কয়েকটা জিনিস রাত্রেই রান্না করে রাখা হয়েছিল, দু'একটা এখানেই হবে, বাসনপত্র সঙ্গে এসেছে।

দেবপ্রসন্ন অবশ্য আসেননি। বাড়তির মধ্যে এসেছে প্রিয়রতন আর তার বোন অতসী।

আজকের মতো একটা আনন্দ-উৎসব তড়িতের জীবনে আর আসেনি। সকালে মোটরে চড়ে দীর্ঘ ষোল মাইল পথ অতিক্রম, শহর পাতলা হয়ে এসে বিরাট মুক্তির মধ্যে এসে পড়ল ওরা। দুধারে জমি ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করতে করতে একেবারে সেই দিগন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে, মোটরের গতিবেগ একটা আপেক্ষিক গতি লাভ করে সত্যিকার ঢেউয়ের মতোই মাঝে মাঝে যেন দুলে-দুলেও উঠেছে সেগুলো। দূরে কাছে

ছাড়া ছাড়া পাহাড়, রুক্ষ, ধূসর ; একেবারে দূরেরগুলা শ্রেণীবদ্ধ ; ছোট-বড় টানা-টানা গাঢ় নীলরেখায় দিক্‌লগ্ন হয়ে রয়েছে ; ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে। সামনের ঐ পাহাড়ই নাকি ওদের গন্তব্য ; ঐ পাহাড় পেরিয়ে নাকি পুরুলিয়ার এলাকা।

দূরে-কাছে গ্রাম, অনেকখানি তফাতে তফাতে। আদিবাসীদের গ্রাম, সাঁওতাল, ওরাওঁ, আরও কারা সব। পথে থাকতেই সূর্যোদয় হোল, সুপ্তোত্থিত অচঞ্চল পার্বত্য জীবনের ওপর প্রভাতের আলো এসে পড়ল।...বাংলার বাইরে এসে এ-অঞ্চলের এ-দৃশ্য যেন প্রথম দেখল তড়িৎ। আজ এতদিন হোল রাঁচিতে এসেছে, কিন্তু রাঁচির মধ্যে ছোটনাগপুর কি আছে ? বাড়ি-গাড়ির ভিড়ে কোথায় যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। যদি বা থাকেও কিছু তো রিক্‌শা চালিয়ে কি চোখে পড়ে তা ?

মেয়েদের গাড়িটা সামনে, খানিকটা দূরে ; মাঝে মাঝে ওদের মুক্তকণ্ঠের হাসি-আলাপ উচ্ছ্বসিত হয়ে ভেসে আসছে। এ গাড়িতে তড়িতের পাশেই বসেছে নলিনাক্ষ ; গ্রামে হোক, প্রান্তরে হোক, মহুয়া গাছ এসে পড়লেই হাতটা ধরছে চেপে তড়িতের—“উঃ, দেখছেন কি ব্যাপার ?...লক্ষ্য করে যাবেন।”

আজ নিঃসঙ্কোচ নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে পেয়ে নলিনাক্ষকেও যেন নূতনভাবে পেল। ওর চেহারায় স্বভাবে যে একটা ধনী দুলালের ভাব মাখানো আছে তা এমনিই আকৃষ্ট করে মনটাকে, এর ওপর আছে ওর ঐ ব্যবসার ঝোঁক, তাও যতসব আদাড়ে জিনিস নিয়ে। প্রথম প্রথম তড়িৎ সহজ বিশ্বাসে খানিকটা প্রশংসার সঙ্গেই নিয়েছিল, তারপর দেখছে এটা ওর একটা দুর্বলতা, যার জন্যে সবাই একটি স্মিতমণ্ডিত প্রশ্রয়ের সঙ্গেই দেখে ওকে। আজ দুবার দুজনের মন্তব্যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তড়িতের কাছে। একবার প্রিয়রতনের ; মহুয়া কথাটা ওর কানে গিয়ে থাকবে, তড়িৎ আর নলিনাক্ষকে একজায়গার গল্প করতে দেখে বলল—“আজ নলিন বুঝি মহুয়া-মাতাল ? তা বেচারি তড়িৎবাবুকে কেন টানা ?” একবার ওরা দুজন খানিকটা ঘুরে এলে মল্লী তড়িৎকে একান্তে পেয়ে একটু হেসে, একটু জ্বালাতন হয়ে বলল—“মহুয়া-মহুয়া ক'রে আপনাকে ঘুরিয়ে মারছেন তো ? না বাপু, একদিকে জ্যাঠামশাই, একদিকে উনি—এই দুই পাগলের মধ্যে পড়ে আমিও পাগল হয়ে যাব। আর আপনিও রিক্‌শা ছাড়ুন তড়িৎবাবু, আপনাকে পেয়ে ওঁদের মনে নতুন করে জোয়ার এসেছে।”

দিনটা আরও উপভোগ্য হয়েছে এইজন্যে যে সবার মন যেন এক সুরে বাঁধা। একটা ভুল ভাঙল আজ, প্রিয়রতনকে সেদিনের তর্কে যেন প্রতিকূল মনে হয়েছিল, আজ হুড়রু দেখে উঠে আসতে-আসতে ওকে ডেকে নিয়ে পাশে একটা পাথরের ওপর বসল, হুড়রু

নিয়েই দু'একটা এদিক-ওদিক কথা হওয়ার পর একটু অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলে উঠল—"আপনার কাছে আমার একটা অ্যাপোলজি (apology) চাইবার আছে, তড়িৎবাবু..."

তড়িৎ বিস্মিতভাবে ঘুরে চাইলে বলল—"সেদিন আমাদের দুজনের তর্ক শুনে কি মনে করলেন জানি না. কিন্তু ডিগ্‌নিটি-অব-লেবার সম্বন্ধে আমি দেবপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে একেবারেই একমত, তার মানে নলিনের সঙ্গেও। ওটা আমাদের দেশে—বাংলাদেশের কথাই বলছি—দিন দিন যে কত দরকার হয়ে পড়েছে তা নেহাত অন্ধ না হলে তো আর বুঝতে বাকি থাকে না। এই থেকে লিভিং এক্‌জাম্পল (living example) বলে আপনার প্রতিও..."

মুখ তুলে একটু হেসে চেয়ে বাধা দিল তড়িৎ। প্রিয়রতনও হেসে বলল—"তাহলে অমন তর্ক করছিলাম কেন?...ও একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে—ওরও, আমারও। কলেজের ডিবেটে আমরা দুজনে বরাবর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতাম—তর্কে পরস্পরকে হারাবার জন্যে কোমর বেঁধে।...ও হতভাগা একদিনও ডিগ্‌নিটি-অব-লেবারের বিপক্ষে বলে না যে, তাহলে দেখিয়ে দিই মজাটা..."

হাসতে লাগল।

অনুপকে প্রথমে রুক্ষ মনে হয়েছিল, সেদিন দেবপ্রসন্নবাবুর বৈঠকখানায় যেরকম চুপ করে বসে ছিল। আজ দেখল ওর মতো সরস মন দলের মধ্যে বোধ হয় আর কারুরই নয়, সম্বন্ধ ধরে ও একা একদিকে আর সবাই একদিকে, তবু সমানে সবার মোহাড়া নিয়ে গেল; আর সরস হাস্য-পরিহাসে—ঘোরা-ফেরা, খাওয়া-বসা সব-কিছুরই মধ্যেই আজকের অভিযানটিকে প্রাণবন্ত করে রাখল।

বেশ রুচিসঙ্গত স্নিগ্ধ পরিহাস, একটা তার কানে লেগে রয়েছে এখনও। মল্লী যখন বলল—"সুপাকে যেমন লোকের হাতে দিয়েছি আমরা, জ্যোৎস্নায় একটু মোলায়েম করে না নিলে চলবে কেন?"—অনুপ উত্তর করল—"আপনাদের কাছে পেয়েও যদি মোলায়েম না হয়ে থাকি মনে হয় তাহলে চাঁদের জ্যোৎস্নায় কিছু করতে পারবে আশা করেন? আমি তো দেখছি—পদনখে পড়ে আছে তার কথাগুলা।"

—কথাটা বলল ওদের তিনজনের ওপরই বিশেষ করে দৃষ্টি বুলিয়ে।

সকালের ঝোঁকে একচোট খুব ঘুরে ফিরে বেড়াল সবাই। হুডরুপ্রপাত দেখতে পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে গেল। ঘোরা-ফেরায় ঐটেই শেষ, তখন ওঠা-নামায়, নূতন-নূতন দেখে বেড়ানোর উত্তেজনায় একটা ক্লান্তি এসে পড়েছে। দলটাও গেল ভেঙে। চাকরটা উনুন জ্বেলেছে, চা খাওয়া হয়ে গেলে মেয়েরা রান্নার কাজে লেগে গেল, এরা

চারজন একটু ছড়িয়ে পড়ল। বাংলোর পেছনেই একটি মন্দির, তড়িৎ তার দাওয়ায় গিয়ে বসে ছিল, নলিনাক্ষ এসে বসল। দু'একটা অন্য কথার পর বলল—"মল্লীদেবী নিশ্চয় তখন আপনাকে ব্যবসার সম্বন্ধেই কিছু বলছিলেন।···ওঁর ধারণা আমি সারা জীবনটাই লোকসান দিয়ে যাব; মানুষ যে হারতে-হারতেই জেতে তার নূতন অভিজ্ঞতা থেকে, এটা ওঁকে কোনমতেই বোঝাতে পারলাম না···"

ওর প্রসঙ্গ উঠলে নলিনাক্ষ কখনও বলে মল্লী, কখনও মল্লীদেবী।

রোদে রং ধরেছে, অপরাহ্ণ আসছে নেমে। তড়িৎ চুপ করে আছে বসে। সমস্ত দিনটি—এখন পর্যন্ত যতটা কাটল—তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে রঙে-রসে উঠছে জেগে; কোথাও গাঢ়, কোথাও হয়তো ফিকা, কিন্তু সমস্তটুকুই রঙীন। এটা স্মৃতি, বহুদিনই জমা থাকবে মনে। এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনটা গিয়ে পড়ছে সামনে, পাশে। যতদূর দৃষ্টি যায় একটা বিরাট গহ্বর, তার আরম্ভটা দেখতে পাচ্ছে না, তবে যেখানে বসে আছে তার হাত কয়েক পরেই এই পাহাড়েরই মূলে নিশ্চয়। ডাইনে বাঁয়ে—মাথায় মাথায় বোধহয় মাইল ছ'সাতের ব্যবধান রেখে দুটো পাহাড়ের শ্রেণী সমান্তরালে একেবারে প্রায় সেই দিক্‌চক্র পর্যন্ত সোজা চলে গেছে। ওদিকেও, একেবারে দিক্‌চক্র ঘেঁষেই আর একটা পাহাড়ের শ্রেণী আড়াআড়ি ভাবে, মনে হয় যেন এ-দুটাকে স্পর্শ করেই দু'দিকে বেরিয়ে গেছে। চারিদিকে উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই বিরাট গহ্বরের এই উপত্যকার শীর্ষদেশে একদিকে বসে আছে তড়িৎ, হুডরুর এই জায়গাটাও তো একটা পাহাড়েরই ওপরে। ওর পাশেই মন্দির আর বাংলোটার গা ঘেঁষে খরস্রোতা সুবর্ণরেখা যাচ্ছে বয়ে। বেশি চওড়া নয়, গভীরতা তো নেই বললেই হয়—যেখানে জল নেই, এবড়ো-খেবড়ো পাথর—যেন একখানা প্রকাণ্ড আভাঙা পাহাড়ের চাঁইয়ের ওপর দিয়ে—নিজের তীব্র স্রোতে সেটাকে ঘষে ঘষে, কুরে কুরে বয়ে চলেছে সুবর্ণ রেখা—তারপর, পাহাড়ী মেয়ে হঠাৎ নূতন খেয়ালেই যেন ঐ বিরাট গহ্বর লক্ষ্য করে দিয়েছে ঝাঁপ।··· নীচে গিয়ে তো দেখল সকালে, কী উন্মত্ত উল্লাস সে, কী প্রচণ্ড অট্টহাস! ক্ষণিকক্ষণ সবাইকেই রেখেছিল মৌন করে।

আবার ঐ দেখা যাচ্ছে সেই পার্বত্য কন্যাকে—বহু নীচে, বহু-বহু দূরে, উপত্যকার মাঝখান দিয়ে একটি নীল, শীর্ণ, সর্পিল রেখা—কোথাও প্রকট, কোথাও লুপ্ত; এত দূর থেকে স্রোতোবেগ দৃষ্টিগোচর নয় বলে মনে হয় যেন দুরন্ত মেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘুমে এলিয়ে।

ওরই কিনারায়, বিরাট গহ্বরটার একেবারে নীচে, খানিকটা ব্যবধান রেখে খান-তিনেক কুটীর ; একটি পরিবার, কিম্বা হয়তো একখানি গ্রামই, এত উঁচু থেকে দেখাচ্ছে যেন খেলাঘর। তারপর আবার গ্রাম চোখে পড়ে ঐ নীচু থেকে একেবারে বাঁ-দিকের ঐ পাহাড়ের মাথায় একজায়গায়, কম করে ধরলেও ও-গ্রামটা থেকে সোজা পথে মাইল চারেক দূরে তো বটেই। ঐ রকম তিন-চারখানি ঘর লি-লি করছে ; একটি ঘরের গা থেকে পড়ন্ত রোদ পড়েছে ঠিকরে। চারিদিকেই নীল, মনে হচ্ছে একটি মেয়ে যেন নীলাম্বরী শাড়িতে সর্বাঙ্গ ঢেকে শুধু তার টুকটুকে মুখটি বের করে রেখেছে।

দেখায় একসঙ্গেই এত বিচিত্রতা, এমন একটা বিরাট অনুভূতি—তড়িতের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। সবচেয়ে অভিভূত করেছে সামনের ঐ বিপুল শূন্যতা। মনে হচ্ছে চতুর্দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা ঐ গহ্বরটা শূন্যতা দিয়ে যেন পূর্ণ করা রয়েছে।···একটি কি পাখি তড়িতের দৃষ্টির নীচে এই শূন্যতা সাঁতরে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ের দিকে চলেছে।

কোনো শব্দ নেই, এক হুড্রুর ছাড়া। কোনো বিরতি নেই, বৈচিত্র্য নেই বলে ওটাও যেন একটা শুদ্ধতাই ; এই মহানৈঃশব্দের মধ্যে যাচ্ছে হারিয়ে। স্বর্ণরেখা যেন ঐ অতলে কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল।

একটা থমথমে ভাব আচ্ছন্ন করে ফেলেছে মনটাকে। শব্দহীন, অতলস্পর্শ বিপুলায়ত একটা কিসের সামনা-সামনি হয়ে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র, বড় অসহায় বোধ হচ্ছে। জীবনের অফুরন্ত পথ বেয়ে আসা ; মানপুর-বর্ধমান···কত বিচিত্র মুখ···কিন্তু সব যেন ছেড়ে-ছেড়ে যাচ্ছে কেন ? বড় নিঃসঙ্গ, কেউ এসে পাশে দাঁড়াক, হাত ধরুক।

পেছনে, ডাকবাংলোর দরজার কাছ থেকে প্রশ্ন হোল—"বাঃ, আর আপনি ঘুমোননি ?"

ঘুরে ছাখে চৌকাঠের ফ্রেমের মাঝখানে ওর মাথার ওপর দিয়ে সামনে দৃষ্টি ফেলে মল্লী দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে এসে বারান্দার কিনারায় সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বলল—"অবিশ্যি ঘুমুতে পারবেন না যে, সেটা আমার আন্দাজ করে নেওয়া উচিত ছিল।"

তড়িৎ অল্প হেসে ভ্রূ-দুটো কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে চাইল।

মল্লী বলল—"যেমন লুকিয়ে গান-শোনা অব্যেস···"

"গান !···গান কোথায় ?"—বেশ বিস্মিতভাবেই চাইল তড়িৎ। একটু অপ্রতিভও, সত্যি কেউ গাইছিল নাকি ওদিকে মেয়েদের ঘরে নীচু গলায় ?

মল্লী একটু হাসতে হাসতে নেমে এল।

"না, ঠিক সে-গান নয়। মানে···"

নেমে এসে চেয়ারের পাশে একটু তফাত হয়ে দাঁড়াল। মুখের ভাবটা বদলে গেছে। বলল—"কিরকম গম্ভীর, কিরকম থমথমে দেখছেন?…কী যে মনে হয় যেন বুঝে উঠতেই পারা যায় না—ভয়—না—আনন্দ—না…"

তড়িৎ প্রশ্ন করল—"বসবেন? চেয়ার এনে দি' একটা?"

"না-না—চেয়ার আনতে হবে না। তা ভিন্ন, ওরে বাবা! আমি বেশিক্ষণ এখানে বসতে পারি কখনও?—মাথা ঘোরে…"

একটা যেন ঘোর থেকে জেগে উঠেছে। হঠাৎ যে ভাবাবেগটুকু এসে পড়েছিল সেটা সামলে নিল কোনরকমে, তারপর বলল—"আর, এবার তো গান-বাজনাই আপনাদের প্রোগ্রামে, যাই দেখিগে। দেরি হয়ে যাবে ফিরতে নৈলে।"

পৃষ্ঠভঙ্গই দিল। সিঁড়ির মাথায় একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—"মাফ করবেন, ডিস্‌টার্ব করে দিলাম মাঝখান থেকে।"

আচ্ছন্নভাবেই বসে রইল তড়িৎ।…একটা সঙ্গীত-ই বৈকি—মৌন, এক মহাসঙ্গীত-ই—মল্লী ঠিকই ধরেছে…আর মল্লী ভিন্ন এমন একটা কথা কে বলতে পারত? একটা কথাতেই যেন নিঃসঙ্গতাটুকু ঘুচিয়ে দিয়ে গেল—বিপুল পৃথিবীতে একজনও যে তোমায় চিনেছে, তোমায় বোঝে—এ-ই তো নিঃসঙ্গতার অবসান।

(ষোলো)

কয়েকদিন এইরকম একটানা হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। রাঁচিকে কেন্দ্র করে বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে যা কিছু দেখবার জায়গা, বেড়াবার জায়গা প্রায় সবগুলো ওরা ওদের প্রোগ্রামের মধ্যে রেখেছে, একে একে শেষ করবে। এমন কিছু দেখবার-বেড়াবার নয়, এমনও দু'একটা মাঝখানে এসে পড়ছে। রাঁচি-হাজারীবাগ রোড হয়ে যাচ্ছিল ওরা, রামগড়ের কাছে পাহাড়টায় একটা জায়গার সন্ধান পেয়েছে, পথে স্টেশন-কারটা একটু বিগড়ে যাওয়ায় সবাইকে নামতে হোল। রাস্তার ডান দিকে একটা খোলা মাঠ, বাঁ দিকে একটা শালবন, ঢালু জমির গা বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে।

একটা ছোট সাঁকো রয়েছে, ওরা তারই ওপর বসে ছিল, নলিনাক্ষ একটু যেন কুণ্ঠা কাটিয়ে উঠে বলল—"তড়িৎবাবু, আমরা ততক্ষণ জায়গাটা একটু ঘুরে-ঘারে দেখে এলে কেমন হয়? উঠবেন?"

ওর সেই মহুয়ার সন্ধান, জানাজানি হয়ে গেছে, মল্লী বলল—"আমাদের সঙ্গে নেবেন নলিনাক্ষবাবু? কথা দিচ্ছি, ব্যবসায় ভাগ বসাব না।"

একটু হাসি উঠল। মোটর সারতে একটু দেরি হবে, সবাই উঠে পড়ল।

একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, ওরা এগিয়ে চলল। খানিকটা গিয়ে জমিটা একটা খাদের মধ্যে নেমে গিয়ে আবার ওদিকে গোল হয়ে উঠে গেছে। বনটা খাদের মধ্যে একটু ঘন, এদিকটা যেমন পরিষ্কার সেরকম নয়, আগাছাও রয়েছে। খাদের ওদিকটায় কিন্তু আর বন নেই, গুটিপাঁচেক ঘর নিয়ে একটি ছোট্ট গ্রাম, আশেপাশে ঢালুর ওপর আল বেঁধে বেঁধে ক্ষেত—এ অঞ্চলে যেমন হয়।

গ্রাম থেকে দুটি মেয়ে কলসি নিয়ে খাদের দিকে নেমে আসছে দেখে তড়িৎ বলল—"তাহলে নীচে নিশ্চয় ঝর্ণা আছে একটা, দেখব?"

ওর এইরকম হয়েছে আজকাল। এই সঙ্গ, এই সমাবেশ—জীবনকে এ-ভাবে কোনদিন পায়নি আর, ও যেন সবার চেয়ে বেশি করে হুল্লোড়ে গা ঢেলে দিয়েছে। যেন একটা কি নূতন দৃষ্টি খুলে গেছে এ'কয়দিনে; কোন জিনিস, কোন দৃশ্য সামান্য বলে মনে হয় না, বরং চোখে কি একটা অঞ্জন লেগে গেছে, যা সামান্য তা যেন আরও বেশি অসামান্য হয়ে ওঠে ওর কাছে।

"দাঁড়ান দেখেই আসি"—বলে নেমে গেল; একটু পরেই আগাছার মধ্যে থেকে মাথা তুলে বলল—"সত্যিই একটা ছোট্ট ঝর্ণা!"

অনেকটা ছেলেমানুষী ভাব, কিন্তু এতই অকৃত্রিম, সবার যেন ছোঁয়াচ লাগে। বিশেষ করে অনুপের। পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে তার এই নূতন পরিচয়, সবই অভিনব দৃষ্টিতে দেখে; একটু উল্লসিত হয়ে উঠে বলল—"সত্যি নাকি? দেখি তো।"

কোথাও কিছু নেই, মাঝখান থেকে জল বেরিয়ে আসছে, বড় আশ্চর্য লাগে ওর, নেমে যায়, তারপর ওর পেছনে পেছনে আরও সবাই নেমে যায়।

ঠিক ঝর্ণা বলতে যা ধারণা হয় তা নয়। এইখানেই পাথুরে জমি ফুঁড়ে তিন জায়গায় তিনটি জলের ধারা বেরিয়ে এসে একজায়গায় মিশে গেছে, তারপর ছোট্ট একটি স্রোতে নুড়ির মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে ঢালু বেয়ে নেমে গেছে। এক এক জায়গায় বিঘতখানেকও চওড়া নয়, তবে এক এক জায়গায় বেশ একটু ফাঁদালো; প্রায় হাতখানেক গভীর স্বচ্ছ জল, খুব ছোট ছোট একরকমের মাছও রয়েছে।

এই ক'টা দিন যে-সব জায়গা দেখে এল—হুডরু, জোনাহা, রামগড়ের দামোদর,—এদের একটা বিরাট গাম্ভীর্য রয়েছে, যেন গায়ে হাত দেওয়া যায় না, তফাত থেকে স্তম্ভিত

বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়; এদের সামনে এই শীর্ণকায়া স্রোতটুকু এত আপন, এত সহজ, এত ঘরোয়া মনে হচ্ছে যে সবাইকেই একটি হালকা কৌতুক-রসে অভিসিঞ্চিত করে দিয়েছে। কোথাও পরিষ্কার, কোথাও আগাছার ডালপালা এসে ঘাড়ে পড়ছে; কোনটায় কাঁটা, কোনটায় ফুল, ঠেলে সরিয়ে, ফুল তুলে, তরতরে ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে এগিয়ে চলল ওরা।

বাঁ দিকে একটা বাঁক, সেটা ঘুরেই খাদটা আরও বেশ ফাঁদালো হয়ে গেছে। হাত দশ-বারো নিয়ে একটা বৃত্ত, নীচে হাঁটুখানেক গভীর জল, তলার বালি-নুড়ি দেখা যাচ্ছে; সেই ছোট ছোট মাছ। মল্লী-ই এগিয়ে ছিল, হাততালি দিয়ে ঘাড়টা ঘুরিয়ে বলে উঠল—"কী চমৎকার দেখুন!…"

পা চালিয়ে এগিয়ে এল ওরা। মল্লী হাত দুটো একত্র করে খুশিতে নিজের শরীর-টাকেই জড়িয়ে নিয়ে বলল—"সুপা, আয় পুণ্যিপুকুর করি…মন্তরটা মনে আছে?…"

জড়ো হয়েছে সবাই; অনুপ বলল—"বাঃ, ভাঙাচ্ছেন নাকি! পুণ্যিপুকুর শিবপুজো—এসব তো মেয়েরা ভালো বরের জন্যে করে, সুপা আর কি দুঃখে করতে যাবে?"

হঠাৎ উচ্ছল হয়ে পড়েছিল বলেই মল্লী একটু যেন গুটিয়ে গেল, সুতপাই বলল—"মল্লী, বল্‌না, মন্দ বর ভালো করবার জন্যেও করে।"

উত্তরটা এমন অপ্রত্যাশিত দিক থেকে এল যে, একটা যে হাসি উঠল তাতে যোগ দেওয়া ভিন্ন প্রথমটা আর কোন উপায় রইল না অনুপের, তারপর ভেবে নিয়ে হাসতে-হাসতেই কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, বাধা পড়ল। গাঁয়ের যে দুটি মেয়ে জল নিতে আসছিল, তারা আড়ালে আড়ালে চড়াই বেয়ে উঠে এসে এদের দেখে খাদটার ওপরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মল্লীর-ই প্রথমে নজর পড়ল। একটু যে লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল, সেইটে কাটিয়ে ওঠবার জন্যেই বলল—"তোরা জল নিতে এসেছিস?…দাঁড়া ওপরেই, আমি ভরে দিয়ে আসছি।"

ওরা কিছু ভেবে ওঠবার আগেই, উঠে গিয়ে দুজনের হাত থেকে কলসি দুটো নিয়ে নেমে আসছে, সুতপা এগিয়ে গিয়ে বলল—"আমায় একটা দে।"

বড় কলসি, অভ্যাস নেই মোটেই তার ওপর, জল ভরে দু'হাতে কানা ধরে খাদের পাথুরে গা বেয়ে উঠতে যাবে, তড়িৎ বলল—"পারবেন না, রিস্কি (**risky**), আমাদের দিন…"

এগিয়ে গেল; ওর কথায় অনুপ আর প্রিয়রতনও। এদিকেই ছিল বলে তড়িৎ মল্লীর হাতের কলসিটা নিয়েছে, অনুপ গিয়ে সুতপারটা ধরল।

মল্লী যেন অপেক্ষাই করছিল, হাততালি দিয়ে একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল; বলল—"পুণ্যিপুকুরের নাম করতেই সুফল দেখুন—সদ্য সদ্য দুষ্টু বর কেমন লক্ষ্মীটি হয়ে গেল!"

একটা হাসির হুল্লোড় উঠল সঙ্গে সঙ্গে। অনুপ একেবারে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছে, সুতপাও; কলসিটা বোধহয় পড়েই যেত হাত থেকে, মল্লী তাড়াতাড়ি তলাটায় দু'হাত বাড়িয়ে দিল।

প্রিয়রতন গিয়ে কানাটা ধরল। তড়িৎ নেমে আসছিল; বলল—"আপনি আর কষ্ট করবেন কেন, আমায় দিন।"

অনুপ একটা সুযোগ পেয়ে গেল; বলল—"কষ্ট হলে কি আপনিই উঠে যেতেন?"

মেয়ে দুটি এসে পড়ে ঠাট্টার মধ্যে, কিন্তু জামাই বলেই ঠাট্টাটা বেমানান হোল না, আর একটা হাসির ঢেউ উঠল।

এই মুখর পাহাড়ে-ঝর্ণার মতোই সবার মুখ গেছে খুলে, খাদের তলাটা যেন ছলছল করতে লাগল।

এক একটা পাথর আশ্রয় করে ওরা গোল হয়ে বসল। ক্রমেই আরও যেন ছড়িয়ে পড়ছে মনটা, আরও যেন লঘুচিত্ত হয়ে পড়েছে সবাই।

জামাই হিসাবে অনুপের সুযোগটা বেশি, সে যেন অতিমাত্র সতর্ক হয়ে উঠেছে—কারুর এতটুকু ত্রুটি হলে বাদ দেবে না—

একসময় গানের কথা উঠল। সবাই ধরে বসল মল্লীকে; তড়িৎ বলল—"হ্যাঁ মল্লীদেবী, গান। আমি বরং এস্রাজটা নিয়ে আসি মোটর থেকে।"

উঠতে যাচ্ছিল, মল্লী বলল—"না তড়িৎবাবু, যাবেন না; আমি এখন সম্পূর্ণ অন্য মুডে (mood) রয়েছি।"

নলিনাক্ষ বলল—"কী মুডে, বেশ তাই হোক-না।"

মল্লী একটু হেসে অতসী আর সুতপার দিকে চাইল; বলল—"চল্, আমরা বরং মাছ ধরিগে।"

"মাছ ধরবেন!!"—নলিনাক্ষ, প্রিয়রতন একসঙ্গে বিস্মিত প্রশ্ন করে উঠল।

মল্লী একটুও অপ্রতিভ না হয়ে, কপট চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বলল—"হ্যাঁ…আঁচল দিয়ে ছেঁকে।…চল্ অতসী, চল্ সুপা।"

অনুপ প্রস্তুতই ছিল; বলল—"যদি বলেন তো গানটা না হয় তাহলে আমিই ধরি ততক্ষণ। লোভ হচ্ছে।"

আজও সমস্তদিন ঘুরে ঘুরে কোন ফল হোল না। অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদ। প্রাইভেট টুইশনি সম্বন্ধে খুব যে একটা মোহ আছে এমন নয়, বরং তার উল্‌টোই, কিন্তু উপায়ান্তরও তো নেই।

হিনু অনেকখানি দূর। কাল এইসময় যখন ফেরে, একজায়গায় একটা আশা নিয়ে ফিরেছিল তাই পথটা খেয়াল হয়নি। আজ গোড়াতে এসেই আশাভঙ্গ, গৃহস্বামী নিয়োগ করবার যা শর্ত দিলেন তার শেষেরটা কানের মধ্যে যেন কায়েমী হয়ে বসে গেছে, এখনও গা'টা সিড়সিড় করে উঠছে। মানিয়ে সানিয়েই বলবার অবশ্য চেষ্টা করলেন—"আর কিছু নয়…বাজার—সেটা অবিশ্যি চাকরটাই করে…তবে নেহাত যদি কোনদিন গরহাজির হোল…হয় না বড় একটা, তবে…দৈবাৎ যদি…"

"তাহলে এঁটো বাসন-কোসনও তো থাকবে পড়ে?"

ওঁর বক্তব্যটা পুরোপুরি বেরুবার আগে উত্তরটা যে দিয়ে ফেলতে পেরেছিল এই সান্ত্বনা নিয়ে বেঁচে আছে তড়িৎ। প্রথমেই ঐ প্রবল ধাক্কা, তারপর অবসন্ন মন নিয়ে আরও পাঁচটা জায়গায় টুইশনির সন্ধান নিয়ে বেড়ানো, পা যেন আর উঠতে চাইছে না।

সামনে একটা রিক্‌শা আসছে। রাঁচির উঁচুনীচু রাস্তা দিয়ে রিক্‌শার আরাম—চিন্তাতেই শরীরটা যেন আরও ভারী হয়ে আসে। রুখবে কি রুখবে না এই ভাবনার মাঝেই আপনি-আপনি যেন একটা রফা হয়ে গেল, পকেটে হাত দিয়ে পয়সা-রেজগি যা আছে গুণতে লাগল। দরকার ছিল না; নিয়ে বেরিয়েছিল ছ'আনা, দম ক'রে নেবার জন্য দু'বার দু'খিলি পান খেতে হয়েছে, বাকি পড়ে আছে পাঁচ আনা। জানাই। রিক্‌শাটা যে গড়ানের মুখে, সাঁ করে বেরিয়ে গেল হিসাব করতে-না-করতে, নৈলে ডাকলে হোত।

এক এক সময় মনকেও ছেলে-ভোলাতে হয়; তাই বোধহয় করল তড়িৎ। চড়াই ঠেলে উঠতে লাগল।

একটা বাড়ির রক, রাস্তার ধার থেকেই উঠেছে। মনে হয় বাঙালীর বাড়ি যেন। হ্যাঁ, তাই; ছেলেমেয়েদের গলা শোনা যাচ্ছে। জাত-টিউটার, সে গলায় বয়স চিনে নেয়।…রয়েছে যেন সম্ভাব্য ছাত্র-ছাত্রী, দেখবে নাকি একবার চেষ্টা করে? তাহলে কিন্তু আগে রকটায় একটু জিরিয়ে নিয়ে।

এগিয়ে যাচ্ছিল, নজর পড়ল চড়াই ঠেলে একটা রিক্‌শা উঠে আসছে। ঘুরে দাঁড়াল। প্রশ্ন করল—"হিনু যাবি?"

যাবে রিক্‌শাওলা।

"কত নিবি?"

এখান থেকে হিনুর বারো আনা। পাছে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা এসে পড়ে সেই ভয়েই যেন তড়িৎ চেপে বসল রিক্‌শাটায়; বলল—"চল্‌।"

তারপর অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করতে লাগল। না, পুঁজিভাঙা আর চলবে না। হাতে মাত্র সতরোটি টাকা আছে, তার মধ্যে দশটি না-থাকার মধ্যে। যাঁর বাড়িতে ছেলে পড়িয়েছিল, মহীন্দ্রবাবু, খুব হিসাবী লোক তিনি। হঠাৎ বদলি হয়ে যেতে হোল। আটদিনের ভাড়া বাদ দিয়ে বাকিটা বাড়িওয়ালাকে দিয়ে গেছেন, তড়িতের সঙ্গে মোকাবিলা করেই; বাকিটা সে মাসের শেষে দিয়ে দেবে। তার পর পুরো ভাড়া দিয়ে থাকতে পারে-না-পারে সে তার নিজের ভাবনা। সতরো থেকে দশ গেলে বাকি থাকে সাত। ওতে হাত দিলে আজ রিক্‌শা-চড়ার আরাম একদিন উপবাসের দুর্ভোগে রূপান্তরিত হবে। পকেটে যে কটা পয়সা আছে, তাইতেই যা হয়।

তবু একবার চেষ্টা করল। বলল—"হ্যাঁরে, হিনুর তো অত ভাড়া নয়; তবে তুই অত চাইছিস কেন?"

শুধু একবার চেষ্টা করা, নৈলে রিক্‌শা রাঁচিতে এসে চড়ল কবে যে, ভাড়ার খবর রাখবে? রিক্‌শাওলা জানাল—তবু ইউনিয়ান যে রাত্রে দূর শফরে 'ইস্‌পিসাল' রেট বেঁধে দিয়েছে সেটা চার্জ করেনি। আবার মনে মনে হিসাব চলতে লাগল। একটু পরে…কথাটা মুখ দিয়ে বের করতে কেমন লজ্জা-লজ্জা করছে। তা এত লজ্জাই বা কিসের? আধা-অন্ধকার নির্জন পথ; আর রিক্‌শাওলা, সে এমন কিসের কুটুম!—তাও রয়েছে উল্‌টো দিকে মুখ ফিরিয়ে; বলেই ফেলল তড়িৎ—"তুই বরং এক কাজ কর—ছ'আনায় যেখান পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবি সেইখানে গিয়ে আমায় নামিয়ে দে। কতখানি হবে?"

রিক্‌শাওয়ালা জানাল—নদীর এপার পর্যন্ত যেতে পারে।

তাহলে তো হিনু আর বেশি দূর থাকে না। বেশ হেঁটে ওটুকু সেরে ফেলতে পারবে; ততক্ষণ বেশ খানিকটা বিশ্রামও পাবে তো। বসে আবার পুঁজির হিসাব করতে লাগল—পকেটে যেটা রয়েছে। এবার লজ্জাটা আরও বেশি করে চেপে আসছে, তবু চোখ কান বুজে বলেই ফেলল—"তুই বরঞ্চ এক কাজ কর, পাঁচ আনা পর্যন্ত যতটুকু

নিয়ে যেতে পারবি ততটুকুই নিয়ে চল্।…তোকে রাত্তিরে আর বেশি ঘোরাতে চাই না।”

রিক্শাওলা এবার চুপ করে রইল। ওর নীরবতার জন্যেই আরও বেড়ে গেল লজ্জাটা। কী মনে করল লোকটা? খুব শাঁসালো যাত্রী পেয়েছে তো, পয়সা বাঁচাবার জন্যে অর্ধেকেরও বেশি পথ ছেঁটে দিতে চায়! অপ্রতিভ হয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, হুঁশ হোল নদীর গড়ানের সামনে এসে; ব্যস্ত হয়েই বলে উঠল—“একি, তুই তো নদীর ধারেই এনে ফেলেচিস! দাঁড়া—নামি।”

দাঁড়াল না রিক্শাওলা, গড়ানের মুখে রিক্শা নামিয়ে দিয়ে বলল—“চল্, তুরে হিয়ুতেই পৌঁছায়া দি।”

আপত্তি করল আবার, কিন্তু তখন রিক্শা গড়গড়িয়ে নেমে চলেছে, মাঝে মাঝে ব্রেকের চাপ দিয়ে সংযত করে রাখা। এক ধরনের স্বস্তিই অনুভব করছে তড়িৎ, সেই যে একটা হীন দৈন্যের ভাব এসে পড়েছিল, সেটা কাটিয়ে দেওয়ার একটা সুযোগ। একটু দরাজ কণ্ঠেই অবহেলার ভাবে বলল—“তা চল্ নিয়ে। গরীব মানুষ লোকসানে পড়িস কেন? পুরো ভাড়াই নিয়ে নিস্।”

ছোট্ট সাঁকোটা পেরিয়ে রিক্শা চড়াইয়ে মাথা তুলল। প্যাডেলে চাপ দিয়ে রিক্শাওলা বলল—বারো আনা দিবি কেনে? চার আনাই দিবি; তুরে পৌঁছায়ে দিচ্ছি।”

“তা কি হয়? গরীব মানুষ আছিস…”

“হ, আছি। গরীব না হোলে রিসকা টানব কেনে? তা আজ তো গরীবটি নয়। তুর বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে ভালো রোজগার করলাম—সাড়ে পাঁচ টাকা কামালাম,—চল্, তুরে দিয়ে আসি। উ চার আনাও রাঁখে দিবি।”

“তা কি হয়? তবে নেমে যাই আমি। তোর মেহনতের পয়সা…”

চড়াইয়ের মুখে পায়ের চাপে প্যাডেলের চেনটা খটখট করে পিছলে-পিছলে যাচ্ছে। রিক্শাওলা চাপা নিশ্বাসের মধ্যেই বলল—“তুর জন্যে আর আলাদা মেহনত কুথায় হোল?”

“তার মানে?”

“ইদিকেই তো আসছিলুম। রিসকা জমা দিতে হবে না?”

“জমা দেওয়া মানে? তোর নিজের নয়?”

“নিজের কুথা থেকে পাব রে, গরীব মানুষ। আটটা থেকে আটটা রাত। দু’টাকা

জমা, হিনুর আগে অখিল ঘোষের দুকান, তুরে নামায়ে এসে দিয়ে দেব—এই তুর রিসকা, এই তুর জমার টাকা…রুবাই এখন খালাস।…তু পয়সা না দিবি। আজ আমি আর গরীব কুথায় ?"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে তড়িৎ, সংক্ষিপ্তভাবে বলল—"আচ্ছা চল্, সে দেখা যাবে পৌঁছে।"

হঠাৎ একটা নূতন চিন্তার জোয়ার এসেছে। এই রিক্‌শাওলা, নামটা বলল রুবাই, আজ আটটা থেকে আটটার মধ্যে সাড়ে পাঁচটা টাকা উপার্জন করল! তড়িৎ, ও-বারোগণ্ডা পয়সা নেওয়াবেই, তাহলে ছ'টাকার ওপরেও আর চারগণ্ডা। স্বাধীন বৃত্তি, কারুর গোলাম নয়, কারুর খাতক নয়। কারুর মুখ-প্রত্যাশী নয়; বরং উল্‌টে বদান্যতা করবার অধিকার অর্জন করেছে; বলল—চার আনাতেই যাবে। অশক্ত দেখে করুণাবশে আরও উদার হয়ে উঠল—"উ চার আনাও রাঁখে দিবি।"

প্রার্থী না হয়েও প্রার্থীর লজ্জা, প্রার্থীর হীনতাটা অবশ্য অনুভব করেছে তড়িৎ—তার পাশেই কিন্তু রিক্‌শাওলার বুকের গৌরবটাও নিজের বুকে যেন করছে অনুভব; অতবড় একটা কথা বলতে পারা অমন দরাজ গলায়!

চড়াই-উতরাইয়ের ঢেউ ভেঙে এগিয়ে চলেছে। পিঠের ওপর একটা ছেঁড়া গেঞ্জি; ভালোরকমই ছেঁড়া, তার বড় বড় ফাটলের মধ্যে দিয়ে ওর কালো কুচকুচে গায়ের খানিকটা খানিকটা যাচ্ছে দেখা। ঘামে ভেজা পিঠের, পাঁজরার মাস্‌ল্‌গুলা চিকচিক ক'রে পাকিয়ে উঠছে। একটা অপূর্ব ছন্দ, সারা অঙ্গ জুড়ে স্বাধীন মুক্ত আনন্দের নৃত্যচ্ছন্দ। তড়িতের মনেও দোলা দিচ্ছে, চোখ ফেরাতে পারছে না।

গল্প আরম্ভ করে দিল তড়িৎ, জীবন-যুদ্ধে জয়ী এইরকম একজন পুরুষের অন্তরঙ্গতা লাভ করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আদিবাসী, বাড়ি মানভূম জেলায়—পঞ্চকোট পাহাড় জানে তো তড়িৎ ?—তার নিচে মঙ্গলডি ব'লে একটা গ্রামে। কিছু ক্ষেত আছে, বেশিটুকুই মহাজনের কাছে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল, তাই রোজগারের জন্য বেরিয়ে পড়ে; মাস-ছয়েক হোল। প্রায় সবটুকুই ছাড়িয়ে এনেছে, বড় ভাই দেখাশোনা করে, তার কাছে টাকা পাঠায়।

"তাহলে ফিরে যাবে নাকি এবার ?"—তড়িৎ প্রশ্ন করে।

একটা ছোট চড়াইয়ের মুখে প্যাডেলের ওপর জোরে চাপ দিল রুবাই। পায়ের গুলোটা পাশের পোস্টের আলোয় চকচক করে উঠল; বলল—"না, আর কে যাঁবে রে ? রোজগার হইছে। অখিলবাবুর পারা দুকান করব। উ-ও তো এমনি রিসকা ঠেলেছে,

আজ পনেরোখানা রিসকার মালিক—ফি রিসকা দিনে রাতে দু'খেপে তিনটাকা, হিসাব ক'রে দেখ না। আর ফিরে যাব কেনে?"

অবশ্য রোজ যে পাঁচ-সাড়েপাঁচ হচ্ছে এমন নয়—অখিলবাবুর পাওনার কমও হয়ে গেছে কখনও কখনও, তবে কর্জ রাখে না…কর্জ হারামী তো; বেরুবার সময় ওদুটো টাকা বটুয়াতে রেখে নেয়।…যেমন কম পড়েছে তেমনি আবার সাড়ে পাঁচাটাকার ওপরেও উঠে গেছে। দূর শফরে সবচেয়ে বেশি কামিয়েছে বারো টাকা।

উৎসাহে মাথা ঘুরিয়ে একটু তুলিয়েই দেয় রুবাই—"হাঁ রে,—তবে বলছি কি তুকে—বারো টাকা—একদিনের রোজগার—ই দুখানা পায়ের জোর, আর কিছু না। তু ভাঁবিস কি!"

অনেক কিছু ভাবছে তড়িৎ—মুখে একটা অন্যমনস্ক হাসি, তার অন্তরালে অনেক কথা, তার সবটাই টাকার কথা নয়—টাকাটা বরং গৌণ, অখিল ঘোষ হয়ে-ওঠাটাও গৌণ। মুখ্য কথা, যা সব-কিছুরই ওপরে—তা মর্যাদা, তা মুক্তি; পৌরুষকে স্বীকার করে নিয়ে, অভিনন্দিত করে নিয়ে, দেহের সঙ্গে মিতালি ক'রে নিয়ে আত্মার বিজয় অভিযান। রুবাই যেন মানুষকে আজ নিজের সত্যে চিনিয়ে দিল।

এর পাশে আজকের সেই অভিজ্ঞতাটা ধরা যাক-না।

ছেলেমেয়েদের বিদ্যাদান করবে, কতবড় সম্মান, কতবড় মর্যাদার কাজ; লোকটার কিন্তু বলতে মুখে একটু আটকালো না যে, চাকরের অবর্তমানে ঝুলি কাঁধে করে বাজার করে আনতে হবে!

রুবাই প্রশ্ন করলে—এবার কোন্ দিকে যেতে হবে?

এতই অন্যমনস্ক ছিল তড়িৎ যে খানিকটা এগিয়ে প্রশ্নটা আর একবার করতে হোল, তড়িৎ উত্তর করল—"কি বললি?…ও! হ্যাঁ…তোকে অতদূর যেতে হবে না; আমায় অখিলবাবুর ওখানেই নিয়ে চল্।"

রুবাই প্যাডেল থামিয়ে ঘুরে চাইল, বিস্মিত প্রশ্ন হোল—"অখিঁল ঘোষের উখানে? সিথায় তুই কি করবি?"

তড়িতের হুঁশ হোল, এরকম একটা প্রশ্ন হতে পারে। প্রস্তুত ছিল না, তাড়াতাড়িতে যা একটা জুগিয়ে গেল তাই বলে দিল—"করা…মানে, একজন অখিল ঘোষকে জানতাম, দেখব সেই কিনা।"

"ছাড়িয়ে এলুম যে তার গলিটা।"

"কতটা এসেছিস্?…তা হোক গে, ফিরে চল্।"

"ফিরলে, রিসকা জমা দিয়ে দিতে হবে। টাইম হয়ে গেল কিনা।"

"তা দিয়ে দিবি ; ভাড়া তোকে পুরোই দোব।"

রুবাই আর কিছু বলল না। রিক্‌শা ঘুরিয়ে নিয়ে অগ্রসর হোল। বোধহয় মনে মনে ভাবল, এ-ভূত ঘাড় থেকে তাড়াতাড়ি কোনখানে ঝেড়ে ফেলাই ভালো।

(দুই)

একটা আঁকাবাঁকা গলির মধ্যে দিয়ে খানিকটা ভেতরে গিয়ে অখিল ঘোষের রিক্‌শার আড্ডা। সামনেটা এরকম হোলেও ভেতরটা বেশ ফাঁদালো। প্রায় বিঘে-চারেক জায়গার একদিকে একটা টানা খোলার চালের বারান্দা, তার একপাশে একটা ছোট্ট কারখানা, কিছু মেরামতের কাজ হচ্ছে, খান-তিনেক রিক্‌শা দাঁড়িয়েও রয়েছে, বোধ হয় সদ্য জমা দেওয়া। একজন একরঙা লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি-পরা মাঝবয়সী ভদ্রলোক তদারক করে বেড়াচ্ছিলেন, রুবাই রিক্‌শাটা রেখে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল, তড়িৎকে বলল—"তু-ও আঁয়। কাছে গিয়ে বটুয়া থেকে দুটো টাকা বের করে হাতে দিয়ে বলল—"বাবুটি তুর সাথে কথা বলবেক।" তড়িৎকেও প্রশ্ন করল—"চেনা আঁছে তুর ?"

ঘাড় নেড়ে তড়িৎ উত্তর করল—না, নেই। দাঁড়িয়েই রইল। রুবাই অখিল ঘোষকে একটা সেলাম করে চলে গেল।

"কোন দরকার আছে আমার সঙ্গে ?"—অখিল ঘোষ প্রশ্ন করলেন।

তড়িতের উত্তরটা একটু অসংলগ্নই হোল ; বলল—"না, তেমন কিছু নয়।…রিক্‌শায় আসতে আসতে লোকটার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা হোল…তাই মনে হোল, একবার দেখে আসি…"

কয়েক সেকেণ্ড উভয় পক্ষে নীরবতার পর শেষ করল—"ইয়ে…আপনি রিক্‌শা ভাড়ায় খাটান ?"

"হ্যাঁ, খাটাই।"—কথাটা বলে একবার তড়িৎকে আগাগোড়া ভালো করে দেখে নিলেন, তারপর আবার প্রশ্ন করলেন—"কেন ?"

"তাহলে নিতুম।"

"আপনি নিজে চালাবেন ?"

"হ্যাঁ।"

"লাইসেন্স আছে ?"

তড়িৎ একটু থতমত খেয়ে গেল। রিক্‌শা চালাবার জন্যেও যে লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় এটা জানা ছিল না। তবে অজ্ঞতাটুকু প্রকাশ না করে বলল—"সে তো আপনিই যোগাড় করে দেবেন।"

"শেখা আছে চালানো? অব্যেস আছে?"

আবার থতমতই খেয়ে গেল তড়িৎ, উত্তরও একরকম যা জুগিয়ে গেল তাই দিয়ে দিল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে মুখের দিকে—"সাইকেল চালাতে জানা আছে…"

অখিল ঘোষ এবার হেসে ফেললেন, বললেন—"তবে আর কি? সে দু'চাকা, এ তো একটা চাকা বেশি, পড়বার ভয় নেই, কি বলেন?…না, অত সহজ নয়। অব্যেস দরকার, গায়ের জোরও দরকার, রীতিমতো…"

ওর শরীরের ওপর আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"তা নয় আছে আপনার খানিকটা, কিন্তু…"

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন—"রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে-টালিয়ে এসেছেন নাকি?"

তড়িৎ কথা ঘুরিয়ে একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বলল—"পালিয়ে আসতে যাব কেন?"

"তবে? হঠাৎ রিক্‌শা চালাবার ঝোঁক? পারবেন কেন? ভদ্রঘরের ছেলে মনে হচ্ছে…"

"আপনিও তো ভদ্রঘরের ছেলেই…"

—মনটা অগোছাল হয়ে রয়েছে বলেই কথাটা কেমন যেন রূঢ়ভাবে বেরিয়ে পড়ল; তখনি সামলে নিয়ে একটু অপ্রতিভভাবে হেসেই বলল—"ওর কাছে শুনলাম কিনা, আপনি নিজের চেষ্টায় এই করেই…মানে, গোড়ায় এই করেই কারবারটা দাঁড় করিয়েছেন, তাই…"

"আপনি করেন কি? বাড়ি কোথায়?"

প্রথমটা এড়িয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নটারই উত্তর দিল তড়িৎ—"বর্ধমান জেলায়…একটা গ্রামে।"

"কতদিন এসেছেন এখানে?"

"ছ'মাস।"

"কি করেন?"

এবার একটিমাত্র প্রশ্ন, তাও পুনরুক্ত, আর এড়ানো গেল না। আর অস্বস্তিকর

প্রশ্ন বাড়ানোর দিকে গেল-ও না তড়িৎ, বলে গেল—"পড়ি। বি-এ পাস করে বর্ধমান থেকে চলে এসেছি, এখানে নাম লিখিয়েছি এম-এ'তে। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়তো, টুইশন ধরেছিলাম একটা, ওদিকেও তাই করে পাস করি। তা ভদ্দরলোক হঠাৎ বদলি হয়ে যাওয়ায় মুশকিলে পড়ে গেছি ; তাই—"

"অন্য টিউশন ধরুন না। এ-কাজ আপনি পারবেন না।"

"পাচ্ছি না যে। এই তো তারই খোঁজে ঘুরে ঘুরে বাসায় ফিরছি।"

অখিল ঘোষ একটু চুপ করে ওপরদিকে চোখ তুলে চেয়ে রইলেন, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে বললেন—"আমার দরকার ছিল একজন টিউটার, করবেন ?"

তড়িৎ মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। অখিল ঘোষ বললেন—"সুবিধে করেই দোব। কত পেতেন সেখানে ?"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল তড়িৎ, যেন প্রশ্নে কোণঠাসা হয়ে আর উপায় দেখতে পাচ্ছে না। চেয়েই রইল একটু, তার পর মুখে কয়েকটা বিকারের রেখা ফুটে উঠল, তার সঙ্গে একটা কঠিনতাও ; বলল—"থাক্, যাই।…না, টুইশন আমি আর করব না।"

অখিল ঘোষ বললেন—"থামুন। ছ'ঘণ্টা করে রিক্‌শা চালিয়ে পড়বেন কখন, কলেজ যাবেন কখন ?"

আবার একটু হতভম্ব হয়ে পড়ল তড়িৎ, প্রশ্ন করল—"ছ'ঘণ্টার কম পাওয়া যায় না ?"

"তার কমে রোজগার হবে কোথা থেকে ? সকাল ছ'টা থেকে বারোটা, বারোটা থেকে ছ'টা, আবার ছ'টা থেকে রাত বারোটা বারো ঘণ্টা করেও কেউ কেউ নেয়, যার গায়ে শক্তি আছে, যে বেশি রোজগার করতে চায়।"

"আমার তো সে-রকম রোজগারের দরকার নেই, পড়ার খরচটা চালিয়ে নেওয়া, কোনখানে একটু মাথা গুঁজে থেকে। যে রকম আন্দাজ করছি, যদি আপনার ভাড়া দিয়ে টাকা-দেড়েক বাঁচে তাহলেই চলে যাবে আমার। এর জন্যে ধরুন ঘণ্টা দু'আড়াই—মানে আমি যা আন্দাজ করছি আর কি ; তার জন্যে কত নেবেন আপনি ?"

"ঘণ্টা দু'একের জন্যে না-হয় আনা-আষ্টেকই দিলেন, কিন্তু ঐ দুটো টাকা কামাতে অন্তত ঘণ্টা-চারেক সময় তো লাগবেই, তাও রোজ যে পাবেনই এমন বলা যায় না।"

মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন—"তাই বলছি, ও মতলব আপনি ছাড়ুন। যা অব্যেস তাই করুন, টিউশন, আমার এখানে না হয়, অন্য কোথাও, আমিও চেষ্টা

দেখতে পারি।...আমার কথা শুনেছেন, আমার শুধু রোজগার করাই ছিল উদ্দেশ্য ; আপনার যে পড়াও রয়েছে সঙ্গে, তাও আবার বলছেন এম্‌-এ।"

তড়িৎ শুনে যাচ্ছিল, কিন্তু মন এদিকে ছিল না, আগের কথার জের ধরেই বলল —"চার ঘণ্টার জন্যেই দিন তাহলে...

একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বলল—"ছ'টা থেকে নয় কিন্তু, ধরুন সাতটার পর, বেশ একটু গা-ঢাকা হয়ে গেলে..."

অখিল ঘোষও হাসলেন, বললেন—"আমি কিন্তু দিনের বেলাই চালাতুম—সারা দিন, গা-ঢাকা দিয়ে নয়।"

তড়িৎ সেইরকম লজ্জিতভাবেই হেসে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল—"দিনের বেলা যে আমার কলেজ—"

উভয় পক্ষেই একটু চুপচাপ গেল। তারপর অখিল ঘোষ একটু চিন্তা করতে করতে টেনে-টেনে বললেন—"ওরকম সময় রিক্‌শা দেওয়ায় একটু অসুবিধে আছে, বে-টাইম তো, আর চার ঘণ্টার জন্যে দেওয়া আরও অসুবিধে, তিনটে শিফ্‌ট একরকম ভাগ করা আছে তো...কিন্তু তা হোক, দোব আপনাকে!"

দৃষ্টিতে খানিকটা প্রশংসা নিয়ে তড়িতের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তড়িতের দৃষ্টি লজ্জায় একটু আনত হয়ে পড়ল, তার পর কিন্তু মুখটা বেশ সোজা করেই তুলে ধরল সে ; বলল—"আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ, আজ যেন বড্ড বেশি নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম, মনে হচ্ছিল রাঁচি বোধহয় ছাড়তেই হোল তাহলে।"

অখিল ঘোষ বললেন—"এতে আর দয়ার কি আছে? পড়তে চাইছেন, এটুকু তো সাধ্যি থাকলে করাই উচিত। বরং আরও যদি কিছু করতে পারি যাতে সুবিধা হয় আপনার..."

"লোভ বাড়াচ্ছেন?"

"সে ভয় নেই। ব্যবসাদার মানুষ তো, লোভের বাড়াবাড়ি দেখি, পেছিয়ে যাব।"

—কথাটা বলে একটু হাসলেন। তড়িৎও হেসেই বলল—"তাহলে সাহস করে বলতে পারি, যখন বলছেন বেশি ক্ষতি হবে দেখলে রাজী হবেন না। বলছিলাম, চার ঘণ্টার জন্যেই নোব, কিন্তু যদি কোনদিন তার আগেই ঐ পয়সাটা পেয়ে যাই—ঐ দুটো টাকা—তো আরো আগেই জমা দিয়ে যাব রিক্‌শা।...পড়বার খানিকটা সময় পাওয়া যায় আর কি।"

মুখ আলগা হয়ে গেছে, কিছু বলবে নিশ্চয়, মল্লী একটু আড়ে চেয়ে বলল,—"বেশ তো, গান না, অনুমতি আবার কেন ?"

"একটা হিন্দী ক্লাসিক্যাল গান জানি আমি—

আংনামে কুঁই খোদা দেরে বলমা,
ময় ভরু পানি, তু দেখো তমাশা—আ-আ-আ..."

মল্লী সেইভাবে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করল—"অর্থাৎ ?"

হাত খেলিয়ে সুর করেই আরম্ভ করেছিল অনুপ, থেমে নিয়ে বলল—"অর্থাৎ, হে প্রিয়, উঠানের মাঝখানে একটি কূপ খনন করিয়ে দাও, আমি জল তুলি, তুমি তামাশা দেখো—অর্থাৎ..."

"গান্, গলা ফাটিয়ে গান্‌গে, কেয়ার করি না।...চল্ সুপা, আয় ভাই অতসী—"

দুজনের হাত দুটো ধরে জলে টেনে নিয়ে গেল।

অবশ্য, গান হোল না, সেদিক দিয়ে অনুপের মাত্রাজ্ঞানটা বেশ প্রখরই, তবে মাছ-ধরা নিয়ে বেশ খানিকটা মাতামাতি হোল। চাঁদা আর ছোট ছোট ল্যাঠার মতো একজাতীয় মাছ, খুব ক্ষিপ্র, জলের ভেতরটা পাথুরে বলে ধরা আরও শক্ত, সেইজন্য প্রতি ক্ষেপে দু'পাঁচটা যা উঠছে তাই নিয়ে হৈ-হৈ পড়ে যাচ্ছে। একবার পড়ল একেবারে আটটা। অনুপ ধারে দাঁড়িয়ে রুমালে সংগ্রহ করছিল, চেঁচিয়ে উঠল—"নলিনাক্ষবাবু, হয়েছে! I have a brain wave! (একটা মতলব এসেছে আমার মাথায়!)"

সবাই থমকে চাইল, মেয়েরাও ছাঁকা বন্ধ করে। অনুপ বলল—"আপনি ছাড়ুন মহুয়া। আবার মাছ চালান দিন, নদীটা ইজারা নিয়ে।"

মনটা তরল রয়েছে, আবার সবাই হো-হো করে হেসে উঠল; নলিনাক্ষও। সে বরং প্রশ্নটাকে এগিয়েই নিয়ে গেল আর একটু, মেয়েদের তাগাদা দিয়ে দিয়ে তুলে নিজে নেমে গেল,কোঁচার খানিকটা খুলে তড়িতের দিকে চেয়ে ডাক দিল—"নেমে আসুন,পার্টনার।"

হাসির মধ্যে তড়িৎ এগিয়ে পা দিয়েছে জলে, মোটরের হর্ন শোনা গেল; একবার, তারপর ঘন ঘন। সবাই উঠে পড়ল। হর্নের উত্তরে একটা আওয়াজও দিল কয়েকজন একসঙ্গে; এগিয়ে চলল। নলিনাক্ষ সামনে ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে বলল—"অনুপবাবু, মাছগুলো ফেলে দিলেন না তো?"

অনুপ বলল—"দেখুন তো! পারি কখনও তা? কলকাতায় sample (নমুনা) হয়ে কি যাবে তাহলে?"

ঐ হাওয়াই চলেছে, একটা কিছু কথা পড়লেই ছলকে উঠছে হাসি, তারই মধ্যে তড়িৎ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—"দাঁড়ান মাছের কথায় মনে পড়ে গেল, এ মাছ অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া চলে না।"

"বা—রে, কি রকম পার্টনার!"—অনুপের ছোট্ট মন্তব্যটাতে আবার হাসি উঠতে যাচ্ছিল, তড়িৎ বলল—"না, আমি বলছি—মানে, আমার প্রস্তাব, আজকের ট্রিপ, চড়ুইভাতি—যাই বলুন, এইখানে আমরা সারি আসুন। এই খাদের ধারে।"

সবাই একবার ঘুরে চাইল খাদটার দিকে। শালবনটা এদিকে ছেড়ে গেছে, তবে খাদের ঠিক ওপরটায় একসঙ্গে আট-ন'টা শাল-মহুয়ার গাছ খানিকটা নিবিড় ছায়া পেতে রেখেছে তলায়, ওপারের উঁচু জমিটায় পাশাপাশি দুটি পলাশগাছ ফুলে-ফুলে লাল হয়ে রয়েছে।

মল্লী-ই আগে কথা কইল; বলল—"মন্দ বলেননি।…কি বলেন অনুপবাবু? বেশ জলও রয়েছে।"

সুতপা বলল—"আমি রাজী, নদীটাতে আশ মেটেনি আমার; নাইব।"

একটা যে সমতান চলছে যাত্রা থেকে শুরু করে, তার মধ্যে একটি তন্ত্রী বরাবরই যেন একটু স্তিমিত। মাঝে মাঝে বেসুরাও। প্রিয়রতনের কথা হচ্ছে।

প্রিয়রতন চেষ্টা করে হৈ-হৈ ক'রে নেমে পড়তো; কিন্তু কৃত্রিম চেষ্টার যা দোষ, কী আছে একটা ভেতরে, সবসময় পেরে ওঠে না। মাঝে মাঝে যেন কী একটা বাঁচাবার জন্যে পেছিয়ে দাঁড়ায়।

সুতপার কথার গায়ে বলল—"আমি কিন্তু মোটেই রাজী নই।…কোথায় রামগড়ের পাহাড়ের ভেতর সেই চমৎকার জায়গা…"

"সে জায়গা তো রয়েছেই।"—তড়িৎ বলল।

"থাকবে না তো যাবে কোথায়? কিন্তু তার সামনে এ জায়গা, কী যে বলেন!"—একটু বিরক্তিই প্রকাশ হোল বলার ভঙ্গিতে।

তড়িৎ বলল—"সামান্য বলে অবহেলা করাও ঠিক নয়, already কতখানি পেয়ে গেলাম আমরা এটুকু জায়গা থেকে…"

মুখটা একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল প্রিয়রতনের; বলল—"সামান্য ব'লে অবহেলা যে কোনওখানে আছে আমাদের এ কথা অন্তত আপনার মুখে শোভা পায় না তড়িৎবাবু।"

(সতেরো)

একটা বৈদ্যুতিক শক লেগে মুহূর্তে সবাই যেন অসাড় হয়ে গেল। চলতে পা উঠছে না, মুখে কারুর একটা রা সরছে না।

সামলাল তড়িৎ-ই, যেন প্রিয়রতনের কথার অর্থটা ধরতে পারেনি এইভাবে বিস্ময়ের ভান করে বলল—"কি হোল! চলুন। না হয়, থাকতে চান তো তার ব্যবস্থাই করা যাক।"

মল্লী একটু চোখ ফিরিয়ে চাইল, চোখাচোখি হয়ে গেল।

নলিনাক্ষ থমথমে মুখটা তুলে বলল—"আমি কিন্তু থেকে যেতেই চাই। মল্লীদেবীরও তো তাই মত।"

তড়িৎ খুব সহজ হয়ে একটু হেসে বলল—"আমার কিন্তু মত বদলে গেছে; ভেবে দেখলাম প্রিয়রতনবাবুর কথাই ঠিক।···তাহলে, দুজন ওদিকে, দুজন এদিকে···"

অনুপের দিকে মুখটা হঠাৎ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"হয়েছে! অনুপবাবু তাহলে কাস্টিং ভোট দিয়ে, এখানে কি ওখানে ডিসাইড করে দিন।

মল্লী ওকে সম্পূর্ণভাবে বুঝেছে; কিন্তু অপমানটা গায়ে মেখে নেওয়ার জন্য একেবারে রেহাই দিল না; দুদিকেই কাটে এইভাবে একটু হেসে উঠেই বলল—"আর কাস্টিং ভোটে দরকার নেই, এক ধমকে দিব্যি পোষ মেনে যায়, আমিও তার দলেই ভিড়ে গেলাম—অর্থাৎ তার এই নতুন দলে। তাহলে তো হয়ে গেল, চলুন ওঠা যাক মোটরে।"

প্রিয়রতন মুখ তুলতে পারছিল না। একটা যেন সুযোগ পেয়ে, একটু রসিকতার চেষ্টা করে হেসে বলল—"আমি কিন্তু আর তড়িৎবাবুর নতুন দলে নেই—একটা মত দিয়েছিলাম, তাও বদলে গেছে···থেকেই যেতে চাই।"

অনুপ হো-হো করে হেসে উঠল; বলল—"যাঃ, একি হোল?—একেবারে যে পিক্উইকিয়্যান সেন্সের (Pickwickian sense) ব্যাপার। এতবড় ব্যাপারটা ভোজবাজির মতন মিলিয়ে গেল!"

এতক্ষণে এই হাসিটাই প্রাণখোলা হাসি, গুমটটা কেটে গেল। তড়িৎ-ই আগে পা বাড়াল; বলল—"তাহলে খবরটা দিয়ে আসি, নিয়ে আসুক সব জিনিসপত্র এখানেই।"

ওপরে ওপরে বেশ ভালোভাবেই কেটে গেল। অন্যদিনের চেয়ে হয়তো বেশি ভালো

করেই, কেননা সবারই একটা চেষ্টা রইল যাতে গ্লানিটা কোনও দিক দিয়ে আবার ফুটে না বেরোয়। তড়িৎ রইল আরও বেশি করে সতর্ক, প্রিয়রতন মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, নজর পড়তেই একটা কিছু কথা তুলে তার মনটা ঘুরিয়ে আনছিল।

একসময় বলে উঠল—"হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বলে নিই, ভুলে যাব। পুকুরটার একটা নামকরণ দরকার, আমি বলি পুণ্যিপুকুর থাক্।"

তড়িৎ নিজের মনের দ্বন্দ্বটা অদ্ভুতভাবে চাপা দিয়েছে, শুধু এক এক বার মল্লীর সঙ্গে যখন চোখাচোখি হয়ে পড়ছে, একটু থতমত খেয়ে যাচ্ছে। মল্লীর দৃষ্টি যেন আরও অনুসন্ধানী।

সেদিন সন্ধ্যার সময় আর একটু ব্যাপার হোল।

বিকালে রোদ পড়ে এলে যখন ফেরবার কথা উঠল, মল্লী বলল—"আমি বলি কি, একটু রাত করেই না-হয় ফিরলাম আজ, বেশ জ্যোৎস্না-রাত্তিরটি—পাহাড়ে অঞ্চলগুলোর মতন জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই তো।"

জায়গাটাও শহর থেকে কাছে, মাইল পাঁচেকের মধ্যেই পড়ে।

অনুপ-সুতপা থাকতে পারল না। সুতপার বাবা রাত্রের গাড়িতে কলকাতায় যাবেন, স্টেশন-কারটা ফিরে যাবে, ওদেরও থাকা দরকার। প্রিয়রতনও ফিরে গেল, মানিয়ে নেওয়ার জন্য ওর বোন অতসীকে থেকে যেতে বলল, সেও কিন্তু রইল না।

যাওয়ার সময় যতই এগিয়ে আসছিল, তড়িৎ অনুভব করল, প্রিয়রতন যেন ওকে একটু একলা পেতে চায়। প্রথমটা ভাবল এড়িয়েই যাবে, তারপর একটু সুবিধাই করে দিল।

সূর্যাস্তের মুখে মল্লী একটা পূরবী ধরেছিল, এস্রাজের সঙ্গে। শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। শালবনের মধ্যে দিয়ে আসছিল ওরা, প্রিয়রতন একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিল, হয়তো ইচ্ছা করেই, তড়িৎ ঘুড়ে দাঁড়িয়ে বলল—"কই প্রিয়রতনবাবু, আসুন, আপনি তো যাচ্ছেন প্রথম ট্রিপেই।"

বনে পাতলা অন্ধকার, গাছের আড়ালও পড়ে যাচ্ছে, কাছে আসতেই প্রিয়রতন ওর হাতটা ধরে ফেলল; বলল—"তড়িৎবাবু, মাফ করুন, বড় অন্যায় হয়ে গেল।"

তড়িৎ হেসে বলল—"এই দেখুন ছেলেমানুষী! কী হয়েছে এমন?···আর তা যদি বললেন তো আমি বরং আপনার কাছে কৃতজ্ঞই।"

"কৃতজ্ঞ! কেন?"—একটু সন্ত্রস্ত হয়েই প্রশ্ন করল প্রিয়রতন। তড়িৎ সামলে নিল; বলল—"দিলেন তো মত শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবেই।"

নিজের কানেই বেশ মনোমতো ঠেকল না বলে কথাটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল—"কি রকম হোল বলুন।"

"চমৎকার! সত্যিই আমার ভুল হয়ে যাচ্ছিল তড়িৎবাবু।"

ওরা চলে যেতে নলিনাক্ষ একটু যেন অনুশোচনার সঙ্গেই বলল—"চলে গেলে হোত আমাদেরও, বড় যেন ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হচ্ছে না?"

তড়িৎ বলল—"হচ্ছে; কিন্তু এর ওষুধও হচ্ছে ফাঁকা-ই; চলুন আমরা খাদের ওধারটা বেড়িয়ে আসি।...মল্লীদেবী, এইজন্যেই তো থেকে গেলেন, না কি?"

চাকরটাকে ফিরে যেতে দেয়নি, একটা বন্দুকও বরাবর সঙ্গে থাকে, সেটা নিয়ে ও খানিকটা পেছনে রইল, ওরা এগিয়ে চলল।

'পুণ্যিপুকুর'-এর কাছে ওরা ঝর্ণাটা পেরুল; ওখানটা পরিষ্কার, দিনের বেলা আরও করা হয়েছে। ওপারে গিয়ে একেবারে মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে পড়ল ওরা। আকাশে চাঁদটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, উঁচুনীচু জমি, মনে হয় সত্যই যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে উছলে পড়ছে জ্যোৎস্নাটা। কখনও নেমে, কখনও উঠে ওরা সেই ঢেউই ভেঙে ভেঙে এগিয়ে চলেছে। বনের মধ্যের চেয়ে হাওয়াটা এখানে আরও জোর, শরীরে পর্যন্ত দোল লাগিয়ে দিচ্ছে—ঢেউয়ের মতোই।

কথা হয়ে এসেছে অল্প, দিনের সে প্রগল্‌ভতা নেই। একবার মল্লী বলল—"একেবারে এতখানি বুকের মধ্যে পাওয়া, একরকম ফাঁকা না হলে হয় না।"

নলিনাক্ষর এদিকটা কম; তবু অভিভূত হয়ে পড়েছে, একবার ওপরের আকাশ, দূরের পাহাড়, সামনের প্রাঙ্গণ থেকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এসে বলল—"সত্যি।"

একটু থেমে বলল—"এর জন্যে আমরা তড়িৎবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ।"

ওরা এগিয়ে গিয়ে একটা টিলার ওপর বসল। একটু পরে মল্লী বলল—"কৃতজ্ঞ বৈকি; উনি তখন ঠিক বললেন—সামান্য ভেবে আমরা যে-সবকে বাদ দিই, পরে দেখি..."

দুজনের প্রশংসায় সঙ্কুচিত হয়ে তড়িৎ কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মল্লীর মুখে কথাটা হঠাৎ আটকে গেল, যেন জিভে জড়িয়ে থেমে গেল।

কিন্তু এই অবাধ মুক্তির মধ্যে যেন কিছুই বদ্ধ, গোপন থাকতে চাইছে না। একটু যেতে না যেতেই মল্লী হঠাৎ ঘুরে চাইল তড়িতের দিকে, গভীর অনুনয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—"একটা কথা...সকাল থেকেই বলব-বলব ভাবছি—সুযোগ পাচ্ছি না—ইয়ে—আপনি প্রিয়ব্রতনবাবুকে মাফ করুন, তড়িৎবাবু। উনি ঠিক ও-ধরনের..."

কথা শেষ না হতেই উত্তর দিতে যাচ্ছিল তড়িৎ, হঠাৎ বাঁ হাতটা তুলে বলল—"থামুন তো, থামুন তো একটু!"

একটা গানের কলি, শ'দুয়েক গজ দূরেই একটা উঁচু জমিতে খান চার-পাঁচ ঘর নিয়ে একটা গ্রাম, সেইখান থেকে উঠেছে গানটা। তড়িৎ যেন অতিমাত্র চঞ্চল হয়ে উঠল; বলল—"যাবেন শুনতে?…চলুন না।"

একটু বিস্মিত হয়ে পড়েছে এরা দুজনে। কি এমন গান, এ তো আখছারই শোনা যাচ্ছে। মল্লী তবু মানিয়েই বলল—"ভালো লাগছে আপনার?…তা গিয়ে শোনবার দরকার কি? কি ভাববে—রাত-বিরেতে হঠাৎ…তার চেয়ে এখানে বসেই শুনি না…"

নলিনাক্ষ বলল—"ফাঁকায় বসে মিষ্টিও লাগবে বেশি।"

তড়িই মল্লীর আপত্তি ধরেই বলল—"না, না, কিছু মনে করবে না—মনে করে না ওরা, বরং খুশীই হবে। না হয় বসুন আপনারা, আমি আসছি একটু পরে।

উঠে পড়ল।

মল্লী যেন একটু ভীতই হয়ে পড়েছে এই হঠাৎ ভাবান্তরে; বলল—"সে কি হয়? একলা যাবেন কেন? যেতে হয় তিনজনেই যাব।…শুনছেন তড়িৎবাবু?"

তড়িৎ ততক্ষণে টিলা থেকে নেমে পড়েছে, চলতে-চলতেই ঘাড়টা ঘুরিয়ে বলল—"বসুন-ই আপনারা। ভেবে দেখলাম সবাই গিয়ে পড়লে হয়তো ঘাব্‌ড়েই যাবে—বন্দুকও রয়েছে—আমি আসছি এখুনি…"

ওরা দুজনে একবার মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে নিজের নিজের চিন্তা নিয়ে চুপ করে বসে রইল। একসময় ভেতরের চিন্তাটাই যেন অস্ফুটভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল মল্লীর; বলল—"প্রিয়রতনবাবুর উচিত হয়নি কথাটা বলা।"

মুখোমুখি হয়ে তিনটে মাটির ঘর, মাঝখানে একটা খোলা উঠান, একপাশে একটা আতাগাছ। জন ছয় মেয়ে পরস্পরের গলা জড়িয়ে নাচের সঙ্গে সঙ্গে গান করছিল, এগিয়ে পেছিয়ে যেমন ওরা নাচে, দুজন বেটা ছেলে, একজন মাদল আর একজন বাঁশি ধরেছে, ওকে একটা ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে সবাই থেমে গিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কয়েক সেকেণ্ড, তারপরেই যে মাদল বাজাচ্ছিল—বেশ প্রৌঢ়-গোছের—ভ্রূ-দুটো চোখের ওপর চেপে এগিয়ে এসে বিস্মিতভাবে বলল—"আরে, তু-তো মিত্তিরবাবু আছিস, ইখানে কি করে এলি!"

তড়িৎ বলল—"আমরা বেড়াতে এসেছিলাম, শালবনে।"

"ইখানে—আমার বাড়ী ?—গীত শুনতে ?—বোস্, শোন্…"

ছেলেটাকে কি বলতে সে ঘরের মধ্যে থেকে একটা দড়ির খাটিয়া এনে বসিয়ে দিল।

ঠিক গান শোনবার জন্যে আসেনি তড়িৎ। যে গানটা হচ্ছিল সেটা কয়েকবার রুবাইয়ের মুখে শুনেছে—সেই আদিবাসী যুবা, প্রথমদিন যার রিক্‌শায় চড়ে অখিলের কারখানায় আসে। সেই কথাই বলল—"রুবাইয়ের গান শুনলাম, তাই মনে করলাম বুঝি তারই বাড়ি। যাই হোক, তোমার সঙ্গেও তো দেখা হয়ে গেল…"

"হঁ, হোল। আর ই তো রুবাই বেটারই বাড়ি হবে—আপোন বাড়ির চেয়ে বড়ো—শ্বশুরবাড়ি—আমার দামাদটি হইছে উটা…। তা বোস্, দাঁড়িয়ে কেনে ? বোস্, বোস্। কি খাবি ?—ফল আনি, হাঁড়িয়া তো খাবিনি…"

হেসে উঠল ; মেয়েগুলাও মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

লোকটাকে চেনে তড়িৎ, রুবাইয়ের মতো এও অখিলের রিক্‌শা চালায় একটা, নাম মুকুরু, খাটিয়াটাতে বসতে-বসতে ওদের ঠাট্টার সঙ্গে তাল রেখে বলল—"তোমার বাড়িতে এসেছি, হাঁড়িয়া দাও, তাই খাব।"

মেয়েগুলো হেসে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। মুকুরু বলল—"দিবোঁ না কেনে, দিতুম ; গান্ধী-মহারাজ উরে ভাগাঁয়ে দিল যে, কলসি ঢুনঢুন এখন, কি খাবি ?"

রসিকতাটুকু করে বেশ জোরেই হেসে উঠল, মেয়েগুলাও সেইভাবে থেকেই একটু দুলে উঠল। তড়িৎ প্রশ্ন করল—"সত্যিই ছেড়ে দিয়েছ তোমরা ?"

"ঝুঁট বলব কেনে রে ? শপথ দিয়াঁ ছাড়লুম। বিলকুল রোজগার হাঁড়িয়া টেনে লিতো। দুটো ঘর করলুম, খড় নামায়ে খাপড়া চড়ালুম। উ দেখ্ না, ঝুঁট বলছি ? রুবাইয়ের পারা দামাদ কঁরছি, ঝুঁট বলছি ?"

"আর রুবাই,—সেও খায় না হাঁড়িয়া ?"

"উ তো হীরাটি আছে, হীরাটি আছে, উ কি হাঁড়িয়া খাবে ? কখনও খায়নি। জমিন কিনেছে, ঘর করেছে।…আরে, উ তো হাজিরও হয়ে গেল নাম নিতে নিতে—খাঁটি হীরা—বহুত দিন বাঁচবে বেটা আমার।"

ওর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে, তড়িৎ ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখল, রুবাই তার পেছনে উঠানটায় কখন্ এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখে ওর মনের প্রথম প্রতিক্রিয়া হোল একটা আনন্দ-মিশ্রিত বিস্ময়। অনেকদিনই দেখেনি রুবাইকে, কিম্বা যদি এক-আধবার দেখেও থাকে তো রিক্‌শা চালাবার অবস্থায়, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে নয়।…রুবাই আরও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে

উঠেছে যেন, তাই থেকে মনে হচ্ছে আরও যেন দীর্ঘ, আরও ঋজু। কোমরে একটা খাটো কাপড় ভিন্ন সমস্ত দেহটা নগ্ন, একটা ফতুয়া আছে, তবে গরমের জন্য সেটা কাঁধের ওপর ফেলা, পেশীপুষ্ট দেহের ওপর জ্যোৎস্না পড়ে যেন পিছলে পিছলে যাচ্ছে। কালো সুতায় বাঁধা, বুকের মাঝখানে একটা চৌকো রূপার কবচ। একটু বিমূঢ় হয়েই পড়েছিল ব'লে কথা বেরোয়নি, রুবাই-ই একটু বিস্মিত ভাবে হেসে বলল—"মিতির-বাবু না ?"

"তুমি··· ?"

অন্যমনস্কভাবে প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিল তড়িৎ, তারপর মনে পড়ে গেল ওর নূতন সম্পর্কের কথা, ঘুরিয়ে নিয়ে হেসে বলল—"তোমার শ্বশুরবাড়ি দেখতে এলাম রুবাই,—লুকিয়ে বিয়ে করে নিচ্ছিলে, এবার আর ফাঁকি দেওয়া চলবে না।"

হো-হো করে হেসে উঠল রুবাই, সামনে এগিয়ে এসেছে, বলল—"ফাঁকি কেনে দি'ব রে ? তু তো বরিয়াতি নিয়ে আসবি, তু আসবি, ঘোষবাবু আসবে, বিমল-ভাই আসবে। ফাঁকি দিব কেনে ?···লুকিয়ে সাদি তো তুই করছি'স।"

"আমি !"—বিস্মিতই হয়ে উঠল তড়িৎ।

ঝকঝকে দাঁতে হাসি খেলে গেল রুবাইয়ের, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল—"হঁ রে হঁ,—চালাকি করছিস ? আমরা সব জানে, সোবাই জানে আমরা। লুকাবি কি করে ?"

একটু ধাঁধায় পড়ে যেতে হোল তড়িৎকে ; তার জীবনের এদিককার গোপন রহস্যটা এত জানাজানি হয়ে গেছে নাকি ? একটু দ্বিধা, তারপর সেটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ব্যাপারটা হালকা করে নিয়ে বলল—"তা বেশ তো, জান তো বল না। আমি তো বলে দিচ্ছি তোমার দুলহিন ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছে, এতক্ষণ নাচ দেখলাম তার, লুকুবে কি করে ?"

আন্দাজেই বলেছে। মেয়েগুলো ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আর মাঝে মাঝে আন্দাজে কিছু কিছু মানে ধরে চাপা হাসিতে দুলে দুলে উঠছিল, তড়িতের শেষ কথায় একটি মেয়ে মাঝখান থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে ঘরের মধ্যে ছুটে পালিয়ে গেল।

রুবাই হঠাৎ চোখ দুটো বড় করে দারুণ বিস্ময়ের ভান করে বলে উঠল—"পালায় কেন রে ! বাঘ আছি', না ভাল্ আছি', না হুড়ার আছি' !"

একটা যে হাসির দমক উঠল তাতে নাচের আসরটা গেল ভেঙে, মেয়েগুলো এ-ওকে ঠেলতে ঠেলতে হুড়োহুড়ি করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

নও-জওয়ানদের হাসিঠাট্টার মধ্যে থাকা ঠিক হবে না ভেবেই মুকুন্দ সরে পড়েছিল,

একটা কানা-উঁচা কাঁসিতে কিছু ফল আর গুড়-মুড়ির মোয়া নিয়ে উপস্থিত হোল। বলল—"খাঁ, গরীবের বাড়িতে আর কি পাবি ?"

"বাঃ, আর রুবাই ?"—হাত দুটো সরিয়ে নিল তড়িৎ।

"উ ভি খাবে, একটু বাদে খাবে।"

"না, একসঙ্গে রিক্‌শা টানি আমরা, একসঙ্গে খাব।"

রুবাই হেসে বলল—"আমি খাব, ই তো আমার খাবার জাঁয়গাটি বটে রে।"

"ও, বুঝেছি, জামাইয়ের জন্যে বুঝি ভালো ভালো খাবার তোয়ের হবে, কি গো মুকুরু ?"

দুজনের দিকে চেয়ে এমন ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলল যে, দুজনেই হো-হো করে হেসে উঠল, ঘরের মধ্যেও একটা লহর উঠল চাপা হাসির। রুবাই তাড়াতাড়ি হাত দুটো জড়ো করে এগিয়ে ধরল তড়িতের সামনে, বলল—"দেঁ ; দেঁ তুই, খাব বটে।"

(আঠারো)

আরও খানিকটা দেরি হোল তড়িতের। মুকুরু ওকে বাড়ির চারপাশে খানিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে এল, ওর জমিজমা দেখিয়ে। সন্তানের মধ্যে ঐ একটি মেয়ে, রুবাই কিন্তু ঘরজামাই হয়ে থাকতে চায় না। তা না চাক, দুঃখ নেই মুকুরুর বরং আরও গর্ব তার জন্যে।···হীরের টুকরা নতুন ছেলে তার রুবাই, সে নাকি শ্বশুরের বাড়ি মাথা নীচু করে থাকবার পাত্র ?···ঐ যে গানটা গাইছিল মেয়েরা, ওর মানে বুঝতে পেরেছে কি মিতির-বাবু ? ওর মানে হচ্ছে—তুমি হও শালগাছের মতন শক্ত সবল, আমি লতার মতন তোমায় জড়িয়ে জড়িয়ে উঠব। ঝড় ?—ঝড়ে তো তোমায় আরও শক্তই করবে, দীর্ঘ করবে। ভয় ?—ভয় কিসের আমার ? তোমায় জড়িয়ে থেকে আমি তো আরও ঝড়ের দোলাই খাব, ঝড়ের গানই তো গাইব আমি।

সব দেখাতে দেখাতে বলে চলেছে মকুরু। শালগাছ কি বাড়িতে যত্ন করে পোতা মহুয়া ? একটু জল দেবে তবে বাড়বে, বেড়া দিয়ে ঘেরে দেবে, তবে গরু-ছাগলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে ?···নিজের ভিটে করে দেবে রুবাইয়ের ; কোন্‌ জায়গাটা যৌতুক দিয়ে তা দেখালো। বাড়ির একটু তফাতে, দুটো শালগাছও রয়েছে, পাশাপাশি দুটা ঘরের আদলও উঠেছে প্রায় কোমর পর্যন্ত, মাটির দেয়াল। চারিদিক খোলা উঁচু জমি, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাই দেখতে পেছনে রুবাইয়ের

ওপর দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল। একটু অপ্রতিভ হয়ে হাসল রুবাই, এই খোলা টিলায় যেন হঠাৎ আরও 'বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, তড়িতের মনে হোল আর-সবাইকে বাদ দিয়ে ঐ দীর্ঘচ্ছন্দ শালগাছ দুটোই যেন ওর উপযুক্ত সঙ্গী। মনটা এত ভরে উঠেছে যে, একটা ছোট্ট ঠাট্টা করবার লোভ সামলাতে পারল না; ওর কান লক্ষ্য করে (তবে মুকুরু শুনলেও ক্ষতি নেই) বলল—"এবার দুটো লতার সন্ধান দেখতে হবে তো।"

রুবাই একটু হেসে ওকে আড়াল করেই ঘুষি তুলল।

কী কী যৌতুক দেবে 'লতুন ছেলেকে' দেখালো মুকুরু—থালা-ঘটি, কাপড়-জামা, রূপার গয়না, মেয়ের জন্য ছেলের জন্য। আপাতত এই, এরপর তো সবই ওর, হীরার টুকরা 'লতুন ছেলে' মকরুর।

ওরা ওকে এগিয়ে দিতে আসছিল, বারণ করল তড়িৎ, দুটো দিক কেমন যেন মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে না।

ওরা বাড়ির উঠান পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে রইল।

দূর থেকেই দেখল, মল্লী আর নলিনাক্ষ সেইখানেই রয়েছে। মল্লী যেন শুয়ে ছিল, ওর মনে হোল যেন নলিনাক্ষের গা ঘেঁষেই একটু, ও উঠে বসল। অন্তত ওকে এগুতে দেখে একটু ভালো করে যে গুছিয়ে বসল এটা ঠিক। ওরা কিছু বলবার আগে তড়িৎ-ই বলল—"বড্ড দেরি করে ফেললাম, মাফ করবেন।"

একটু জবাবদিহিও দিল—"গিয়ে দেখি লোকটা জানাশোনা।"

মল্লী ছোট্ট করে বললে—"ও, তাই নাকি? আশ্চর্য তো!"

নলিনাক্ষ কোন প্রশ্ন করল না। ও যেমন সব বিষয়ে কৌতূহলী, একটু অস্বাভাবিকই ঠেকল তড়িতের; মনে হোল এ কৌতূহল-দমনে মল্লীর যেন হাত আছে।

নীরবেই ওরা এগিয়ে চলল। ক্রমে চারিদিকের দৃশ্যে আবার একটু একটু যখন মুখর হয়ে উঠেছে, তড়িৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলে উঠল—হ্যাঁ, তখন আপনি আমায় কি :যেন বলতে যাচ্ছিলেন মল্লীদেবী—সেই হঠাৎ যখন ওদের গানটা উঠল—বোধহয় বলতে যাচ্ছিলেন—প্রিয়রতনবাবুকে মাফ করবার কথা। আমি আপনাকে সর্বান্তঃকরণে বলছি, মাফ করা না-করার মতন কিছুই হয়নি, আমি বরং উলটে ওঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।"

ননিলাক্ষ একটু উগ্রভাবেই প্রশ্ন করল—"কৃতজ্ঞ!…কৃতজ্ঞ মানে?"

প্রিয়রতনের এই প্রশ্নটা তড়িৎ-ই তখন সামলাবার চেষ্টা করেছিল, এবার করল

মল্লী ; বলল—"উনি বোধহয় বলতে চান, রাত্তিরটি চমৎকার কাটল তো। প্রিয়রতনবাবু জিদ ধরে বসে থাকলে কি হোত, কোথায় কাটাতে হোত রাতকে জানে ?"

এই কৃতজ্ঞতার কথাই তড়িৎ ভাবছিল সে-রাত্রে।

খুব দেরি হয়নি, যদিও আজকাল দেরি হওয়াটা বাসায় সবার গা সওয়া হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে বাইরের চাতলটায় অনেকক্ষণ ধরে গল্প করল সবাই। এ আসরে অখিল অবশ্য থাকেন না, তাঁর হিসাবপত্র লেখার সময় এটা। তবে আর সবাইকে তড়িৎ যেন টেনে টেনেই ধরে রাখল—যাবে'খন শুতে, বিছানা তো কারুর পালিয়ে যাচ্ছে না।…বেশ রাত হয়ে গেল, চারিদিক নিস্তব্ধ, একসময় অখিল কারখানায় চাবি লাগিয়ে এলেন, বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বললেন—কতক্ষণ ঘেরে থাকবে তোমরা তড়িৎকে ? ক্লান্ত থাকে তো।"

ওরা উঠতে যাচ্ছিল—সরোজিনী, রতি, বিমল, রুবি,—তড়িৎ বলল—"বোসো আর আর একটু। যে ঘেরে রেখেছে তাকে তো বারণ করেননি দাদা।"

ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। রাত্রি যত গভীর হচ্ছে, আর সব যতই আলাদা হয়ে যাচ্ছে, আরও যেন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে এদের ; যারা এই প্রত্যক্ষ রয়েছে, আর যারা আজ সন্ধ্যার পর থেকে মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে—মুকুরু, রুবাই,—চাপা হাসিতে গলে পড়া মেয়ের দল—তার সঙ্গে খোলা আকাশের নীচে সেই জ্যোৎস্নাপ্লুত মুক্ত-প্রাঙ্গণ, অনন্ত আশায় ভরা, অনন্ত সম্ভাবনাময় সেই অনাড়ম্বর মুক্ত-জীবন।

একসময় উঠল সবাই, তারপর রাত আরও গভীর হলে এই সব-কিছুকে সঙ্গী করে তড়িৎ আবার চাতালটায় এসে বসল।

প্রিয়রতনের প্রতি কৃতজ্ঞ তড়িৎ ; আজ ওকে একটি ছোট্ট কথার সংকেতে নিজের জায়গায় ফিরিয়ে এনেছে। কাদের সঙ্গে কোথায় ভেসে যাচ্ছিল ও নিজের ব্রত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ! ওদের কাছ থেকে পেয়েছে শুধু প্রশংসা—অবশ্য সে প্রশংসা মেকি নয়, তার মূলে জীবনদর্শন রয়েছে,—দেবপ্রসন্নর নিজের, নলিনাক্ষর (যদিও কতকটা ভ্রান্ত), এমন কি, পিতার আদর্শে মল্লীরও—তবুও কতটুকুই বা এগিয়ে দিতে পেরেছে ওরা তড়িৎকে তার নিজের আদর্শের দিকে ? তারকারণ, ওরা যত ভালোই হোক, যত মহৎ-ই হোক, ওদের জীবনের সঙ্গে তড়িতের জীবনের কোন মিল নেই। ওদের আদর্শ ওর কাছে প্রত্যক্ষ নয়। যতটা প্রত্যক্ষ রুবাইয়ের আদর্শ।

আজ রুবাইকে যেন আবার নূতন করে দেখল। স্বাস্থ্যে আরও সমুজ্জ্বল, জীবনব্রতে আরও সার্থক ; দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সামনে ; পৌরুষ যেন উছলে পড়ছে ওর চারিদিক দিয়ে। বড় আনন্দ পাচ্ছে ভাবতে যে এই রুবাই-ই ওকে এইদিন এই নূতন পথে এসে দাঁড় করিয়েছিল, গ্লানির মধ্যে থেকে তুলে ধরে ; প্রেরণা জুগিয়েছিল। ঠিক আজকের দিনটিতে—মনটা যখন আহত তড়িতের—নিজের সার্থকতার মধ্যে, নিজের কীর্তির মধ্যে রুবাইয়ের এ-ভাবে আচমকা এসে দাঁড়ানো বড় ভালো লেগেছিল, মনে হয়েছিল তড়িতের জীবনের স্তিমিত আলোই হঠাৎ আবার ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাই একরকম একান্ত হয়েই ওর আনন্দে এমন করে গা ডুবিয়ে দিতে পেরেছিল তড়িৎ।

নিথর রাত্রে আত্মবিশ্লেষণ করতে করতে করতে, আজ হঠাৎ একটা নূতন প্রশ্ন উঁকি মারল তড়িতের মনে—তার এই নূতন পরিবেশ, নূতন সাহচর্য ধীরে ধীরে, অতি সূক্ষ্মভাবে আর একটা সর্বনাশ ঘটাচ্ছে নাকি ?—অবজ্ঞার ভাব এনে দিচ্ছে নাকি নিজের বৃত্তির ওপর—এই রিক্‌শা-টানার ওপর ? প্রশ্নটার চারিদিকে মনটা পাক খেতে লাগল।

একটা ঔদাসীন্য, খানিকটা গাফিলতি যে এসে গেছে—একটু অস্বীকার করা যায় না। আরম্ভ হয়েছিল আগেই, তারপর আবার এই ক'দিনের হল্লোড়ে বেড়েও গেছে। বাদ পড়েছে রিক্‌শা-টানা, ক্ষতি হয়েছে উপার্জনের দিক থেকে। ক্ষতির হিসাব করতে গিয়ে আরও একদিকের ক্ষতির কথা মনে পড়ল— অন্যায় হয়েছে শুধু নিজেরই নয়, ক্ষতি করিয়েছে অখিলেরও। ওরকম অনিয়মিতভাবে রিক্‌শা ছেড়ে দিলে সে রিক্‌শার সব সময় লোক পাওয়া যায় না। এর জের টেনে আর একটা হিসারের কথা এসে পড়ল। এই যে ঘোরাঘুরি, বনভোজনের হিড়িক, এতে অনেকগুলি টাকা বেরিয়ে গেছে। ওদিকে কিছু সঞ্চয় হয়েছিল, নিয়মিতভাবে বেড়ে চলেছিল, আজ একরকম হাতখালি বললেই চলে তার।

চাঁদা দিতে হয়েছে। কেউ একজনের ঘাড়ে ঝক্কি দেওয়ায় আপত্তিটা সে তুলেছিল, আত্মমর্যাদার দিক দিয়ে তারই গরজটা ছিল বেশি ; সেদিক দিয়ে ঠিকই হয়েছে ; কিন্তু তাতে ভেতরকার গলদটা কি যায় ? সত্যিই কি সে সমর্থ ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মোটা চাঁদা দিতে ?

নিজের কাছে নিজেই যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়তে হচ্ছে। সুদূর বর্ধমানের একটি অখ্যাত গ্রামের গৃহস্থ-সন্তান—গরীব গৃহস্থ—কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলেছিল নিজের ;—স্বচ্ছন্দ, স্বচ্ছল জীবনের এই উৎসবপ্রবাহে হঠাৎ আজ

এতই অশোভন বোধ হচ্ছে—যে একটা অপরিসীম লজ্জায় সমস্ত দেহমন শিরশির করে উঠছে। যেন একটা স্পর্ধা, একটা আত্মবিস্মৃতি।

সে শরীরও নেই আর। হয়তো মনের ভুল—যে ধারায় চিন্তা চলেছে তার জন্যেই, তবু মুঠো শক্ত করে ডান হাতটার দিকে চাইতে মনে হলো, পেশীগুলা যেন অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে এ কয়দিনে।

ক্লান্তি এসেছে চিন্তার মধ্যে। চিন্তার অবসাদেই রাত্রিটা যেন হঠাৎ বড় মিষ্টি হয়ে উঠেছে কি করে। এর সঙ্গেই দুটি মুখ হঠাৎ পাশাপাশি উঠল ফুটে—মল্লী আর রতির—কেন, কি করে তাও বোঝা যায় না। রতি এতক্ষণ ছিল বলেই বোধহয় তার মুখটা বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গভীর রাত্রি যেন মায়া জানে—এক এক সময় মায়ার ফুলঝুরি ঝরায়। হঠাৎ মনে হোল—রুবাই যে তখন তার বিয়েনিয়ে ঠাট্টা করল, তার সঙ্গে মল্লীকে নিয়ে রহস্যের কি থাকতে পারে ?—স্পষ্টই তো বোঝা যায় রতিকে টেনেছে।

কৌতুকের হাসি মুখে করে রতির দিকে চেয়ে রইল তড়িৎ।

(উনিশ)

পরের দিন প্রায় সমস্ত দিনটাই একটা অবসাদের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। রাত্রে অনিদ্রা, তার ওপর চিন্তার জটিলতা, ভালোয় মন্দয় এমন জোট পাকিয়ে যাচ্ছে, খুলতে যেন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে হচ্ছে।…ক্ষতি হচ্ছে পড়াশুনার। কথাটা কাল তেমন মনে পড়েনি, আজ সকালে টেবিল আর বইয়ের আলমারির দিকে নজর যেতে একটা গুরুতর অপরাধের আকারে এসে মনটা জুড়ে বসল। এতবড় একটা অপরাধ যে, সত্ত সত্ত স্খালন ক'রে না নিলে যেন চলছে না।

বিশৃঙ্খল হয়ে রয়েছে। সত্ত একটা কাজ পেয়ে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই উঠে গুছিয়ে নিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মোটা একখানা বই হাতে করে সমস্ত উৎসাহ যেন জল হয়ে গেল।

একটা অদ্ভুত চিন্তা, জীবনে এই প্রথম এসে উপস্থিত হোল মনে, কী হবে পড়ে ? এভাবে এ বিত্তা অর্জনের সার্থকতা কি ?

প্রশ্নটা এত মৌলিক, এত গোড়া ধরে নাড়া দেওয়া, যে কিছুক্ষণ পর্যন্ত যেন মনটা স্তম্ভিত, অবশ হয়ে রইল। প্রশ্ন নয়, একটা যেন আতঙ্ক, কিছুক্ষণ পর্যন্ত এগুতেই সাহস হোল না, তারপর জোর করেই এগুল। খুঁজে বের করতে হবে উত্তর, এড়িয়ে যাবে

কিসের জন্য? মনটা অতিরিক্ত বিচার-প্রবণ হয়ে উঠেছে, হঠাৎ যেন জজের আসনে উঠে বসেছে মেরুদণ্ড সিধা করে।

বিদ্যা অর্জন, না, একটা বিপুল ফাঁকি, ক্রমাগত মনকে চোখ ঠেরে এগিয়ে যাওয়া? এই যে মোটা মোটা বইগুলো—এদের সঙ্গে ওর বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই—এবার পড়ে যেতে পারবে কিনা—পারবার কখনও ইচ্ছাই হবে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ...অতি সঙ্গত কারণেই, কেননা ওর উদ্দেশ্য বিদ্যা অর্জন নয়, ওকে অর্জন করতে হবে খানকতক সার্টিফিকেট—এর জন্যে, যাঁরা আজীবন তপস্যার দ্বারা বাণীর বর লাভ করেছেন, জগতের গুরুস্থানীয় যাঁরা, তাঁদের দ্বারস্থ হওয়ার দরকার নেই তো, তাঁদের সিঁধ কেটে যারা সার-সংগ্রহের অজুহাতে অসারের বেসাতি লাগিয়েছে তাদের শরণাপন্ন হলেই কার্যসিদ্ধি।...নোট, নোট আর নোট; এই করে তিনটে সার্টিফিকেট যোগাড় হোল আজ পর্যন্ত। ভাবতে গেল নিজের কাছেই নিজের লজ্জা করে। এই ধারাই বয়ে চলেছে; সর্বত্র। বড় বড় বিশ্ববিদ্যার নিকেতন, তাদের সমারোহের অন্তরালে আত্মপ্রবঞ্চনার এই প্রচ্ছন্ন স্রোত বয়ে চলেছে। তপস্যা ক'জনের?

এদের সরস্বতী নারায়ণের সঙ্গে যেন অনন্তশয়নে সুপ্ত, চোরের দল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গিয়ে তাঁর অরক্ষিত দপ্তরখানা শূন্য করে আসছে। ফাঁকির, অসম্মানের মানপত্র।

আরও একটা মস্তবড় ফাঁকি,—যে বিষয়টা নিয়ে পড়ছে—দর্শনশাস্ত্র, তার সঙ্গে তার অন্তরেরর কোন যোগ নেই। নিয়েছে এই জন্যে যে, অন্যান্য বিষয়গুলার তুলনায় এটা নাকি সহজ, এর সার্টিফিকেটটা সস্তা!...গোড়া থেকে একটা প্ল্যান করে ফাঁকিবাজি,—আই-এ'তে লজিক নিয়েছিল, উত্তরকালে দর্শনশাস্ত্র নেবে বলে। সে জিনিসটার সঙ্গে অন্তরের আরও যোগ ছিল না।

জীবনের একটা মিথ্যা ধরতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সমস্ত জীবনটাই মিথ্যার শৃঙ্খলে পাকে পাকে জড়ানো। মনটা যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে—একী হোল? কী হতে চলছে?

এক এক সময় একটা চরম সঙ্কল্প ঠেলে উঠছে মনে; ছেড়ে দিক। হ্যাঁ, একেবারে এক কথায়, যেমন করে পরিহার করেছে মল্লীদের সঙ্গ। জীবন থেকে সমস্ত মিথ্যার গ্লানি ধুয়ে-মুছে জীবনটাকে অনাবিল সত্যে প্রতিষ্ঠিত করুক। বাড়ীর দুঃখ ঘোচাবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়েছিল—নিশ্চয় বিত্ত অর্জনের দ্বারা। তার যা পন্থা, যা উপায় তার সন্ধান পেয়েছে। অবশ্য চিরকাল রিক্‌শা ঠেলে নয়, তবে যে আত্মশক্তির ওপর নির্ভর ক'রে, রিক্‌শাই যে তড়িতের কাছে তার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে একথা কি

অস্বীকার করতে পারে ? এই রকম এক একটা প্রতীক সামনে রেখেই তো এগিয়ে যায় লোকে। কর্মের ক্ষেত্রে, কীর্তির ক্ষেত্রে দিগ্বিজয় করে। কত তুচ্ছ প্রারম্ভ অনেকেরই জীবনে যেন ক্ষীণ গঙ্গোত্রী-ধারা; তারপর সেই ধারাই নিজের বেগে পুষ্ট হয়ে, ঐশ্বর্যবতী হয়ে, নিজেকেও ছাড়িয়ে জগতের কল্যাণে ছড়িয়ে পড়েছে।...জগতের বড় বড় সব শিল্পপতি—ফোর্ড, রক্‌ফেলার...নিজের দেশেও উদাহরণের অপ্রতুল নেই।

উঁচু থেকে নেমে ঘরের কাছে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অনুপরা যেমন গল্প শোনে দেবপ্রসন্নর কাছে। দেবপ্রসন্ন নিজেও তো। কিছু হতে পারেননি, পৃথিবীতে অনেক সম্ভাবনাই তো নষ্ট হয়। তবু প্রাণের বর্তি অম্লান জ্বেলে রেখেছেন, শিখা জ্বেলে দিচ্ছেন প্রাণে প্রাণে। তড়িতের নিজের প্রাণে সে-শিখার স্পর্শ রয়েছে।

আরও কাছে, একেবারেই ঘরের মধ্যে। অখিলদা।

অখিলদা আরও বড় স্বপ্ন দেখছেন, মাঝে মাঝে বলে ফেলেন তার কাছে। সেদিন বললেন—"জানো তড়িৎ, কারখানাটাকে বাড়াব মনে করছি। আর শুধু মেরামত আর ভাড়া দেওয়া নয়, তোয়ের করব রিক্‌শা, আপাততঃ পার্টস্‌ এনে এসেম্‌বল্‌ করব—তারপর—তারপর—আরও ভাবছি—চারিদিকে ডিম্যাণ্ড বাড়ছে—মস্তবড় ফীল্‌ড্‌..."

উৎসাহে মুখটা দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, তারপরই কিন্তু একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিলেন—একটু অবসন্ন কণ্ঠে বললেন—"লোক দরকার একজন—যে পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। লোকই পাওয়া কঠিন।"

যতই ভাবছে যেন অশ্রদ্ধা ধরে যাচ্ছে—এই পড়ার ওপর, পাস করার ওপর। আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে—এ ধরনের পড়ার ওপর, পাস করার ওপর। জীবনের কর্মস্রোত বয়ে চলেছে উত্থান পতনের বিরাট আনন্দে-অবসাদে—শৌর্যমানদের অভিযান; তার তীরে দীননেত্রে তাকিয়ে থাকা, হাতে প্রবঞ্চনা করে সংগ্রহ-করা পত্র—ভিক্ষা-পাত্রও বলা চলে, মা-সরস্বতীকে লক্ষ্মীর দুয়ারে ভিখারিনী বেশে এনে দাঁড় করানো।

এক এক সময় মনটা আতঙ্কিতও হয়ে উঠেছে। সামনেই পরীক্ষা, হঠাৎ এ-ধরনের বৈরাগ্য এতদিনের সাধনাকে সিদ্ধির মুখে নষ্ট করে দেবে নাকি!

মাঝখানে একটা মজার ব্যাপারও হয়ে গেল। বই হাতে করে ভাবছিল, অখিল কারখানায় যাওয়ার পথে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্ন করলেন—"কাল অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোওনি, মাঝখানে, একবার উঠে দেখলাম চাতালটায় বসে আছ; শরীর ঠিক আছে তো?"

প্রস্তুত ছিল না বলে একটু সচকিত হয়ে উঠল তড়িৎ, আমতা-আমতা করে বলল—
—"আজ্ঞে হ্যাঁ—শরীরে কি হবে ? একটু গরম ছিল তো…"

তারপর মাঝখান থেকে হঠাৎ বলে উঠল—"আচ্ছা অখিলদা, একটা কথা জিগ্যেস করব ভাবছিলাম—বলছিলেন কারখানাটা বাড়াবেন, লোক খুঁজছেন—তাহলে বিমলকে অযথা কতকগুলা মুখস্থ বিদ্যে আয়ত্ত করিয়ে কি হচ্ছে ?"

একটু অদ্ভুত লেগে থাকবে নিশ্চয়, অখিল বললেন—"ম্যাট্রিক পাস করে নিক।"

"খুব বেশি দরকার ?…দেখছি বড় বড় কর্মীদের অনেকেই ম্যাট্রিকুলেট নয়। সময় নষ্ট তো।"

এক এক সময় বলে বসে এইরকম কথা—খানিকটা ভাবপ্রবণ আর আদর্শবাদী-ই তো। বোধহয় সময়ের অভাবেই তর্কটা আর এগুতে দিলেন না অখিল, একটু হেসে একটা চলতি রসিকতার অবতারণা করে বললেন—"সে তো ভগবানও ম্যাট্রিক পাস নন, চালাচ্ছেন নাকি দুনিয়াটা, কি বলো ? বেশ, ভেবে দেখে আবার তোমার সঙ্গে কথা কইব। তবে মনে হয় ওটুকু সেরে নেওয়াই ভালো যেন।"

অশান্তিটা যেন যেতে চাচ্ছে না কোনমতে। রাত্রে নিদ্রা হয়নি, তবু দুপুরে একটু চোখ বুজতে পারল না, হয় পরীক্ষার জন্যে উঠে-পড়ে লাগা, না হয় একেবারে ও পাট-ই তুলে দেওয়া, এর মধ্যে একটা কিছু হেস্তনেস্ত করে ফেলতেই হবে। ঝোঁকটা তুলে দেওয়ার দিকেই ; কিন্তু যতই ভাবছে, একটা নূতন ধরনের বাধা এসে দাঁড়াচ্ছে। অখিল আর তার পরিবারের সবাই কি হতে দেবেন ? একটা পাগলামি বলে মনে করবেন না ? …যে কেউ শুনবে, সেই তো তাই মনে করবে। রিক্‌শা চালানো যে এদিকে কমে এসেছে সেটা লক্ষ্য করে অখিল একদিন বললেন—"এ ক'টা দিন আর ছেড়েই দাও না-হয় তড়িৎ ; পাস করাটাই তো আসল।"

সাধারণত অখিল কোন মন্তব্য করেন না ; ছেলেটা বাড়িতে রয়েছে, আজকাল একেবারেই বাড়ির একজন হয়ে—কি ভাবে নেবে কে জানে ?

চিন্তার আবর্ত থেকে মনটা হঠাৎ একসময় মুক্ত হয়ে গেল, যেমন হঠাৎ জড়িয়ে পড়েছিল।…হয়েছে, একবার বাড়ি হয়ে আসুক।…বুকটা যেন হালকা হয়ে গেল।

আজ প্রায় দু'বৎসর হোল বাড়ি যায়নি, রাঁচিতে এসে পর্যন্তই। বাড়ি নিয়েই তার জীবন, বাড়ি-ই কেন্দ্র, অথচ আজ যেন প্রথম বুঝতে পারল—ধীরে ধীরে সে কেন্দ্র-চ্যুত হয়ে পড়ছে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে সে, জীবনে অনেক নতুন কিছু এসে সমস্ত মানপুরটাকে যেন আবছা করে ফেলেছে তার কাছে—মন্ত্রী, দেবপ্রসন্ন,

নলিনাক্ষ, হুজুর, জোনহা, রুবাই; আর কাছে অখিলদার পরিবার—এই তো জীবন এখন ওর। প্রত্যক্ষ পরোক্ষকে এমন ভাবে আবৃত করে ফেলতে পারে, দূরের জিনিস কাছে এসে কাছের যা তাকে এত দূর করে দিতে পারে দেখে বিস্মিত হোল তড়িৎ।

বেশ হালকা হয়ে উঠেছে বুকটা। বেশ বুঝতে পারছে মানপুর-ই সব সমস্যার সমাধান—একবার বাড়ির পটভূমিকায় গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে নিজেকে আবার করে চিনে নিতে পারা যাবে না, বুঝতে পারা যাবে না পাস করাটাই প্রথম প্রয়োজন, কি, সব ছেড়েছুড়ে উপার্জনের পথে নেমে পড়াই।...একটু তাড়াতাড়ি। অখিলদা কারখানা বাড়াবে, লোক খুঁজছে—একটা বিরাট সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত রয়েছে।

এই চিন্তার মধ্যে হঠাৎ চারিদিকে খানিকটা আলো নিয়ে যেন একখানি প্রসন্ন মুখ ভেসে উঠল। মাস্টারমশাইয়ের এ মুখখানাও তার স্মৃতি থেকে আস্তে আস্তে যেন মুছে যেতে বসেছে; আশ্চর্য লাগছে, কি করে!...আরও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

উঠে টেবিলের দেরাজ থেকে পার্সটা বের করল। প্রায় শূন্য, মাত্র একটাকার আটটি নোট আর কয়েক আনা পয়সা পড়ে রয়েছে। একটু চিন্তা করল, তারপর কারাখানায় চলে গেল। অখিল খানকয়েক রিক্শার মেরামত তদারক করছিলেন, গিয়ে বলল—"আমার একটা রিক্শা চাই অখিলদা, পাব?"

অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায় চেহারাটা একটু উদ্‌ভ্রান্ত, অখিল একবার দেখে নিয়ে বললেন—"সে তো সন্ধ্যের পর; তোমারটা জমা দিয়ে যাবেই।"

"না, এখন থেকেই নোব, নেই খালি কোনটা?"

ঘুরে দাঁড়াতে হোল অখিলকে, একবার আকাশের দিকে চেয়ে বললে—"এই রোদে?...তা ভিন্ন, দিনে তো চালাও না তুমি।"

"চালাব।"

একটু অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে কতকটা যেন জিদের সঙ্গেই বলল। বিস্মিত হয়ে পড়েছেন অখিল; প্রশ্ন করলেন—"হঠাৎ?"

আমতা-আমতা করে উত্তর দিল তড়িৎ—"একটু দরকার পড়ে গেল। মানে—অনেকদিন তো চালাই নি।"

"নাই বা চালালে, ক্ষতি কি হচ্ছে? আমি তো বরং বলছিলাম কিছুদিন ছেড়েই দিতে। পরীক্ষাটা সামনে এসে পড়েছে তো।"

একটা কারণ মনে উদয় হওয়ায় একটু থেমে বললেন—"একটা কথা জিগ্যেস করি—

তোমার টাকাকড়ির দরকার আছে কিছু? বলছি, বই-টই কিছু কিনতে হবে? সঙ্কোচ কোর না।"

সঙ্কুচিত ভাবেই মুখের দিকে চাইল তড়িৎ; বলল "দরকার কিছু টাকার, তবে বই কেনবার জন্ত নয়। বাড়ি যেতে হবে।"

"হঠাৎ? এমন অসময়ে? কোন চিঠি পেয়েছে নাকি? খবর ভালো তো?"—একসঙ্গে অনেকগুলা উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করে বসলেন।

তড়িৎ উত্তর করল—"খবর ভালোই।...অনেকদিন যাইনি..."

"ও!..."

মনে মনে একটা চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে, বিস্ময়টা কাটতে চাইছে না। একটু থেমে বললেন—"বেশ তো। তবে দেরি কোর না, তাড়াতাড়ি ঘুরেই এসো। তা রিক্শা চালিয়ে টাকা তুলতে দেরি হয়ে যাবে না? আমি দিচ্ছি। পরে দিয়ে দিয়ো।... কত লাগবে?"

একটু যে থতমত খেয়ে গেছে তড়িৎ তাতে সুবিধা এই হোল যে, প্রশ্নটার পুনরুক্তি করতে হোল না। কারখানার অফিস-ঘরে গিয়েই দেরাজ খুলে দশখানা দশটাকার নোট এনে সামনে ধরলেন; বললেন—"এইগুলো রাখো, দশখানা আছে।"

"অতগুলো টাকা কি হবে?"

অখিল হাতটা আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন—"সঙ্গে রাখতে দোষ কি? অনেক দূরে যাচ্ছ তো। যেটা খরচ না হয়, এসে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়ো আমায়।"

(কুড়ি)

গাড়ি বদল করবার জন্তে রাত থাকতে একবার উঠতে হয়েছিল, আবার যখন ঘুম ভাঙল, চাখে বেশ ফরসা হয়ে এসেছে। উঠে, বালিশটায় চাদর সতরঞ্জি জড়িয়ে নিয়ে জানলার ধারটিতে বসল তড়িৎ। মেল ট্রেন, গাড়িটা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে। দূরে-কাছে সর্বত্রই পাহাড়, এঁকে বেঁকে সর্পিল গতিতে চলেছে গাড়িটা। ও যখন উঠে বসল, একটা বড় বাঁকের মুখে নীচুর দিকে ছুটে চলছে। গতিটা হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড, এক এক সময় গা ছমছম করে ওঠে, মনে হয় চাকা বুঝি লাইন ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। ভয়ের সঙ্গে একটা মাদকতা লেগে রয়েছে; গতির নেশা।

কাল বিকালে চড়েছে গাড়িতে। ঐ যে একটা সমাধান করে ফেলেছে যা'হোক,

তার জন্যে মনটা অনেকখানি নিশ্চিন্ত ছিল, ঘুমটা বেশ ভালো হয়েছিল, মনটা তাজা আছে। সময়টাও ভালো—এপ্রিলের প্রায় মাঝামাঝি—পাহাড়ে অঞ্চলে একটু শৈত্য-ভাব লেগে রয়েছে এখনও।

জানালার গরাদে মুখ চেপে দেখল বাঁকের জন্যই বহুদূরে, বেশ খানিকটা নীচুতে ইঞ্জিনটা দেখা যায়; তার চাকাগুলো এত ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরছে, আশ্চর্য হতে হয়, সম্ভব হচ্ছে কি করে। তারপরই গাড়ি-পাহাড়-আকাশ নিয়ে সমস্ত দৃশ্যটা হঠাৎ যেন সজীব হয়ে উঠল; আর শুধু দৃশ্যমান নয়, যেন একখানি কাহিনী—

সামনের পাহাড়ের শ্রেণীর মাথায় একফালি মেঘ ছিল, সেটি নেমে যেতে আধখানা সূর্য বেরিয়ে এসে ওদিককার আকাশটা ঝলমল করে উঠল। গাড়ির মুখটা ঠিক সামনা-সামনি, গতি তখনও নীচের দিকেই, মনে হোল হঠাৎ যেন একটা নূতন জগতের, নূতন জীবনের তোরণ খুলে গেছে, গাড়িটা প্রমত্ত উল্লাসে ছুটে চলেছে সেই দিকে।

এগিয়ে আসছে সে-জগৎ তড়িতের মুগ্ধদৃষ্টির সামনে—কর্মের বিরাট যজ্ঞশালা। রেল-লাইনের দু'পাশ থেকে আরম্ভ করে দু'দিকের দিক্‌চক্র পর্যন্ত ঝরিয়া-বরাকরের কয়লার খনি—ছোট বড় অসংখ্য। কোন-কোনটাতে এখনও বিদ্যুতের আলো নেভানো হয়নি, অসংখ্য দীপ ভোরের আলোয় মুক্তোর মতো ঝিকঝিক করছে। দূরেরগুলায় শুধুই ধুঁয়ার কুণ্ডলীতে যা কর্ম-সজীবতার লক্ষণ; যতই কাছের দিকে আসছে সে-সজীবতা ততই স্পষ্ট—কয়লা তোলা, ট্রলি বোঝাই, ট্রলি খালাস, আসা-যাওয়া, ওঠা-নামা; মাথায় বেতের ঝুড়ি নিয়ে কুলী-রমণীরা সার বেঁধে চলেছে—গাঁইতা-শোভেল নিয়ে বেটাছেলের দল—গাড়ি যত এগুচ্ছে, দিন বাড়ছে, কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠছে আরও স্পন্দনময়। লেভেল-ক্রসিঙের গুমটি এসে পড়ল। লোহার ফটক চেপে দু'দিকে চাপ। ভিড়—মোটরগাড়ি, ট্রাক, মোষের গাড়ি, রিশকা, সাইকেল, পদব্রজী,—পাঞ্জাবী, শিখ, ভোজপুরী, সাঁওতাল,—কর্মস্রোতে ক্ষণিকের বাধা এনে ফেলে ট্রেনটা হঠাৎ একটা আবর্ত সৃষ্টি করেছে—সবাই যেন ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, কখন্ আবার ফটক খুলবে, সবাই একটানা স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়বে, কে যাবে আগে।…গাড়ির-ই বা দোষ কি? এক স্টেশন ছেড়ে, মাঝে কত স্টেশন-ই ডিঙিয়ে আবার কতদূরে অন্য স্টেশনে একটু বিশ্রাম পাবে, বিরাট কর্মযজ্ঞে তার নিজের কথা ভাববার কি সময় আছে?

অদ্ভুত লাগছে তড়িতের, রক্তে যেন দোল খাইয়ে দিচ্ছে। চড়াইয়ের মুখে গাড়ির গতি যখন মন্থর হয়ে যাচ্ছে, এক এক জায়গায় বেশিরকমই, ওর মনে হচ্ছে, নেমে পড়ে ছুটে যাক, সামনে আরও কত কী হচ্ছে দেখুক। তর সইছে না যেন।

বরাকরের পরে যজ্ঞশালায় আর একটি নূতন তোরণ খুলে গেল। আর শুধু কয়লা-খনি নয়, কুলটি এসে পড়ল, লৌহ-নগরী, বিশ্বকর্মার খাসমহল, বিরাট কারখানার আঁকাবাঁকা লাইন নীল আকাশে ঢেউ তুলে আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত চলে গেছে। গাড়ি এগিয়েই চলল,—এও যেন বিশেষ কিছু নয়। সত্যই তো, সামনেই আসানসোলকে কেন্দ্র করে বিরাট শিল্পাঞ্চল,—গড়ে উঠেছে বার্নপুর, চিত্তরঞ্জন; গড়ে উঠেছে দুর্গাপুর। যেটুকু দেখল তারই দৃষ্টান্তে এদের বিরাটত্ব কল্পনা করে বিস্মিত হয়ে পড়েছে তড়িৎ। কত এগিয়ে চলেছে জীবন!…তার সামনে কায়ক্লেশে, যতরকম প্রবঞ্চনা হতে পারে তার আশ্রয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটাকতক মানপত্র যোগাড় করা! কী দীন! কী হাস্যকর!

নিজের কথায় এসে চিন্তার স্রোতটা ঘুরে গেল। একটা আত্মশ্লাঘা জেগে উঠেছে মনে হঠাৎ। না, আর তো তড়িৎ ওদের দলে না। বিদায় নিয়ে নিয়েছে ও-জীবন থেকে।…হাত দুটো শক্ত করে মুঠো করে নিয়ে একবার আড়চোখে দেখেও নিল,—না, ওর ধমনীর রক্তে মুক্তির কল্লোল, ওর দীক্ষা হয়ে গেছে, দিয়েছিল আদিবাসী সন্তান রুবাই…

এই চিন্তাটাই গড়িয়ে হঠাৎ অন্যদিকে গিয়ে পড়ল; মনটা একেবারে যেন মুষড়ে পড়ল।

ভারতের সবাই জুটেছে যজ্ঞেশ্বরের মহা আহ্বানে—পাঞ্জাবী, শিখ, পশ্চিমা, বিহারী, উৎকলী, আদিবাসী—খর্ব, বিরাটকায়,—সবাই—এমন কি দক্ষিণ থেকেও—কয়েকটা গুমটি পার হতেই তো লক্ষ্য করল, দেখল না শুধু নিজের জাতকে।

না, দেখেছিল বৈকি। তখন ঐ বিরাট কর্মিসংঘের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিল বলে অত খেয়াল হয়নি, এখন একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে মনে পড়েছে, দেখেছিল—

লেভেল-ক্রসিং থেকে খানিকটা দূরে একটা শুকনো মাঠের ওপর দিয়ে একটা গোরুর গাড়ি চলেছে নিতান্ত অলস নিরুৎসাহ গতিতে—শীর্ণ একজোড়া বলদ, জীর্ণ এক গাড়োয়ান, হাতে একটি ছোট হুঁকো।

লেভেল-ক্রসিঙের অত যে ভিড়, মোটরের হর্ন, রিক্‌শার ঘন্টি—ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। ঐ কর্মমুখর জীবনের সঙ্গে কোন যোগসূত্রই নেই ওর।

আরও একটি দৃশ্য, একটা গুমটির সামনেই। একটি বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশের লোক, জীর্ণই, ছোট কোঁচা ঝোলানো বাঙালী চাষাভূষার মতো। কাঁকালে একটি শিশু, একটি শিশুর হাত ধরাও, বড় আর একটি আলাদা দাঁড়িয়ে। তখন অত খেয়াল করেনি, এখন

দুটি দৃশ্যই অনুকম্পায় মনটা দিচ্ছে ভরে। বিশেষ করে এদিকে লক্ষীর হাটে ষষ্ঠীর ব্যাপারী বলে মনে হ'য়ে অনুকম্পার যেন কূলকিনারা পাচ্ছে না তড়িৎ।

এরা কিছু করবে না। গৃহকোণ ছেড়ে, গৃহিণীর অঞ্চল ছেড়ে বেরুবে না। বিরাট মুক্তজীবনের ল্যাবরেটারিতে যেখানে নিত্য নূতনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, এদের সেখানে স্থান নেই; জীর্ণকে, পুরাতনকে আশ্রয় ক'রে ব'য়ে চলেছে এদের নিরানন্দ জীবনধারা। জীবন নয়, কেননা মৃত্যুকে তো জীবন বলা যায় না। এ একটা দীর্ঘীকৃত মৃত্যু, দিগ্‌দিগন্ত পাপক্ষয়। সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডী, এ-পাপ, এ জাতির যেন শাশ্বত সঙ্গী— কোন কালেই যেন ক্ষয়িত, নিঃশেষিত হবে না।

পাহাড়ে অঞ্চল অনেকক্ষণ ছেড়ে গেছে। দিন বেড়েছে, চারিদিক রুক্ষ, নিষ্পাদপ, তাত উঠেছে বেড়ে।...দলে দলে লাইনের কুলীরা কাজ করছে। লাইন পাল্‌টানো হচ্ছে। জনছয়েক কুলী একটা রেল তুলে নিয়ে আসবে টাঙিয়ে। কালো অঙ্গ দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে, পেশী-বন্ধ অর্ধনগ্ন দেহ রোদে চিকচিক করছে।...একটা কথা কি করে হঠাৎ মনে পড়ে গেল তড়িতের। ছেলেবেলায় প্রতিমা দেখতে যেত—দুর্গার, কালীর, আরও সব দেব-দেবীর,—কুমোরে যতক্ষণ ঘামতেল না লাগিয়ে দিত ততক্ষণ বাহার খুলত না।

একটা অদ্ভুত আত্মগরিমা; ও আজ এদেরই একজন। কর্মীরা একজাত, তাদের বাঙালী-পাঞ্জাবী-সাঁওতালী নেই। এই চিন্তা ধরে আরও একটা উদ্দীপনা জেগে উঠেছে মনে। অনুকম্পার সঙ্গে একটা আশা—জীবনে একটা মিশনের সন্ধান পেয়েছে, ঐ যে সব নিরুদ্যম শ্রমবিমুখের দল, তড়িৎ তাদের টেনে তুলবে। নিজের আদর্শ দিয়ে, নিজের অনুপ্রেরণা দিয়ে!

বলবে, ওর একলার চেষ্টা, একলার আদর্শ কতটুকু? কাঠবেড়ালীর সাগর-বন্ধন। তা হোক। সাগর-বন্ধনের ইতিহাসে ঐ কথাটাই বড় হয়ে থেকে গেছে। কাঠবিড়ালী শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ পেয়েছিল, পৃষ্ঠে তার পদ্মহস্তের চিহ্ন বহন করছে।

তার একাই বা কিসে? দেবপ্রসন্নরা আছেন, অনুপেরা আছে, অখিলদা'রা রয়েছেন। আরও কত রয়েছে এমনি।...আর এরাই কি নেই? সমস্ত ভারতের এই কর্মিসংঘ, দিক দিক থেকে যারা ছুটে আসছে, এদের দৃষ্টান্ত, এদের প্রাণের উত্তাপও কি সঞ্চারিত হবে না এই মুহ্যমান জাতির জীবনে?

এই আশাটাই বুকে করে বর্ধমানে নামল তড়িৎ।

একটা রিক্‌শা করে দামোদরের খেয়া-ঘাটের দিকে চলল; পেরিয়ে আরও মাইল কয়েক দূরে খানপুর।

একটা চমৎকার শুভযোগ। রিক্‌শা-চালকটি শুধুই বাঙালী নয়, তাদের মানপুরের কাছেই একটা গ্রামের লোক। কেমন একটা বিশ্বাস এসে মনে ঠাঁই করে নিয়েছে—যেন আরম্ভ হয়েই গেছে তড়িতের জীবনের নূতন গতিপথ; অলক্ষ্য থেকে কোন্ দেবতারই যেন ইঙ্গিত এটা। বরাবর গল্প করতে করতে চলল লোকটার সঙ্গে।

(একুশ)

মানপুরে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল।

তড়িতের দাদা জিমূত সামনের দাওয়ার কিনারায় বসে হাত পা ধুচ্ছিলেন, বোধ হয় এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরছেন, তড়িৎ উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে একটু ঠাহর করে নেওয়ার পরও প্রশ্ন করলেন—"কে?"

"আমি তড়িৎ, দাদা।"

"তড়িৎ! তড়িৎ এসেছ?"

—গামছায় হাত মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে এগুচ্ছেন, তড়িৎ সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে, বিছানার পুঁটলি আর সুটকেসটা দাওয়ায় নামিয়ে প্রণাম করল। প্রশ্ন করল—"বৌদি কোথায়?…রমা?"

"তোমার বৌদি বোধহয় গা ধুতে গেছে। রমা তো ছিল।"

হাঁক-ই দিলেন রমাকে। গোয়াল-ঘরে সাঁজাল দিতে গিয়েছিল, সেখান থেকেই জবাব দিল—"এলুম বাবা!"

"আরে, আগে কে এসেছে দেখবি আয়!"

ভেতরে ভেতরে বেশ একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছেন, প্রকাশ করতে চান না, তবে যেন একটু একটু কাঁপছেন। একবার একটু কুণ্ঠিতভাবে তড়িতের দেহের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে গেল, একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে বললেন—"মাথাটা এগিয়ে আনো, আশীর্বাদ করা হয়নি যে।"

তড়িৎ মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দিতে ডান হাতটা একটু চেপে ধরে বললেন—"তা তড়িৎ হঠাৎ এলে যে!…এসেছ অবশ্য ভালই হয়েছে—বলছিলাম দেহগতিকে ভালো আছ তো?—এসেছ, ভালোই হয়েছে…দাঁড়াও, প্রায় বছর ছ'এক তুমি আসনি—সেই যে বি-এ পাস করে এম-এ পড়তে গেলে…"

হঠাৎ থেমে গিয়ে একটু যেন শঙ্কিত ভাবেই সুটকেস আর পুঁটলিটার ওপর

থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে এনে বললেন—"এবার তো তোমার এম-এ পরীক্ষাও এসে পড়ল।"

দৃষ্টি গিয়ে পড়ার কারণটা তড়িতের বুঝতে দেরি হোল না, কিন্তু কিছু একটা যেন ভেবে নিয়ে স্পষ্ট উত্তরটা দিল না, শুধু বলল—"পরীক্ষাটা হচ্ছে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে। অনেকদিন আসিনি দাদা, নানা ঝঞ্ঝাট তো, তার মধ্যে পড়া, হয়ে ওঠেনি আসা, তাই মনে করলাম…"

কথাটা যেন লুফে নিলেন জিমূত, দৃষ্টিটা আর-একবার আপনা হতেই সুটকেস-পুঁটলির ওপর গিয়ে পড়ল ; বললেন—"ঝঞ্ঝাট নয় ? এম-এ'তে তো আরও ঝঞ্ঝাট—টিউশন করে তারপর নিজে পড়ে পাস করা—তাই জিগ্যেস করছিলাম—দিচ্ছি তো পরীক্ষাটা…মানে—পেরে উঠবে তো ?"

দৃষ্টি বারবার-ই গিয়ে পড়ছে ও-দুটার ওপর। আশা-নিরাশা একসঙ্গে ফুটে উঠছে সে-দৃষ্টিতে ; প্রশ্নটার কী উত্তর হয়।

তড়িৎ একটু বিপর্যস্তই হয়ে পড়েছে, আরম্ভ করল—"ইচ্ছেটা তো…"

জিমূত সবটুকু মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন, পিঠে ডান হাতটা চেপে বললেন—"সে যেমন বুঝবে করবে—যদি না-ই পারলে এ-বছরটা…জামা-টামা ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও গরম পড়েছে—আসতেও হয়েছে কমটা নয় তো—কখন বেরিয়েছিলে ?"

রমাকে আবার হাঁক দিতে যাচ্ছিলেন, দেখেন সে গোয়াল-ঘরের ওদিক থেকে এসে জামরুল-তলায় একটু বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। জিমূত একটু হেসেই আরম্ভ করেছিলেন—"এই দ্যাখো! তুইও চিনতে…"

কথাটা মুখে আটকে গেল, ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—"কাকা রে—তড়িৎ। এই দ্যাখো!…না, তুমি এবার বড্ড দেরি করে ফেলেছ তড়িৎ।"

এগারো-বারো বছরের কিশোরীটি, মাঝখানে একটা দীর্ঘ ব্যবধানও গেছে, কাকার ডাকে একটু জড়িত পদেই উঠে এসে পাশটিতে দাঁড়াল। প্রণাম করতেও ভুলে গেছে, বাপের কথায় শুধরে নিয়ে আরও একটু জড়োসড়ো হয়ে ঘেঁষে দাঁড়াল। তড়িৎ স্নেহভরে মাথাটা পাঁজরার কাছে চেপে বলল—রমাটা বেড়ে উঠেছে দাদা, না ?"

চিনতে পারলেন না বৌদিদি তমালিনীও। তিনি যখন গা ধুয়ে এসে বাড়িতে ঢুকলেন, তখন এরা তিনজনে উঠানের মাঝখানে একটা চৌকির ওপর মাদুর বিছিয়ে বসেছে। প্রথম সাক্ষাতের প্রশ্ন-জড়তা সব কেটে গিয়ে জোর গল্প চলেছে তিনজনের

মধ্যে। চৌকাঠ ডিঙিয়েই একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন বৌদিদি, তারপরে একেবারে ঘোমটা দিলেন টেনে। জিমূত যেন একটা কৌতুক দেখছিলেন মিটিমিটি হাসির সঙ্গে, মেয়েকেও টিপে দেওয়ায় সেও চুপ করে ছিল, ঘোমটা টেনে দিতে হো-হো করে হেসে উঠলেন; বললেন—"ঠিক হয়েছে, শুধু আমরা দুজনেই দোষী হই কেন?···তড়িৎ এসেছে।"

"ঠাকুরপো!···তা কি করে জানব?"

হনহন করে এগিয়ে আসছিলেন, তড়িৎ-ও কৌতুক উপভোগের মধ্যেই ছিল, তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে প্রণাম করে একটু হেসে বলল—"দোষ আমারই, একেবারে কিছু চিঠিপত্র না দিয়ে···"

"অনেকদিনই চিঠি দাওনি!"—একটু রাগের ভান করেই মুখ তুলে বললেন বৌদিদি।

"পাইওনি তো অনেকদিন।"

"সে তোমার দাদাকে বলো, যিনি চিঠি লেখবার মালিক। আমার চিঠি কবে ক'টা পেয়েছো?—কালে-ভাদ্রে হয়তো একটা। তাও আজকাল সাহস হয় না—তিনটে পাস দিয়ে চারটে দিতে যাচ্ছে দেওর···ভরসন্ধ্যেয় সত্যির টিকটিকি—মা-মঙ্গলচণ্ডী মুখ রাখুন—চারটে পাস দিতে যাচ্ছে—কোথা থেকে সাহস হবে মুখ্যু-সুখ্যু বৌদিদির?"

উঠে গিয়ে দাওয়ায় ভিজে কাপড় মেলে দিতে দিতেই কথা বলছিলেন, মধ্যে গিয়ে দু'খানা পাখা বের করে নিয়ে এসে চৌকির ওপর রেখে, আবার দাওয়ায় উঠে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"রমা, সন্ধ্যের কাজগুলো একটু এগিয়ে রাখবি তা-নয়, আলোগুলো পর্যন্ত জ্বালিসনি, তুলসীতলায় পিদিম দিসনি। একটা মানুষ সেই ন'শো পঞ্চাশ কোশ থেকে এল—কোন্ দিকটা যে সামলাই···"

রমা কাকার গায়ে লতিয়ে বসেছিল, আর একটু চেপে আবদারের সুরে বললো—"দেখেছো, কাকা এসেছেন···"

"তবে আর কি, কাকাকে উঠোনের মাঝখানে বসিয়ে রাখলেই হল, তাহলেই চারিদিকে আলো হয়ে যাবে, গেরস্তর খরচ বেঁচে যাবে।···ওমা দ্যাখো! তাই যেন করেন মা, সন্ধ্যের বেলা কেন যে ভালো-ভালো কথাগুলো মুখ দিয়ে বের করাচ্ছেন তিনিই জানেন!"

কথা বলতে বলতেই ঘুরে ঘুরে কাজগুলো সারতে লাগলেন। আলো-জ্বালা,

তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া, দোরে দোরে জল ছিটানো। গরগরানিও চলছে মাঝে মাঝে—"সবগুলি আমার জন্যে রেখে দিয়েছে আজ দিন বুঝে। ঠাকুরপো এসেছে, একটু যে বসে গল্প করব—লালটেনটা পন্থের করে রাখে অন্যদিন, আজ তাও মার জন্যে ছেড়ে রেখেছে—শাঁকটাই না-হয় বাজিয়ে দে উঠে একবার…"

রমা বলল—"দিয়ে যাও, দিচ্ছি ফুঁ দিয়ে।…তুমি চুপ করলে কেন কাকা?"

"শোন কথা তোমার ভাইঝির, ঠাকুরপো!"—লালটেনের কাচ মুছতে মুছতে হাত থামিয়ে ঘুরে চাইলেন বৌদিদি।—"আমি ঘরে যাব, এনে হাতে তুলে দোব, উনি ফুঁ-টুকু দিয়ে উবগার করবেন—মা আর ঐটুকু পারে না।…না-হয় উঠে তামাকটাও সেজে দেয় তো; মাঠ থেকে তেতে-পুড়ে এল একটা মানুষ। আমার ছারা হবে না আজ, অনেক কাজ হাতে আমার…"

জিমূত বলে উঠলেন—"বাঃ, আমার কী দোষে এ সাজা—হুঁকো-তামাক বন্ধ!"

একটু হাসি উঠল। বৌদিদি বললেন—"তোমারই তো দোষ।…দোষ নয় ঠাকুরপো? খালি পড়া, পড়া আর পড়া—মেয়ে আমার বিদ্বান হবে, কাকার ভাইঝি বলে পরচে দিতে পারবে…"

"তাহলে তো দোষটা শেষ পর্যন্ত আমারই দাঁড়াচ্ছে দেখছি।"—বড় ভাজ, দাদার সামনে আরও কম জবাব দেয়, কিন্তু এ-জবাবটার লোভ সামলাতে পারল না তড়িৎ। হেসেই বলল। বৌদিদি আবার হাত থামিয়ে, এবার একটু বিস্মিত হয়েই ঘুরে চাইলেন; প্রশ্ন করলেন—"তোমার দোষ!"

"আমার পথ ধরিয়েই রমার যখন এমন মতি-গতি…"

"ওমা, কিরকম বেঁকিয়ে মানে করবার অব্যেস ভাখো—এক-ই ঝাড় তো!"

দুই ভাইয়ের মধ্যে একটু হাসি পড়ে গেল। তড়িৎ রমার পিঠে হাত দিয়ে বলল—"যা তো মা, ওঠ্ একটু, আমি গল্প বন্ধ রাখছি। কালি-ঝুলির হাত, দেরি হবে বৌদির। শাঁকটাও বাজিয়ে দিবি অমনি।…তামাকটা না-হয় আমিই সেজে আনব দাদা? আগে তো আমারই কাজ ছিল, দেখি হাতটা এখনও ঠিক আছে কিনা…"

"আর হাত ঠিক থেকে কাজ নেই"—লালটেনটা জেলে কাঁচ পরাতে পরাতে বললেন বৌদি—"যা বিদ্যে, বাবার জন্যে হাত ঠিক করতে-করতেই ঐ একজনের নিজের অব্যেস দাঁড়িয়ে গেছে…"

জিমূত বললেন—"ছেড়ে দাও তড়িৎ, তোমার বৌদির হাত-ই যখন সবার চেয়ে বেশি ঠিক আছে।"

প্রচ্ছন্ন রসিকতাটুকুতে তিনজনের মুখেই একটু হাসি ফুটল, তড়িৎ অবশ্য মুখটা ঘুরিয়ে নিল একটু।

রমা উঠে গিয়েছিল, যাতে একটুও গল্প না করে তার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়ে; শাঁক বাজিয়ে তামাক সেজে নিয়ে এল বাপের জন্য। চা-জলখাবারের পাট পর্যন্ত সেরে বৌদিদিও এসে বসলেন। এক ঝোঁকে গল্প হোল, কিরকম দেশ, কোথায় আছে, কেমন লোক তারা। একসময় উঠে রান্নাটা সেরে নিলেন তমালিনী। তড়িৎ-ই সংক্ষিপ্ত করতে বলল—ট্রেনের ধকল গেছে, তারপর প্রায় সমস্ত দিন গোরুর গাড়ি। আহারের পর কিন্তু নিশ্চিন্ত আসরে গল্প উঠল জমে। সবই আস্তে আস্তে আপনিই যেন বেরিয়ে আসতে লাগল রাত্রির স্তব্ধতার অপরূপ মায়ার মধ্যে—অখিলদাদার পরিবার—ওদিকে দেবপ্রসন্ন, নলিনাক্ষ, শেষের দিকে হুডরু, জোনহা, রাঁচি পাহাড়, মোরাবাদী পাহাড়, ওদের পুণ্যিপুকুর, আকস্মিকভাবে আদিবাসী মুকরুর বাড়ি গিয়ে পড়া-ও। তড়িৎ শুধু সযত্নে বাদ দিয়ে গেল রিক্শার অংশটা, আর বাদ দিল রতি আর মল্লীকে—সুতপা আর অতসী আপনিই বাদ পড়ল।

একসময় গ্রামের চৌকিদার নটাই সামন্ত এসে হাঁক দিল সাড়া নেওয়ার জন্য। উঠানের মাঝখান থেকে সজাগ উত্তর শুনে বলল—"তা দা'ঠাকুর এখনও জেগে! দু'পহর গড়িয়ে গেল যে।"

"তোমার ছোট দা'ঠাকুর আজ এল যে সন্ধ্যেয়।"—জিমূত উত্তর করলেন।

"তাই নাকি! দেখি। কদ্দিন ছিচরণ দেখিনি যে। মানপুরের মান বাড়িয়ে যে আবার সেই বেরুলেন, সেই ইস্তক…"

ভেতরে এসে উঠানের মাঝখানে বসল। গল্প উঠল আরও জমে, হাতের তামাক পুড়ে গেলে আবার তামাক এল। নটাই যখন উঠল রাত তখন আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক এগিয়ে গেছে।

(বাইশ)

একনজরে চিনতে পারলেন না মাস্টারমশাইও; তবে রহস্যটা তাঁর কাছেই পরিষ্কার হোল।

সকালে মুখ-হাত ধুয়ে সর্বপ্রথম তাঁর বাড়িতেই উপস্থিত হোল তড়িৎ। বাইরের ঘরের সামনে একটি পাকা রক, পাশ থেকে একটা কাঁটালগাছের ছায়া এসে পড়েছে,

মাস্টারমশাই মাদুর বিছিয়ে একখানা বই পড়ছিলেন, তড়িৎ গিয়ে পায়ের ধুলা নিয়ে দাঁড়াতে মুখ তুলে একটু ঠাহর করে বললেন—"চিনতে পারছি না তো বাবা তোমায়। ...দাঁড়াও, আমাদের তড়িৎ নয় তো!"

তড়িৎ একটু হেসে বলল—"আমিই স্যার। কি হয়েছে বলুন তো? অবশ্য অনেকদিন আসিনি, কিন্তু তাই বলে গ্রামের পর হয়ে যাব? দাদা, বৌদি, রমা কেউ চিনতে পারেনি।

একটু হাসলেন মাস্টারমশাই; বললেন—"বোসো, সত্যিই অনেকদিন দেখিনি তোমায়। কখন এলে?...বোসো, বোসো।"

চারিদিকে রাশিখানেক বই, গোছানো আবার ছড়ানোও, কতকগুলি একপাশে সরিয়ে জায়গা করে দিলেন। তড়িৎ যত্ন করে আরও কিছু বই সরিয়ে জায়গাটা বাড়িয়ে নিয়ে বসতে বসতে বলল—কাল সন্ধ্যায় এলাম স্যার। হ্যাঁ, এবারে একটু বেশি দেরি হয়ে গেল, অনেক দূরে গিয়ে পড়েছি তো। শুনেছেন বোধ হয়, রাঁচিতে রয়েছি আমি এখন।"

"শুনেছি জিমূতের মুখে। টুইশনি করে এম. এ. পড়ছ। শুনলাম ফিলজফি নিয়েছ।"

একটু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতেই চাইলেন, যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা হয়েছে। তড়িৎ একটু নিরুত্তরই রইল, তারপর কতকটা লজ্জিতভাবে মুখ তুলে চাইল।

মাস্টারমশাই বললেন—"আমি জানতাম লিটারেচারে টেস্ট্ তোমার, সেইদিকেই যাবে। নেহাত যদি মনে করো ইংরিজীর কদর উঠে যাচ্ছে, হিস্ট্রি নেবে হয়তো। তুমি যে ফিলজফি নিয়ে বসবে..."

তড়িৎ একটু ব্যথিত কণ্ঠেই বলল—"জীবনের প্রতিকূলতার সব সময় তো নিজের মনের মতন ক'রে..."

হো-হো করে হেসে উঠলেন মাস্টারমশাই, পিঠে হাত দিয়ে বললেন—"এই ছাখো, already a full-fledged Philosopher! (এরই মধ্যে পুরোপুরি দার্শনিক হয়ে উঠেছে!)—জীবনের প্রতিকূলতাকে অত নাই দিলে চলে? কবির 'খরবায়ু বয় বেগে' গানটা মনে আছে তো? একটা ভালো লক্ষণ—গানটা বাংলায় খুব পপুলার হয়েছে—ঐ খরবায়ুর মুখে নোঙর খুলে নৌকাকে নিজের পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তবেই তো..."

হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে বললেন—"এই ছাখো, একেই মাস্টারী বুদ্ধি বা মাস্টারী রোগ

বলে। এতদিন পরে এলে, কোথায় ছুটো ভালো-মন্দ কথা জিগ্যেস করব, না, একরাশ উপদেশের বোঝা…"

"আমার পক্ষে এর চেয়ে ভালো আর কি হবে স্তার ?"

"But all in good time—সব কিছুর একটা সময় আছে, তড়িৎ, মাস্টারী বুদ্ধিতে তা বুঝতে দেয় না'।" একটু হাসলেন ; বললেন—"উপদেশের ভাঁড়ারই তো আমরা, সঙ্গে কিছু দিয়ে দোব'খন…হাঃ—হা—হা।"

কোন কারণে একটা যে ব্যথার জায়গায় হাত পড়ে গেছে বুঝতে পেরেই তাড়াতাড়ি কথার মোড় একেবারে ফিরিয়ে দিলেন মাস্টারমশাই ; বললেন—"কেমন আছ বলো। তোমায় দেখে সত্যিই বড় আনন্দ হোল, তড়িৎ। অনেক কথা ভিড় করে আসছে।… হ্যাঁ, আগে একটা কথা বলে নিই, একটা কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়ে নিই তোমায়, অবশ্য ইংরিজী মতে কম্‌প্লিমেণ্ট—বাংলায় বলবে 'খোঁড়া' ; সবল আর দুর্বল জাতের মধ্যে একটা প্রভেদ থাকবে তো।"

হাসতেই লাগলেন। তড়িৎ কিছু বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করল—"কি কম্‌প্লিমেণ্ট স্তার ?"

"তোমার স্বাস্থ্যটি চমৎকার হয়েছে, দেখবার মতন, I am proud of it (আমি গৌরব বোধ করছি)। তখন তুমি যে বললে বাড়ির কেউই চিনতে পারেনি দেখেই, তার কারণ এই। চিনতে পারত, সে যদি সাধারণভাবে বাঙালীর স্বাস্থ্যোন্নতি অর্থে যা বোঝায় তাই হোত তোমার—যদি হাত-পায়ে, বুকে-পেটে প্রচুর মেদ হয়ে দিব্যি গোলগাল নধর-কান্তি হয়ে আসতে তুমি। জান তো, ঐ 'নধর-কান্তি' কথাটা আমাদের কত প্রিয়—কিন্তু তা তুমি হওনি। তোমার হাত-পা, বুক-পিঠের মাস্‌ল্‌ দেখলে মনে হয় তুমি স্বাস্থ্যের অনুশীলন করেছ রীতিমতো—আর সব বাঙালী যুবকের মতন লাবণ্যের নয়, অবশ্য আল্‌টিমেট্‌লি এই রকম স্বাস্থ্যই হচ্ছে লাবণ্য, বিশেষ করে পুরুষের পক্ষে…"

প্রিয়ছাত্র অনেকদিন পরে পেয়েছেন, তায় এই ভাবে, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। বোধহয় আত্মসংবরণ করবার চেষ্টাতেই একটু থেমে গেলেন কিন্তু আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—"আমার এক এক সময় কি মনে হয়েছে জান তড়িৎ ?—বলেই দিই তোমায়, মনে হয়েছে, তোমায় যেন যথেষ্ট আশীর্বাদ করা হয়নি আমার—I feel, I have not blessed you to my heart's content. আজ বিশেষ করে তোমার এই অনুশীলন লব্ধ সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে—তার সঙ্গে ছাত্রের যা তপস্যা তা তো চলছেই…"

বাঁ হাতে ভর দিয়ে দৃষ্টি নত করে শুনছিল তড়িৎ, হঠাৎ ছলছল চোখ দুটো তুলে ধরল, যেন চেষ্টা সত্বেও উঠে গেল দৃষ্টিটা। মাস্টারমশাই উৎসাহের মুখে একেবারে যেন নিভে গেলেন, অপ্রতিভভাবে প্রশ্ন করলেন—"ওকি তড়িৎ, তুমি কি সত্যিই মেয়েদের মতন ভাবলে খুঁড়ছি তোমায়? তাহলে তো বড় অন্যায় করে ফেলেছি!"

আঙুলের টানে চোখের জল ঝরিয়ে দিতে হোল তড়িৎকে; বলল—"না স্যার, ভগবান যখন আমাদের আশীর্বাদ করেন, তাঁর অসীম দয়ার জন্য তিনি হয়তো মনে করেন কণামাত্রই দিলাম, কিন্তু তা আমাদের পক্ষে যে কী বিপুল..."

থেমে একটু সামলে নিতে হোল, তারপর আবার বলল—"যার জন্যে আপনার আজ কম্প্লিমেণ্ট পেলাম স্যার, সেটাও পেয়েছি আপনার আশীর্বাদেই, আপনার শিক্ষার প্রেরণাতেই...শুধু..."

আশীর্বাদে-প্রশংসায় মনটা বড়ই উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ইচ্ছা হচ্ছে বলে রিক্শার কাজটা,—আত্মসম্মানকে মাথায় ক'রে, ভ্রান্ত আত্মমর্যাদাকে পায়ে পিষে কি ক'রে জীবন-যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সেই সঙ্গে অন্যদিকে বিফলতার কথাটাও ব'লে নূতন করে তার আশীর্বাদ চেয়ে নেয়—এই যে বিদ্যা-অর্জনের নামে বিরাট ফাঁকি—যা তার মনটাকে ক'দিন থেকে এত বিচলিত করেছে।...প্রাণটাকে একেবারে মেলে ধরতে ইচ্ছা করছে গুরুর পায়ের কাছে।

একটু যে দ্বিধা হোল, তাইতেই কেমন যেন তাল কেটে গেল, আর বলা হোল না; শুধু কথাটাকে খানিকটা পূর্ণতা দেওয়ার জন্য বলল—"সে কেমন করে, একদিন হয়তো বলতে পারব স্যার, আজ ক্ষমা করুন।"

মাস্টারমশাই পিঠে হাত দিলেন; বললেন—"তাই বোলো তড়িৎ, and if you feel like it (যদি তেমন ইচ্ছা হয়)। আমার তাড়া নেই। First attain perfection and then I shall hear the history of it (পূর্ণতা লাভ করো আগে, তারপর সমস্ত ইতিহাসটা শোনা যাবে)।

দু'দিকেই উচ্ছ্বাস, মন গুছিয়ে নিতে একটু দেরি হোল। বইয়ের দুখানা পাতা ওলটালেন মাস্টারমশাই, তারপর হঠাৎ চোখ তুলে বললেন—"এই ছাখো, এতদিন পরে এলে, একটু যে চা-জলখাবারের কথা বলব, খেয়ালই নেই, শুধু বসে বসে বাঙালী মেয়েদের দোষ ধরছি, যারা নাকি অন্তত এ-ত্রুটিটা কোনমতেই হতে দিক না।"

মেয়েকে ডেকে তাড়াতাড়ি বলে দিয়ে, ঐ হালকা সুর টেনেই বললেন—"তুমি যেন

মনে করে বোসো না, অনেক দিন বাইরে থেকে পর হয়ে গেছ বলে ভুলটা হোল। খুব আপনাকে কাছে পেলেও যে এটা হয়, আরও বেশিই হয় এটা বিশ্বাস করো তো?"

হাসতে লাগলেন; বললেন—"নাও এবার তোমার রাঁচির গল্প শুরু করো শুনি। We were getting sentimental (আমাদের বড় ভাবালুতা এসে পড়েছিল), কাজের কথা নয়।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত গুরু-শিষ্যে আলাপ-আলোচনা হোল, নানা বিষয়েই। সেন্টিমেন্ট কি বাদ দেওয়া যায় একেবার? পায়ের ধূলা নিয়ে উঠবার সময় তড়িৎ বলল— "আশীর্বাদ করুন স্যার, বিদ্যা-অর্জনটা কোনসময় সত্যিই যেন তপস্যা করে তুলতে পারি।"

একটু বিস্মিত হয়ে চাইলেন মাস্টারমশাই; বললেন—"ঠিক বুঝলাম না। করছই তো তপস্যা তড়িৎ, তোমার মতন আর কে করছে?"

"না স্যার, এ যেন মনকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। আপন মনের প্রবণতা মেনে নিয়ে পড়া, —যাতে পড়াটা আন্তরিক হয়ে ওঠে, সত্যি হয়ে ওঠে, সেটা তো হ'তে পেল না; তাই..."

"ও, তুমি সাহিত্য-ইতিহাস পড়ার কথা বলছ, যাতে তোমার ঝোঁক ছিল?"

একটু বিরতি দিয়ে হঠাৎ যেন একটু ভয়ের ভাব দেখিয়েই বললেন—"তাহলেও কিন্তু তুমি দর্শনের চর্চা ছেড় না বাপু...এই ছাখো-না, চিনবে তুমি!"

খবরের কাগজের মলাট-দেওয়া যে মোটা বইটা পড়ছিলেন, মাঝামাঝি এক জায়গায় আঙুল সাঁধ করিয়ে হাতেই মুড়ে রেখে গল্প করছিলেন, খুলে সামনে ধরলেন। লেখা রয়েছে—Critique of Pure Reason।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক Kant-এর নাম-করা-বই। একটু যে আত্মবিরোধ হোল, আগের কথার সঙ্গে যে অসামঞ্জস্য, তার জন্যে কপট ভয়ের ভাবটা ঠেলে একটু কৌতুক-হাসি ফুটল মুখে।

তারপর গম্ভীর হয়েই বললেন—"জীবন-প্রশ্নের একেবারে গভীরে নিয়ে যেতে এমন জিনিস আর নেই, তড়িৎ।"

একটু যেন চিন্তায় তলিয়ে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন, তারপর আবার সেই হাসিটুকু ধীরে ধীরে ফুটে উঠল মুখে, ফিরে চেয়ে বললেন—"তবে, একটু বড় হয়েই পোড়ো, সেই কথাই বলছিলাম তোমায় তখন।...অতিরিক্ত moody আর reflective (বিমর্ষ আর চিন্তাপ্রবণ) করে দেয়, Shakespeare অত ভাবায় না। ছাখো না, তুমি আসবার আগে পর্যন্ত কোন্ অতলে যে ডুবিয়ে নিয়ে গিয়েছিল!"

জোরেই হেসে উঠলেন।

(তেইশ)

মাস্টারমশাই এখানকার হাইস্কুলের হেডমাস্টার, নাম কৃপাশঙ্কর আচার্য। সেকেলে মানুষ ; অনেকরকম অর্থেই সেকেলে।

প্রথমত অনেক বয়স হয়েছে, জন্মতিথি ধরে পঁয়ষট্টি বছর পেরিয়ে গেছে। সবল সুস্থ দেহ, একটু স্থূল। গোল ছাঁটের পুরন্ত মুখ, চোখ দুটি ভাসা-ভাসা, সদাপ্রসন্ন, মাথায় একটি প্রশস্ত টাক থেকে সেই প্রসন্নতাটুকু যেন আরও উদার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দেখাই গেল, হাসেন একটু বেশি।

কিন্তু আসল সেকেলে উনি অন্য অর্থে ; বিদ্যাবত্তায়। মাস্টারমশাই সেই এন্‌ট্রেন্স যুগের মানুষ। যে বছর থেকে ম্যাট্রিকুলেশন প্রবর্তিত হোল তার আগের বছর এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বসেন। অঙ্কে কাঁচা, আর সব বিষয়ে প্রথম বিভাগের মার্ক তুলেও, পাস করতে পারলেন না। ম্যাট্রিকুলেশন না জানি আরও কি ভয়ানক ব্যাপার হবে ভেবে, প্রথম বছরটা পরীক্ষা দিলেন না। তার পরেও যে আর দিলেন না, তার কারণটা অনেক পরে উত্তর-জীবনে ব্যক্ত করেছিলেন, হাসির মধ্যেই ; বলেছিলেন—"সেই অঙ্ক একেবারে এত হালকা করে দিলে, মনে হোল যেন ঠাট্টা করছে, বিশেষ আমাকে নিয়ে, আর আমার মতন যারা নিরঙ্কুশ। কেমন একটা জিদ ধরে গেল, আর দোবই না পরীক্ষা।"

জিদটা ওঁর চরিত্রের একটা বড় অঙ্গ।

বাড়ির অবস্থা তত খারাপ ছিল না, অন্য কিছু করবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, কিন্তু পড়াশুনার দিকে ঝোঁক, স্কুলে নিম্নস্তরের শিক্ষকতার চাকরি নিলেন, পরীক্ষার মার্কগুলা সহায়তা করল ওঁর। সে-যুগে এসব চলত।

চলত বলে, ধাপে ধাপে উঠে আসতে আসতে একসময় স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারের পদে এসে পৌছালেন। অবশ্য চাকরিতে প্রবেশ করবার প্রায় আঠারো বছর পরে। তখন তাঁর নাম-ডাক বেরিয়ে গেছে চারিদিকে, বিশেষ করে ইংরাজী সাহিত্যে ; সাহেব ইনস্‌পেক্টর ছেলেদের সঙ্গে বেঞ্চে বসে ওঁর লেকচার শুনে করমর্দন করে গেছেন।

হেডমাস্টারি করছেন আজ ত্রিশ বছরের ওপর।

হেডমাস্টারিতে প্রবেশ অবশ্য অতটা সহজ হয়নি। তখন সার্টিফিকেটের যুগটা ভালোরকম এসে গেছে, এসব পদের জন্য বেড়েছেও তাদের সংখ্যা ; হেডমাস্টারের পদ যখন খালি হোল, উনি যে এগুবেন শুধু-হাতে এ-কথা কেউ ভাবেনি, কাউকে বলেননিও

উনি। তারপর যখন দরখাস্ত বাছাই সুরু হোল, দেখা গেল—পঞ্চান্ন জন বি. এ., বি. এস্‌সি., এম. এ., এম. এস্‌সি., বি. টি. ডিপ. এড্.-এর মধ্যে কৃপাশঙ্করেরও একখানি নিঃস্ব নিরলঙ্কার দরখাস্ত রয়েছে।

একটি সমস্যা সৃষ্টি হোল স্কুল-কমিটির পক্ষে। বিধি-বিধানের এত যখন কড়াকড়ি তখনও যে কৃপাশঙ্কর এই পথ অবলম্বন করবেন এর জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতেও বিলম্ব হোল না। জমিদারী স্কুল, বরাবর একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছে, চায়ও সে-ধারা বজায় রাখতে। তার ওপর যিনি প্রেসিডেন্ট, তিনি কৃপাশঙ্করের ছাত্র; তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, যে সেক্রেটারি সেও ছাত্র; কয়েকজন মেম্বারও; ঠিক হোল যে সাতজনকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়েছে তাঁদের সঙ্গে ওঁকেও রাখা হোক।...ফল সম্বন্ধে তো সবাই নিশ্চিন্তই।

এরপর সমস্যাটা দাঁড়াল শ্রদ্ধার; মাস্টারমশাইয়ের ইণ্টারভিউ নেবে কে, ছাত্রেরা কি করে গুরুর পরীক্ষকের আসন গ্রহণ করবে?

প্রেসিডেন্ট কাউনসিলের মেম্বার, প্রচুর প্রতিপত্তি, একেবারে ওপরওলাদের সঙ্গেও দহরম-মহরম, ব্যক্তিগত প্রভাবের জোরেই একটা ব্যবস্থা করলেন। যাকে বলা যায় একটি চমৎকার ভাঁওতা,—সাক্ষাৎকারের জন্য বাইরে থেকে লোক আসুক, চেয়ারম্যান থাকবেন স্বয়ং বিভাগীয় ইনস্‌পেক্টর। মানপুরের হেডমাস্টার নির্বাচন একটা চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হয়ে উঠল।

কিন্তু খুব বেশি চাঞ্চল্যকর হওয়ার আগেই, হঠাৎ চাপা পড়ে গেল। চাপা দিতে হোল ওদিক থেকেই। ব্যাপারটা এগুতে দিলেই অনেকগুলি বিধি-নিষেধের সম্মুখীন হতে হবে, অথচ প্রেসিডেন্টের বিপুল প্রভাব, চারিদিক সামলে ওঠা দুষ্কর হয়ে পড়বে, একটা আন্দোলনই সৃষ্টি হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত,—সব ভেবেচিন্তে একেবারে ওপরের সম্মতি নিয়ে বিভাগীয় ইনস্‌পেক্টর মাঝপথেই নিষ্পত্তি করে দিলেন। ইণ্টারভিউ হোল না। কমিটি স্বপক্ষে, তাঁদেরই সুপারিশমতো কৃপাশঙ্করের নিয়োগ মঞ্জুর করে নেওয়া হোল।

তারপরেও উঠেছে কথা মাঝে মাঝে—বয়স নিয়ে। আটকায়নি। মাস্টারমশাই তাঁর সেকেলে পদ্ধতিতে ছাত্রগোষ্ঠী সৃষ্টি করে যাচ্ছেন—জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, প্রফেসার, ডাক্তার, শিল্পী, সাহিত্যিক;—এক অনুপ্রেরণা, বিভিন্ন মুখে উন্মেষ।

তড়িৎকে নিয়ে একটা বড়রকম আশা রাখেন।

তড়িৎ অনুপ্রেরণা নিয়ে চলছিল, তারপর এই আত্মজিজ্ঞাসা এসেছে মনে, সন্দেহ উদয় হয়েছে, সত্যিই কি সজীব ছিল প্রেরণাটা?

হিসাব করে দেখল, যতই এগিয়েছে, সে-প্রেরণা যেন হারাতে-হারাতেই এগিয়েছে। হিসাব করে দেখল, স্কুলের জীবন পর্যন্ত, অর্থাৎ যতদিন কাছে ছিল, ততদিনই সে প্রেরণা ছিল মূর্ত, তারপর হয়তো উদ্যমের দিক থেকে কিছুটা কার্যকরী থাকলেও, আহরণের দিক থেকে, অর্জনের দিক থেকে, সে প্রেরণা দুর্বল হয়ে এসেছে তার জীবনে। ওর মনে হোল ওর যা কিছু প্রকৃত সঞ্চয় গভীরতার দিক দিয়ে, বিস্তারের দিক দিয়েও, তা স্কুল পর্যন্ত। ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি পেল একটা ভালোরকম। মানপুর ছেড়ে, অর্থাৎ আই. এ. থেকে কিন্তু ওর জীবনের দিক্‌চক্র সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ হয়েছে—হয়তো বহিঃ-সংগ্রামের জন্যই, কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের মন্ত্র যে হৃদয়ে ধারণ করে, সংগ্রামেই তো তার আরও বিকাশ। তা হয়নি। সস্তায় বাজিমাতের নেশায় ধরল, নোট এসে পড়ল, কোনরকমে প্রথম বিভাগে বেরিয়ে এল তড়িৎ। বি. এ.-তে অনার্সটা প্রায় হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, বেশ নীচুর দিকে একটা সেকেণ্ডক্লাস জুটল কোনরকমে।

এমন করে এদিককার জীবনের হিসাব নেওয়ার অবকাশ হয়নি এর আগে, একলা থাকলেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। এক এক বার মনে হয় এর ওষুধ আছে মাস্টারমশাইয়ের কাছে। প্রবল ইচ্ছা জেগে ওঠে, যে-জীবনটা চলেছে, মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্বটা ঠেলে উঠছে, তার সমস্ত খুঁটিনাটি-সুদ্ধ জানিয়ে ওঁর নির্দেশ চেয়ে নিই; রিক্‌শা, ওদিকে আভিজাত্যের সঙ্গ, এদিকে পড়া ছেড়ে দেওয়ার যে সংকল্পটা উঠছে মনে মাঝে মাঝে, গাড়িতে আসতে যা-সব দেখল, তার ওপর ওর মনের প্রতিক্রিয়া,—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলে সব। কিন্তু প্রায় মুখ খুলতে গিয়েও আটকে আটকে যাচ্ছে। মাস্টার-মশাই নিতান্তই তেমন অবস্থা না হোলে এগিয়ে কিছু বলেন না, উপদেশ বা পরামর্শ হিসাবে; ওঁর আচরণ থেকে, ওঁর জীবনের দৃষ্টান্ত থেকে ওঁর যা অভিপ্রেত, ওঁর মতে যা কল্যাণ সেটা চয়ন করে নিতে হয়। তাই করে এসেছে তড়িৎ। বলতে গেলে হয়তো ভাবালুতা বলে হালকা করে দেবেন, নিরস্তই হতে বলবেন; সুস্থ, সুপরিকল্পিত সংকল্প আর নিছক ভাবাবেশের মধ্যে প্রভেদ ঠিক করা বড় কঠিন; মনে হয় নাকি রিক্‌শা আর পড়া-ছেড়ে-দেওয়া এই দুটার মধ্যে এসেই পড়েছে সেই ভাবাবেশ?

মানপুরে এসে এমনি ভালোই আছে। সময়টা বাড়ি আর মাস্টারমশাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে। বৌদিদি ব'সে বা চলাফেরার মধ্যে কাজ করেন, তার মধ্যেই দেওর-ভাজে নানারকম গল্প হয়, ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হয়। কখনও বা রমাকে পড়ায়, হালকা-গম্ভীর ভাবে ভাইঝির সঙ্গে একরকম পড়া-পড়া খেলা; রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চারজনেই একসঙ্গে বসে উঠানে, গল্প চলে, রাত হয়ে যায়। বিকালটা

কাটে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে, তাঁর স্কুল থেকে ফেরার পর। ওখানেই চা-জলখাবার শেষ করে স্থঁতির ধারে বেড়াতে যায়; গুরু-শিষ্যে প্রাণ খুলে আলাপ-আলোচনা চলে, সাহিত্য নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, শিল্প নিয়ে, সৌন্দর্য নিয়ে—বিরাট জলতটে এসে মনটা এতই প্রশস্ত হয় পড়ে, জীবনের কোন-কিছুই বাদ যায় না। প্রায় সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েন মাস্টারমশাই, ওর জীবনেরও সেন্টিমেন্টের গোপন দিকটা খুলে ধরতে প্রায় লুব্ধ হয়ে ওঠে তড়িৎ।

একদিন বললেন—"জানো তড়িৎ, তোমাদের এই ডি. ভি. সি. অর্থাৎ দামোদর ভ্যালি করপোরেশন আমার আয়ু শেষ করবার জন্যে এসেছে।"

"কেন স্যার!"—ব'লে বেশ বিস্মিতভাবেই ঘুরে চাইল তড়িৎ। মাস্টারমশাই একটু হেসে বললেন—"এ স্থঁতিটা মরে গেলে আমিও মরে যাব, তড়িৎ। বর্ধমান থেকে আসতে দেখলে তো দামোদর আর নেই, শুধু গহ্বরটা পড়ে রয়েছে। প্রথম যেদিন দেখি ওর সেই কঙ্কাল, আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমার কি মনে হয় জান? —ওর শত ভীষণতা নিয়েও দামোদর পশ্চিমবাংলার একটা গৌরব ছিল—ভাগীরথীর পরেই—প্রকৃতির অন্য এক রূপ নিয়ে। West Bengal is somehow the poorer for it (পশ্চিমবঙ্গ এর অভাবে কি করে যেন দীনতর হয়ে পড়েছে)।"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে আবার বললেন—"নতুন ক্যানেলে ক্যানেলে জল জুগিয়ে গতবছর এ পুরনো স্থঁতিটায় জল দিতে পারেনি দামোদর, দেখছো তো কত শুকিয়ে গেছে? বড় ট্র্যাজিক বলে মনে হয়—এ যেন নতুন সংসার পেতে বাপ তার আগের মেয়েকে ভুলে গেল। আমার কথা বলছি এই জন্যে, তোমরা হয়তো জান না, এই স্থঁতি হচ্ছে আমার আদ্দেক জীবন—আমি প্রতিদিন যা সঞ্চয় করি, সাহিত্য থেকে দর্শন থেকে, তা পূর্ণ হয় এখানে এসে। তাই মনে হয় স্থঁতির সঙ্গে আমার জীবনও যেন শুকিয়ে আসছে।"

চুপ করে সামনের দিকে চেয়ে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। প্রশস্ত, অর্ধচন্দ্রাকারে স্থঁতিটা সামনে পড়ে রয়েছে। মেয়ের ওপর দামোদরের কোন্ বার কিরকম স্নেহের ঢল নামবে, কী রূপ নেবে স্থঁতি, সেই ভয়ে বসতি খুব দূরে আর বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে, নীচু ব'লে ওপারটায়। তটরেখা থেকে আস্তে আস্তে বৃত্তাকারে উঠে তীরভূমিটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ—সবুজ শস্যে ঢাকা, বহুদূরে ছাড়া-ছাড়া কয়েকটি ঘর। কয়েকটি তালগাছ। আরও দূরে দিগন্তের নীল রেখা।

ছোট ছোট মেঘের গায়ে রঙের সমারোহ। স্থঁতির বুকে একটা দীপ্তি। সূর্যাস্ত হচ্ছে।

কথার অভাবে তড়িৎও সামনে দৃষ্টিপাত করে রইল, যে কথাটা মাস্টারমশাই বললেন সেটা বুকে নিয়ে। সত্যই সেও যেন একটা বিরাট মৃত্যুর সম্মুখীন, এমনি করে যেন আর একটি বর্ণাঢ্য সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে—আর উপায় নেই।

চোখের পাতা ভিজে এল নাকি ওর ?

তার আগেই মাস্টারমশাই ঘুরিয়ে নিয়েছেন কথা, বলছেন—"কিন্তু তাই হোক তড়িৎ, পুরনো রূপে মরে নতুন রূপে ফিরে আসুক দামোদর। এই রূপান্তরই তো শাশ্বত জীবন—ওর, তোমার, আমার, সবারই। নবযুগের জন্য পুরনো রূপ বদলাবে, সেই তো কল্যাণ। আমি দেখে এসেছি তড়িৎ, সেই ভয়ঙ্কর, উদ্দাম দামোদরকে আশ্রয় করে কী নূতন জীবন গড়ে উঠছে দিকে দিকে, কী উল্লাস, কী আশা! দামোদর আশীর্বাদ দিত, তার সঙ্গে প্রচুর অভিশাপও, এখন তার সবটুকুই আশীর্বাদ—প্রতি বিন্দুটি জল দিয়ে সে জাতির আশাকে করেছে সিঞ্চিত। শুধুই কি জল ? দিচ্ছে বিদ্যুৎশক্তি, নব নব শিল্প-নগরীর পত্তন করছে, তাকে আলো দিচ্ছে, উত্তাপ দিচ্ছে—নিজের দেশকে জগতের উন্নততম দেশের সঙ্গে…"

থেমে গিয়ে পিঠে হাত দিলেন তড়িতের, একটু হেসে বললেন—"ত্যাখো, আবার সেই sentimentality !"

হাসিটা একটু বাড়িয়ে বললেন—"আচ্ছা, তুমিই কি একটু বেশি sentimental হয়ে পড়েছ ? দেখছি, তোমার সংসর্গে এসে আজকাল আমিও যেন একটু হয়ে পড়ছি।"

এর চেয়ে বড় সুযোগ পাওয়া যাবে না, তড়িৎ যেন চোখ কান বুজেই সুরু করে দিল—"তা যদি বললেন স্যার, তাহলে জিগ্যেস করি—কেউ যদি নিজের আদর্শের জন্যে আর পরিবর্তিত জগতের সঙ্গে তাল রেখে…"

পিঠে হাতটা চেপে মাস্টারমশাই বললেন—"আর একদিন তড়িৎ, আজ আমরা একটু Keats পড়ব না ?—তালটা কেটে যাচ্ছে।"

(চব্বিশ)

দিন সাতেক কেটে গেল।

মাঝে মাঝে ঐ একটু অশান্তি ছাড়া ভালোই লাগছে। যেমন হয়ে থাকে, কাছের পরিবেশ দূরকে করে দিচ্ছে অস্পষ্ট, মানপুর-ই মনটাকে আস্তে আস্তে অধিকার করছে, রাঁচি তার সব সমস্যা নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

দুপুরের নিঃসঙ্গতায়, যখন নিজেকে নিয়ে পড়ে থাকা ভিন্ন উপায় থাকত না, তখনই অশান্তিটা দেখা দিত বেশি করে। সেটাও গেল, একজন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে মাস্টারমশাই তাকে ডেকে নিলেন পড়াবার জন্য।

আর একটা ব্যাপার হোল—

একদিন তিনজনে খেতে বসেছে, ঝুঁকে পরিবেশন করবার সময় কাঁধ থেকে আঁচলটা একটু সরে যেতে সেটা তাড়াতাড়ি সামলে নেওয়ার জন্য এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন বৌদিদি যে, সেদিকে আপনিই দৃষ্টিটা গিয়ে পড়তে যেন বাধ্য হোল, তিনজনেরই। সামলাবার আগেই তড়িৎ দেখে ফেলল, গলাটা খালি।

ওর সমস্ত গা-টা যেন হিম হয়ে গেল। মাঝখানে বসে ছিল, ডানদিকে দাদা, বাঁয়ে রমা,—ঠিক দেখা নয়, মুখ না ঘুরিয়েই অনুভব করল, দুজনেই যেন অপ্রতিভ হয়ে গেছে। সামলে নিল সে-ই আগে, তমালিনী ডাল পরিবেশন করছিলেন, বলল—"আমায় আর একটু দেবে, বৌদি।"

একটা হাসির প্রসঙ্গ চলছিল, হাসিটা ফিরিয়ে এনে সেই আবার সুরু করে দিল; যেন কিছুই বুঝতে পারেনি, তিনজনের পরিবর্তনটুকু লক্ষ্যই করেনি।

খাওয়া শেষ হোলে রমা তার স্কুলে চলে গেল। কাল বিকালে একপশলা ভালো বৃষ্টি হয়ে গেছে, ক্ষেতে জন খাটছে, তামাক খেয়ে পান হাত করে জিমূতও গেলেন বেরিয়ে। রান্নাঘরের পাট সেরে তমালিনী যখন এদিকে এলেন, দেখলেন তড়িৎ তখনও বিছানায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। একটু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করলেন—"তোমার আজও তো ইস্কুল আছে বললে না? শরীর খারাপ নাকি?"

তড়িৎ বলল—"না, প্রথম পিরিয়ডে কাজ নেই আজ।"

একটু হেসে বলল—"ছাখো না, দু'দিনের জন্যে এলাম, কোথায় একটু আরাম করব, না, মাস্টারমশাই এক বখেড়া লাগিয়ে দিলেন!"

তমালিনী বললেন—"তুমি গা না করলেই পারতে। সত্যিই তো বাপু..."

শরীর খারাপ সন্দেহে কপালে হাত দিয়েছিলেন, সেখানেই ছিল হাতটা, তড়িৎ হঠাৎ চেপে ধরল, মুখটা ঘুরিয়ে বলল—"তুমি মা'র মতন, বলতে দোষ নেই, আমি দেখে ফেলেছি, বৌদি।"

"কি!"

"তোমার গলার হারটা নেই।"

ভয়ে সঙ্কোচে তমালিনীর মুখটা এতটুকু হয়ে গেল, যেন কতবড় অপরাধ একটা

ধরা পড়ে গেছে। গলাটা শুকিয়ে যেতে সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও বেরুল না। তড়িৎ বলে চলল—"মাথায় হাত দিয়ে রয়েছ বৌদি, মিছে কথা বলতে পাবে না। তোমার হাতে চুড়ির সঙ্গে দু'গাছা রুলিও ছিল, কি হোল বলো।"

খানিকটা চুপ করেই রইলেন তমালিনী, বার দুই-তিন এদিক-ওদিক চাইলেন, যেন পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় খুঁজছেন, তারপর নিরুপায় হয়েই একবার ঢোঁক গিলে বললেন—"গত দু'বছরই তো অজন্মা গেল…তোমার দাদার দোষ নেই—উনি বলেন ক্ষেত-ই খানিকটা বেচে দিই—আমিই জিদ ধরে বসলাম—না, ক্ষেত একবার গেলে হয় না আমাদের ঘরে, তার চেয়ে বরং এক-আধখানা গয়না বন্ধক দিয়ে…"

"আর কি কি গেছে ?"

তমালিনী একটু রাগেরই ভাব এনে ফেললেন, মুখটা ভার করে বললেন—"কিচ্ছু যায়নি! দ্যাখো দিকিন কাণ্ড, দু'দিনের জন্য বাড়ি এসে যেচে অশান্তি ভোগ!"

হাতটা সরিয়ে নিতে যাচ্ছিলেন, তড়িৎ আবার চেপে ধরল; বললো—"না, বলতে হবে বৌদি, আমার দিব্যি রইল।"

"দ্যাখো তো জ্বালা! আর কি ছিল এমন যে যাবে?…আর একে তুমি যাওয়াই বা বলছ কেন ঠাকুরপো? বেচে খাওয়া হয়নি তো, দরকার পড়েছিল, একটু সামলে নেওয়া গেছে জমা রেখে। মা মঙ্গলচণ্ডী করুন, তুমি পাসটা দাও—আর দেবেও, আমার মন বলছে—তারপর আবার খালাস করে আনলেই হবে।…সোনা-দানা অসময়ে একটু কাজে না এলে করতেই বা যাবে কেন মানুষ বলো—শুধুই গায়ে লটকে থেকে তো ভারি উব্‌গার!"

ওপর-হাতে দু'গাছা তাগা ছিল তাও গেছে; দু'জোড়া কানের দুল, তার মধ্যেও একজোড়া।…

মাস্টারমশাইকেও জিগ্যেস করতে হোল—শরীরটা খারাপ নাকি?—যেন শুকনো, অন্যমনস্ক বোধ হচ্ছে তড়িৎকে!

তার পরদিন প্রথম দুটো পিরিয়ডের ছুটি নিয়েই এল তড়িৎ। তমালিনী কাল থেকেই ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন। খেয়ে-দেয়ে শুয়েই ছিল, অনেকক্ষণ হয়ে গেলেও আসেন না দেখে রান্নাঘরে গিয়ে দ্যাখে, ঘর নিপে-পুতে আর সব পাট সেরে, একটা গেলাস হাতে করে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তমালিনী—গেলাসটা নিয়ে কি করতে হবে যেন ঠাহর করে উঠতে পারছেন না। অন্যমনস্ক ছিলেন বলেই নিশ্চয় পায়ের শব্দ

শুনতে পাননি, ও দরজার সামনে দাঁড়াতে চকিত হয়ে উঠে বললেন—"ঠাকুরপো ?… আমি মনে করি চলে গেছ বুঝি ইস্কুলে।"

তড়িৎ বলল—"তোমার কাজ হয়ে গেছে বৌদি ? আসবে এদিকে একটু ?"

"এই এলাম।…জলটা খেয়ে নি'।…বড্ড গরম পড়েছে ভাই, এবারে যেন আরও বাড়াবাড়ি। কী যে হবে ?"

তড়িৎ বিছানায় বসে ছিল, তমালিনী এলে বলল—"বৌদি, কালকের মতন আর শপথ দিয়ে বের করতে যাব না, তোমার লাগে প্রাণে, কিন্তু তুমিও যেমন দেওরের কাছে কখনও কিছু লুকোওনি, আজও পাবে না।…কত টাকা নিতে হয়েছিল ?"

"শোন কথা! আমি মেয়েছেলে, সে-সব হিসেবের কথা কিছু জানি ?—কত আসল, কত তার সুদ…"

"লুকুচ্ছ বৌদি।"

একটু পরাজয়ের ম্লান হাসি হাসলেন তমালিনী ; বললেন—"লুকুতে যাব কি জন্যে ? হিসেবটা তো তোমার দাদার কাছেই।…তবে শুনেছি যেন সব মিলিয়ে একশো দশ টাকা হয়েছিল, আর সতেরো টাকা সুদ।"

"কোন্‌টের কত কত করে সুদ ?"

তমালিনী একটু ধমক দিয়েই উঠলেন—"জানিনে অত। কেন বল তো ? একজন ভাবছেই তো। তোমাকেও এইসব আজে-বাজে কথা মাথায় সাঁদ করিয়ে পাস-দেওয়াটা নষ্ট করতে হবে ?—যার ভরসায় নাকি এই করে কোনরকমে সামলে-সুমলে চলেছে গেরস্ত।…আমি জানিনে, জানলেও বলতে পারব না।"

ঘুরে চলে যাচ্ছিলেন, তড়িৎ হাত বাড়িয়ে আঁচলটা ধরল পেছন থেকে। তমালিনী বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে বলল—"এবার তাহলে আমায় দিব্যি দিতে হবে বৌদি।"

বেরুল কোন্ আদতে কত আসল কত সুদ, কার কাছে আছে বন্ধক, কোন্‌টে কতদিন হোল, সব। চৌকিতেই টেনে বসিয়েছিল তড়িৎ, শেষ হোলে পার্সটা পকেট থেকে বের করেছে, তমালিনী ভীত-ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেন—"ওকি! তুমি শোধে দেবে! না, সে হতেই পারে না।"

ছ'খানা দশ-দশ টাকার নোট বের করে নিল তড়িৎ ; বললে—"কেন, আমার টাকাতেই ওগুলো খালাস হবে বললে তো বৌদি। নাও, ধরো।"

"তোমার উপার্জন কোথায় এখন!"—হাত দুটো একটু কোলে টেনে নিয়ে বিস্মিতভাবে বললেন তমালিনী।

তড়িৎ হাত দুটো এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ওঁর হাত দুটো ধরে ফেলল ; বলল—"নাও বৌদি, আমি সব বলছি ; তারপর না নিতে চাও, ফিরিয়ে দিয়ো, আমি কথা দিচ্ছি, নিয়ে নোব।"

সম্মোহিত ভাবে ডান হাতটা খুলে দিয়ে মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন তমালিনী। নোট ক'খানা দিয়ে হাতটা মুড়ে দিয়ে তড়িৎ বলে চলল—"তুমি মায়ের তুল্য, তোমার কাছে মিথ্যে বলব না, আমার কিছু উপার্জন আছে, বৌদি। তার কারণ আর কিছু নয়, আমি যাঁর ছেলেমেয়েদের পড়াই, তাঁর ওখানে থাকি আর খাই। আর একটা উপার্জন আছে সেটা জমা হয় আমার, এটা-ওটা মাঝে মাঝে যা কিনতে হোল, তা ছাড়া সবটুকুই। এই সেই টাকা।"

মুখের দিকে চেয়ে রইল। তমালিনী নিরুত্তর রইলেন, যেন কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তারপর বললেন—"তা অত বেশি খাটুনির কি দরকার ? শরীরে সইবে ?"

"সইছে না ব'লে মনে হয় ?—" ব'লে হাত দুটো একটু ঘুরিয়ে ধরল তড়িৎ ; একটু হাসলও।

তমালিনী রাগ করলেন ; বললেন—"অলুক্ষুনে কথা! মস্ত পালোয়ান হয়ে এসেছেন আর কি।"

তড়িৎ বললো—"থাক, তোমার চোখে যখন কখনও হতেই পারব না। এখন যা বলছি শোন। এই টাকায় তোমার হার আর রুলি দুটো ছেড়ে গিয়ে গোটা আষ্টেক টাকা হাতে থাকবে। আমি চলে গেলে তুমি সেই টাকা দিয়ে রমাকে একটা শাড়ি কিনে দেবে। আমি চলে গেলে এইজন্যে বলছি, তোমায় রাজী করতেই যে বেগটা পেলাম, রমাকে দেওয়া নিয়ে দাদার জেরায় পড়বার মতো আর অবস্থা নেই আমার।"

"বেশ চমৎকার! আর সেই দাদার হাতে তোমার এই টাকা তুলে দোব আমারই গয়না খালাস করে আনতে ? আমার বুকের পাটা-টা মস্তবড় মনে করছ বুঝি ?"

একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যেন থমকে পড়ল তড়িৎ। তারপর একটু হেসে বললো—"সত্যিই তো। এই এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের মতন কথা বলছ বৌদি, তাহলে উপায় ?"

একটু ভেবে নিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল—"হয়েছে, দাও আমায়, আমিই নিয়ে আসছি ছাড়িয়ে।"

"তারপর ? টের পাবেন না বুঝি ? আমার তো সেই দশাই আবার।"

হাতটা বাড়িয়ে ধরে বললেন—"তার চেয়ে আমার বুদ্ধিই নাও আর একটু। ফিরিয়ে নাও টাকা, এসব মতলব এখন ছাড়ো। তোমাকেই তো ছাড়িয়ে দিতে হবে; আর বৌদির কি ঐখানেই আশা শেষ হয়ে গেছে? কিন্তু সে যখন সময় আসবে, তখন।...নাও ধরো।"

তড়িৎ টাকাটা নিয়ে বলল,—"সেও আমার ঠিক হয়ে গেছে। গয়না তুমি এখন গায়ে তুলবে না; রমার শাড়ি কেনা তো রইলই বাকি। আমি আগে ফিরে যাই রাঁচি, তারপর সেখান থেকে দাদাকেই একটা চিঠি দোব সব কথা জানিয়ে। তুমি নিশ্চিন্দি থাক, আমি কথা দিচ্ছি, এমন করে লিখব, দাদাই তোমায় ডেকে পরতে বলবেন গয়নাগুলো।"

রাঁচি যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অত ধৈর্য কোথায় তড়িতের? সেইদিনই ইস্কুলের ফেরত একেবারে মাঠে চলে গেল। সময়টা ছিল অনুকূল, ইস্কুলে থাকতে-থাকতেই আর এক পশলা বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে, দাদা অবশ্য চিরপ্রসন্ন ভাইয়ের ওপর, আরও স্নেহ-দ্রব কণ্ঠে ডেকে নিলেন কনিষ্ঠকে; বললেন—"আয় তড়িৎ, তোর কথাই মনে করছিলাম। তোর পয় আছে, আসার সঙ্গে সঙ্গে দু'পশলা উপরো-উপরি। কী যে হয়েছিল অবস্থাটা!"

আরও খানিকটা দ্রব করে নিতে বেগ পেতে হোল না। তারপর সব কথা বলল তড়িৎ।

আপত্তির কিছু বললেন না জিমূত। হুঁকো খাচ্ছিলেন, চোখ দুটি একটু ছলছল করে উঠল। বললেন—"হাতে যা জমিয়েছিলি সব দিয়ে দিচ্চিস হাত খালি করে? তা দে, আমি কেন কিছু বলব? আমি নিশ্চিন্দি ছিলাম, জানি বাবা-মা'র আশীর্বাদ আছে আমাদের ওপর, একদিন ফিরেই আসত গহনাগুলো। তুই-ই আনতিস ফিরিয়ে। তা কষ্ট হয় তোর বৌদির খালি গা দেখতে, যা ভালো বুঝিস কর্; আমি কেন বাধা দোব?"

(পঁচিশ)

ব্যাপারটা খুবই করুণ, গয়না বন্ধক দিয়ে খেতে হয়েছে। ওর দিক থেকে একটা গ্লানিও লেগে রয়েছে, খোঁজ করেনি দুটো বৎসর, রোমাঞ্চ নিয়ে মেতে ছিল।

কিন্তু আস্তে আস্তে কারুণ্যের দিকটা সরে গিয়ে একটা একটু সূক্ষ্ম তৃপ্তিই মনটাকে পরিব্যাপ্ত করে রইল।

গয়নাগুলা এনে হাতে তুলে দিতে তমালিনীর চোখ ছলছল করে ওঠার সঙ্গে ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও ফুটে উঠেছিল। দুইটি পাশাপাশি রয়েছে তড়িতের মনে, কিন্তু হাসিটিই বেশী স্পষ্ট হয়ে থেকে মনে একটা আত্মপ্রসাদ এনে দিয়েছে—এতদিনে জীবনে একটা কিছু যেন করতে পারল।

আরও দুটা দিন গেল।

সবই ভালো। মাস্টারমশাই, ইস্কুল, বাড়ি, স্ফূর্তির ধার—যা তার দেওয়ার সব দিয়ে মানপুর জীবনটা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তার ওপরও শেষের এইটুকু। বেশ ছিল তড়িৎ, কিন্তু আজ কোন্ একটা সময় থেকে মনটা যেন অকারণেই উদাস হয়ে পড়েছে। ঠিক বুঝতে পারছে না, তবে মনে হচ্ছে এই নিশ্ছিদ্র পূর্ণতার মধ্যেই কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে। আশ্চর্য একটা অনুভূতি। ধরা-ছোঁওয়া দিচ্ছে না, অথচ কিছু যেন একটা রয়েছেই—তার সূক্ষ্ম অবয়বে, তার মৌন আবেদনে তড়িতের সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন ক'রে।

ইস্কুলে যেতে ইচ্ছা করছে না। প্রথম পিরিয়ডটায় ছুটি ছিল, অন্যদিন বেরিয়েই পড়ে, আজ খেয়ে-দেয়ে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল, একটি ছেলে এসে বলল—মাস্টারমশাই অসুস্থ, আজ একটু সকাল-সকাল যেতে হবে।

দিনটাও যাচ্ছে খারাপ। মাস্টারমশাই অসুস্থ, মনটা ঐদিকে পড়ে রয়েছে, কিন্তু দুজন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে এমন হয়েছে, একবার গিয়ে যে দেখে আসবে তার উপায় নেই।

ইস্কুল বন্ধ হোলে সোজা ওঁর ওখানেই চলে গেল। বিশেষ তেমন কিছু হয়নি; বয়স হয়েছে; দু'দিন গরমের মধ্যে বৃষ্টি নেমে হঠাৎ যে পরিবর্তন ঘটল তাতে অসাবধানতায় ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে সকালের দিকে একটু জ্বরভাব হয়েছিল। তড়িৎ যখন গেল তখন সে-ভাবটা কেটে গেছে, বিছানাতেই বইয়ের গাদার মধ্যে বসে পড়েছেন। ও যেতে গল্প-সল্প আরম্ভ হোল। সন্ধ্যার সময় উনিই বাড়ি চলে যেতে বললেন, বরাবর এখানেই চলে এসেছে তো বাড়ি থেকে।

ওঁর ওখানে যতক্ষণ ছিল, গল্প-গুজবে অন্যমনস্ক ছিল, উঠে খানিকটা আসতে আসতে আবার সেই ভাবটা এসে মনটা অল্পে অল্পে জুড়ে বসল। সমস্ত সন্ধ্যাটিই মনে হোল আজ যেন বড় বিষণ্ণ, তাকে একা পেতে চায়, কিছু বলবার আছে যেন তার। মনের

রুদ্ধ কক্ষে—যেখানে সেই কি-যেন-কি কথাটা রটেছে, অবরুদ্ধ, তার চাবিকাঠিটা যেন এই মূক সন্ধ্যারই হাতে।

বাড়ির দিকটার দিকে মুখ ফিরিয়ে তড়িৎ সুঁতির দিকে চলল। খানিকটা ঘুরে ফিরে এসে যেখানে বসে দুজনে, সেইখানটায় গিয়ে বসল—টিলার মতো খানিকটা উঁচু জমি, দুটি তালগাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, এপার-ওপারের দুটি তীর ঢালু হয়ে সুঁতির জল পর্যন্ত পড়েছে নেমে।

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এল। তিথিটা শুক্লপক্ষের তৃতীয়া-চতুর্থী এইরকম কিছু হবে; ওপারের দিকচক্রের কোলে গ্রাম্য-বিটপীর নীল রেখার ওপর স্বল্পাবয়ব চাঁদটুকু জলজ্বল করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে, শুধু ওপার ঘেঁষে একটা নৌকায় মাঝি ভাটিয়ালি ধরেছে। তড়িৎ চাঁদকে কেন্দ্র করে সমস্ত দৃশ্যটুকু মনের মধ্যে জড়ো করে চুপ করে বসে রইল।

একসময় চাঁদটা সন্তর্পণে গাছের নীচে নেমে যেতে তড়িতের মনেও একটা পরিবর্তন এসে গেল ধীর সঞ্চারে। জ্যোৎস্নাটা পুরোপুরি যায়নি, তবে একটা ধূসর ছায়া নামল, তাইতে কে যেন মনের ওপর যাদুকাঠি বুলিয়ে সেটাকে বাইরের দৃশ্য থেকে টেনে নিয়ে অন্তর্মুখী করে দিল। প্রথমেই ফুটে উঠল বৌদিদির অশ্রু-ছলছল হাসি-হাসি মুখখানি। তারপর রমার, শাড়িটা হাতে করে নিচ্ছে। অশ্রু নেই, হাসিই, তবু কেমন যেন করুণই। তারপর দাদার—যখন সামনের দিকে দৃষ্টি ফেলে বলতেন—"তা দে, আমি কেন কিছু বলতে যাব?"—সবগুলিই করুণ, কিন্তু আশ্চর্য, একটা অদ্ভুত তৃপ্তিই জাগিয়ে রেখেছে তড়িতের মনে। দৃষ্টি ফেলে চুপ করে বসে রইল।

তারপর সন্ধ্যা সেই বন্ধ কক্ষের চাবি খুলল—

ত্রস্ত হরিণীর মতো একখানি মুখ—কী একটা অনিশ্চিত অশুভের আশঙ্কায় ব্যাকুল, কী একটা অব্যক্ত আবেদন তাতে। চিনতে দেরি হয়না, মল্লী; কিন্তু, এ-ভাবে কোথায় দেখা?…তারপর মনে পড়ল। দেখেছে, প্রিয়রতন যখন হঠাৎ আঘাতটা দিল তড়িৎকে …তারপর ঘুরে ঘুরে কয়েকবারই যে চোখাচোখি হয়ে গেল…তারপর বাঁশির শব্দে যখন ওদের দুজনকে টিলায় রেখে সে চলে দেল মুকুন্দর বাড়িতে…যখন আবার ফিরেও এল। সেই একই দৃষ্টি—ভীত, ত্রস্ত; তড়িৎ টের পেয়েছিল একমাত্র মল্লী-ই বুঝেছে যে তাদের বিচ্ছেদ ঘটল; প্রিয়রতনের দুটি কথায় ওদের দুটি জগৎ আলাদা হয়ে গেছে একেবারেই।

এত সবার মধ্যে একমাত্র মল্লী-ই বুঝল কি করে? একমাত্র ওর দৃষ্টিতেই আশঙ্কা ফুটে উঠল কেন?

আইঢাই করছে তড়িতের মনটা। কই, যতক্ষণ রাঁচিতে ছিল, কাছে ছিল, এমনটাতো হয়নি। বিচ্ছেদ যে ঘটল তা তো অনিবার্যভাবেই। এ কথাটা মল্লী কি বুঝতে পারেনি? বুঝতে পারেনি কি তাতে তড়িতের কতটুকুই বা হাত? কিন্তু কি যে হয়েছে, কোন যুক্তিই যেন আজ দাঁড়াতে পারছে না ঐ মিনতি-ভরা করুণ দৃষ্টির সামনে। কেবলই মনে হচ্ছে, কী ভুলই হয়ে গেল, কেন তড়িৎ এ-ভয়কে ওর দৃষ্টি থেকে সত্ত সত্ত মিটিয়ে দিল না, কেন আরও বাড়িয়েই দিল এই ব'লে যে সে বরং প্রিয়রতনের ওপর আরও কৃতজ্ঞই? মল্লীর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে, কথাটি ঘুরিয়ে নিলেও সে কি বুঝতে পারল না অর্থটা আসলে কি?

সে-রাত্রে গাড়ি থেকে নামবার সময় মল্লী মুখটা একটু বাড়িয়ে এনেই বলেছিল—"পরশু আবার আছে, রামগড় পাহাড়। মনে আছে তো?"—চোখ দুটি একসঙ্গে কত প্রশ্নয় ঠাসা!

তড়িৎ শুধু হেসে বললো—"মনে তো আছে···দেখি।

এইটেই শেষ চেষ্টা ছিল মল্লীর; শেষ মিনতি, যদিও মিনতির ভাষা নয়। উত্তরটার একটা চোট খেয়ে কোনরকমে যেন নিজের মর্যাদা বাঁচিয়ে মুখটা ভেতরে টেনে নিল। রাস্তার আলোয় চকিতে দেখা সে-মুখের ছবি কোনমতেই মন থেকে মুছে ফেলা যাচ্ছে না।

অসহ্য বোধ হচ্ছে। চেষ্টা করছে মনটা ঘুরিয়ে নিতে, পারলও খানিকটা. কিন্তু আবার সেই মল্লী-ই। রিক্‌শা নিয়ে সেই প্রথম পরিচয়ের অভিজ্ঞতা। সেই তীব্র ভর্ৎসনা-ভরা দৃষ্টি, সেই প্রশ্ন—"তাহলে বাঙালী-ই দেখছি···রিক্‌শা চালাচ্ছ যে!"··· তারপর আবার অনুতাপে ভরা বেদনাময় দৃষ্টি, সেই অনুরোধ—"মাফ করবেন। না, অন্যায় হয়ে গেছে। একটা অনুরোধ কি রাখবেন আমার? আসবেন আমাদের বাড়িতে?"···ওদের বাড়িতে সবার বৈঠকের মাঝে ও পরিচয় বাঁচিয়ে যাওয়ার জন্যে উদ্বেগ-ভরা সেই দৃষ্টি।···হুড্রু-প্রপাতে সেই অপরাহ্লটি—একলা বসে আছে তড়িৎ, মল্লী কখন এসে পেছনটিতে দাঁড়াল—সেই স্বল্প ক'টি কথা, জীবনের অপূর্ব সঞ্চয়···

বিদায়-দিনের আর্ত মুখখানি ভুলতে আবার সেই মল্লী-ই যেন চারিদিক থেকে ঘিরে নানা-রূপে এসে দাঁড়াচ্ছে।

মাঝির সেই গান আরও দূরে চলে গেছে, আরও ক্ষীণ। ভাটিয়ালি-ই, কিন্তু কি করে তাতে 'দেশ'-এর মীড় লেগে-লেগে যাচ্ছে। যেন কার জন্যে অন্ধ অনুসন্ধানে আকাশ-বাতাসে ছাড়িয়ে যাচ্ছে তার কান্না।

একসময় চৈতন্ত হোল চাঁদটা অনেকক্ষণ ডুবে গেছে, ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে স্থঁতির চারিধারে। উঠে পড়ল তড়িৎ।

যাদুকাঠিটা সত্যিই সন্ধ্যারই হাতে ছিল; সুতরাং ধারটাকেই তার দৃশ্যমঞ্চ করে নিয়েছিল সন্ধ্যা।

স্থঁতি ছেড়ে অন্ধকারে একটু পথ চিনে আসতে-আসতেই সবটা মন থেকে সরে গেল।…শুধু তাই নয়, কেমন যেন অদ্ভুত আর অশোভন বলে মনে হচ্ছে। সে আর মল্লী?…কোথায় আর কোথায়! মনে পড়ল দেবপ্রসন্ন একদিন ওদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ও বাপের একমাত্র সন্তান—মেয়ের সম্বন্ধে ওঁর খুব অ্যাম্‌বিশন (উচ্চাশা) আছে। একটা ধিক্কারও জেগে উঠেছে মনে, হয়ত চেষ্টা করা যায় নিজেকে ওঁর সেই অ্যাম্‌বিশনের জন্তে তোয়ের করে তুলতে। কিন্তু তা করতে হোলে নিজের সঙ্কল্প যে কি ভাবে বলি দিতে হয় ভেবে দেখেছে কি? একটা লঘু রোমান্সের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্যই কি গড়ে তুলল তার সঙ্কল্প,—আত্মমর্যাদার কথা দূরেই থাক।

এর পরে কঠিন, রূঢ় বাস্তবও সামনে এসে দাঁড়াল। আগে সদ্য সদ্য তাকে রিক্‌শার সময় বাড়িয়ে অখিলদাদার টাকাটা দিয়ে দিতে হবে তো। এ তো সঙ্কল্পের কথাও নয়, নিতান্তই ঋণ-পরিশোধ, অপরিহার্য প্রয়োজনের ব্যাপার।

মানপুরে তো কেটেও গেল অনেকদিন। সেই রাত্রেই দাদা আর বৌদিদিকে জানিয়ে দিল পরদিন রাঁচি যাবে।

(ছাব্বিশ)

রাঁচির বাড়িতে ঢুকতে প্রথমেই দেখা রুবির সঙ্গে। ও আর অলক বাইরে খেলা করছিল, রুবি দেখতে পেয়েই "তড়িৎদা এসেছেন! তড়িৎদা!"—বলে ছুটে এসে তার ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল; প্রশ্ন করল—"কে এসেছিলেন বলুন তো আমাদের বাড়িতে?" অলকও এসে পড়েছে, খবরটা দিতে তারই জিত হোল, তড়িৎকে আন্দাজের সময়ই না দিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে উঠল—"মল্লীদি!!"

ভেতরে গিয়ে সবটা শুনল।

চারদিন আগের কথা। সন্ধ্যা হতে খানিকটা বাকি আছে এমন সময়, রাঁচিতে এই সময়টা যেমন হয়ে থাকে, হঠাৎ আকাশ ছেয়ে মেঘ করে এসে উপশ্রান্তে বৃষ্টি

নামল। যখন প্রায় আধঘণ্টাটাক হয়ে গেছে, সন্ধ্যা প্রায় উত্তরে গেছে, একটা রিক্‌শা এসে বাড়ির দরজায় দাঁড়াল। রুবি আর অলক বাইরের বারান্দায় বসে বৃষ্টির ছড়া কাটছিল, ছুটে এসে খবর দিতে রুবির সঙ্গে সরোজিনী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দেখেন দুজন যে আরোহী তাঁরা ততক্ষণে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। একজন পুরুষ, বয়স্থ, একজন মেয়েছেলে। পুরুষ দেখে সরোজিনী একটু আড়াল হয়ে গেলেন। রিক্‌শাওয়ালাটাও বারান্দায় উঠে এসেছে, সরোজিনীর নির্দেশে রতি গিয়ে তাকে কারখানা থেকে অখিলকে ডেকে আনতে বলল।

ভিজে চুপ্‌সে গেছেন দুজনে। সরোজিনী মেয়েটিকে ডাকিয়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন, তাঁরই নির্দেশে রতি ভদ্রলোককে শুকনো কাপড় আর তোয়ালে এনে দিল। ততক্ষণে অখিলও এসে গেলেন।

ওরা মেয়েটির কাছেই সব শুনল চায়ের ব্যবস্থা করতে করতে। ওর নাম মল্লী, সঙ্গে যিনি তাঁর নাম বসন্তকুমার, হাজারীবাগের কোথায় ওকালতি করেন, দিন দুই হোল এখানে এসেছেন। মল্লীকে নিয়ে হিনুতে ওঁর একজন বন্ধুর বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আকাশে একটা হালকা মেঘ দেখে ওর বাবাই একটু জিদ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন—এদিককার আবহাওয়ার অতটা আন্দাজ নেই—ভাবলেন, তাড়াতাড়ি রিক্‌শা চালিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবেন, আসবার সময় ঘড়িত দেখেছিলেন কিছু বেশি লেগেছিল। আসতে-আসতেই ভুলটা বুঝতে পেরেও আর ফিরে গেলেন না, বললেন বৃষ্টি নামলে কোনখানে উঠে পড়বেন।

বৃষ্টি নামল এমন জায়গায়—দু'দিকেই ফাঁকা পোড়ো জায়গা, বসতি নেই। তখন এমন অবস্থা যে ফেরবার আর উপায় নেই, যাবেন যেখানে সে তো আরও দূর, জলের ঝাপটে আর ইচ্ছামতো এগুতে পারা যাচ্ছে না। এদিকে রীতিমতো ভিজে গেছেন দুজনে; রিক্‌শার সামনে অয়েলক্লথের একটা পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে বটে রিক্‌শাওয়ালা, কিন্তু ও বৃষ্টিতে তাতে আর কি হয়?

শেষকালে রিক্‌শাওলাই এখানকার কথাটা তুলল। খানিকটা ভেতরের দিকে গিয়ে একটা রিক্‌শার কারখানা আছে, বাঙালীর; তাঁর বাড়িও আছে কাছেই, যদি যান। রিক্‌শাটাও যে এখানকারই সে-কথাও জানিয়ে দিল।

সরোজিনীই গল্পটা বলছিলেন, রতি মাঝে মাঝে যোগান দিচ্ছিল। সরোজিনী যখন প্রশংসা করছিলেন—কী সুন্দর স্বভাব মেয়েটির—জেরা করে জানা গেল মেয়েদের কলেজে পড়ে, কনভেণ্ট্‌ বলে বুঝি, কিন্তু কথাবার্তায়, ব্যবহারে কে টের পাবে যে

কলেজের মেয়ে !—আর একটু শ্যামবর্ণ হোলেও কী সুন্দর মুখশ্রী ! কী গড়ন-পিটন !—যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে এইভাবে প্রশংসা করে যাচ্ছিলেন, রতি অনুরূপ মন্তব্য করছিল বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু তড়িতের মনে হোল কোথায় যেন একটু একটু বেধে যাচ্ছে।

মেয়েটিকে ভালো করে জানবার বোঝবার আর একটু সুযোগ হোল। বৃষ্টিটা ধরে এলে ওঁরা বেরুবার উদ্যোগ করছিলেন এমন সময় হঠাৎ আরও চেপে এল। রাত্রে আকাশের অবস্থা ঠিক বোঝা যায় না, মেয়েটি তবু একটু দেখবার চেষ্টা করে চিন্তিতভাবে বলল—"দাঁড়ান একটু, বাবাকে জিগ্যেস করে আসি কি করবেন।" বেরিয়ে যাচ্ছিল, বাইরে থেকে বিমল এসে জানাল—অখিল বলেছেন, ওঁদের দুজনের জন্যে তাড়াতাড়ি লুচি তরকারি করে দিতে, এখানেই খেয়ে-দেয়ে যাবেন।

আরও প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক রইলেন ওঁরা। একসময় অখিল এসে সরোজিনীকে অন্য ঘরে ডেকে খুব তাড়াতাড়ি না ক'রে অল্প সময়ের মধ্যে যতটা হয় ভালো ব্যবস্থাই করতে বললেন। বললেন, তিনি একটা ট্যাক্সি-ই আনিয়ে দেবেন, একটু দেরি হলেও ক্ষতি হবে না।

গল্প শেষ হোলে সরোজিনী বললেন— "এরপর আমি ঠাকুরঝিকে ওর কাছে বসিয়ে হেঁশেলে চলে গেলাম।…অনেকক্ষণ তো তোমাদের গল্প হোল ; চমৎকার মেয়েটি না গা ঠাকুরঝি !"

রতি একটু হেসে মুখটা দোলাল ; বলল,—"খুব চমৎকার ! আবার আসতে বলেছি।"

—চোখ তুলে যে তড়িতের দিকে চাইল তাতে যেন একটা সন্ধানী আলো ফুটে উঠেছে।

সকালে এসেছে, সমস্ত দিনটা তড়িৎ খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে রইল। রাত্রির ক্লান্তি ছিল, বেরুল না, চিন্তাই হয়ে রইল সহচর।

প্রায় ঘণ্টা-তিনেক যে ছিল এর মধ্যে মল্লী টের পেল কিনা যে তড়িৎ এখানেই থাকে, তার সঙ্গে এরাও টের পেল কিনা যে মল্লী তড়িতের চেনা। একেবারে নূতন পরিচয়ে বসন্তকুমার যে খাওয়ার নিমন্ত্রণটা নিলেন তার কারণটা আন্দাজ করা যায়। উনিও দেবপ্রসন্ন-নলিনাক্ষ-মল্লীর গ্রুপের মানুষ, ডিগ্‌নিটি-অব্-লেবারে আস্থাবান, অখিলের পরিচয় পেয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অখিল কি এগিয়ে এ-কথাও বলেছেন যে যে তাঁর আদর্শে বিশ্বাসী আর একটি ছেলে এখানে আছে, যে রিক্শা হাঁকিয়েই তার

কাজ চালিয়েই যাচ্ছে ? বলাই সম্ভব, কেননা তড়িৎ আবার এই কায়িক শ্রমের মর্যাদার সঙ্গে বিদ্যারও ঘটিয়েছে শুভ যোগ। বলাই সম্ভব, কিন্তু তড়িৎকে তিনি ও-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বললেন না, একবার কারখানায় যেতে যেতে শুধু এইটুকু—"তড়িৎ বোধ হয় শুনেছ তোমার বৌদির কাছে, সেদিন হঠাৎ বৃষ্টিতে এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ে নিয়ে কী আতান্তরে পড়ে আমাদের এখানে এসে উঠেছিলেন ?"

"হ্যাঁ, শুনলাম"—ব'লে উৎসুক নেত্রেই চেয়ে ছিল তড়িৎ, কিন্তু আর কিছু বললেন না উনি ; ঘুরে চলে গেলেন।

হাবভাবে যতটা বুঝতে পারা যাচ্ছে রতি যেন কিছু জানে, কিন্তু বলে না তো কিছুই। জিগ্যেস করা তো চলে না। যদি তড়িতের আন্দাজটা ভুল-ই হয়, তাহলে উল্‌টে ওরই কৌতূহল জাগিয়ে বসবে।

বিকালে একটু চেষ্টা করেছিল একটা সুযোগ পেয়ে। অলক আর রুবিকে নিয়ে এদিক-ওদিক গল্প করছিল, রতি চা নিয়ে এসে বসল ; বলল—"ওসব বাজে-গল্প ছাড়ুন তড়িৎদা, দেশের গল্প বলুন—দশদিন তো কাটিয়ে এলেন আমাদের ভুলে।"

তড়িৎ চায়ে চুমুক দিয়ে হেসে বলল—"শোনো দিদির কথা, রুবি ; আর রাঁচিকে নিয়ে বছর দুই ধরে যে দেশের সবাইকে ভুলে আছি সেটা কিছুই নয়।"

"উঃ, ভারি তো রাঁচির টান !"—ব'লে উড়িয়ে দিল কথাটা রতি প্রথমে। সঙ্গে সঙ্গে—"অবিশ্যি আছে, নেই কেন বলব ?"—ব'লে মুখের উপর একটা তীর্যক দৃষ্টি ফেলে সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"না, বাজে-কথা শুনতে চাই না তড়িৎদা, বলুন দেশের গল্প।"

খুব কাছাকাছি এসে গেছে, তড়িৎ বলল—"মানপুর আবার জায়গা, তার আবার গল্প !—সেই পাড়াগেঁয়ে দাদা, পাড়াগেঁয়ে ভাইঝি, কতবার শুনেছ তাদের কথা। তার চেয়ে তোমার নতুন বন্ধু হোল—কলেজে-পড়া—কত নতুন কথা হয়ে থাকবে—তুমি-ই করো তার গল্প—কী পাতালে—সই, না, গঙ্গাজল ?"

রতির মুখটা যেন কিরকম হয়ে গেল হঠাৎ, ঘুরিয়ে সামলে নিয়ে বলল—"তবে যাই—খালি ঠাট্টা।"

বসিয়ে রেখে করল গল্প তড়িৎ—নূতন স্মৃতি, নূতন বিচ্ছেদ, একটু আবেগময়ই হয়ে উঠল ক্রমে—দাদা, বৌদি, রমা, মাস্টারমশাই, চৌকিদার নটাই সামন্ত, সুঁতি, দামোদর—তার মধ্যে ওদিক থেকেও মল্লী সম্বন্ধে কিছু বের করবার চেষ্টা করল কয়েকবার, কিন্তু রতি সেই প্রায় মুখ ফস্‌কে যাওয়ার পর সাবধান হয়ে গিয়েছিল, কিছুই ফল হোল না।

ফল একেবারে হোল নাই বা কি করে বলা যায়? খানিকটা হোল বৈকি। আর সে সন্দেহ বা আন্দাজের অবকাশ রইল না। রতি জানেই একটা কিছু।

অশান্তিটা আরও গেল বেড়ে। তারপর যেন বিদ্যুৎস্ফুরণে একটা কথা মনে পড়ে গেল—মল্লী তো জানেই!

সন্ধ্যার একটু আগে কারখানায় গিয়ে একটা রিক্‌শা বের করে নিল। অখিল ছিলেন, প্রশ্ন করলেন—"আজ আর বেরুবে? ক্লান্ত রয়েছ।"

তড়িৎ হেসে বললে—"ভাড়া খাটব না আজ, একটু ঘুরে আসি। পা দুটো যেন চাইছে রিক্‌শা।"

অখিলও একটু হেসে বললেন—"ওরকমটা হয়; অব্যেস তো। যাও, ঘুরে এসো একটু না-হয়।"

(সাতাশ)

তড়িৎ গিয়ে দেখল বৈঠকখানাটা খালি। আওয়াজ শুনে ভেতরে মল্লীর ঘরে গিয়ে দেখল, নিয়মিতদের মধ্যে প্রায় সবাই রয়েছে, তবে মল্লী রয়েছে তার বিছানায় শুয়ে, গলার কাছ পর্যন্ত একটা সুজনি টেনে তোলা।

মল্লীর মুখটাই দরজার দিকে ঘোরানো ছিল; ব'লে উঠল—"তড়িৎবাবু যে! কবে এলেন?...মানে, কোথায় ছিলেন এতদিন?"

সবাই ঘুরে চাইল; দেবপ্রসন্ন বললেন—"তড়িৎ? এসো এসো, বোসো, তারপর?"

"আপনি শুয়ে যে ও-ভাবে?"—প্রশ্নটা মল্লীকেই করে, উত্তরটার জন্য আর সবার ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা বুলিয়ে আনল তড়িৎ। সবাইকে নমস্কার করে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। দেবপ্রসন্ন বললেন—"আর বোলো না। তরশু বাপে-মেয়ে হিন্দু গিয়েছিলেন, ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজে এই কাণ্ডটি করে বসেছেন মেয়ে,—ব্রঙ্কাইটিস—আরও খারাপ অবস্থা হোত, রিক্‌শা-ড্রাইভার বুদ্ধি ক'রে এক বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ি নিয়ে তোলে, তাই।...হ্যাঁ, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই—উনি হচ্ছেন মল্লীর বাবা, নাম জানই, বসন্তকুমার চৌধুরী।...আর এই সেই তড়িৎ, যার কথা আপনাকে বলছিলাম, বসন্তবাবু।"

পরিচয় শোনার সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ আবার নমস্কার করেছিল, উনি প্রতি-নমস্কার ক'রে একটু প্রশংসার দৃষ্টিতে ওকে দেখে নিয়ে বললেন—"শুনছিলাম আপনার কথা

দাদার কাছে। দেখে বড় আনন্দ পেলাম; বেশ, চমৎকার। দেশের যা অবস্থা, আপনাদের মতন দৃষ্টান্ত না বাড়লে…সুখের বিষয়, বাড়ছে।…আপনাকে বলছিলাম না দাদা? যাঁর বাড়ি গিয়ে আমরা আশ্রয় নিলাম সেদিন—অখিলবাবু—তিনি এই ব্যবসাই করছেন…"

নলিনাক্ষ রয়েছে, প্রিয়রতন রয়েছে, আরও কয়েকজন, ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন—"শুধু তাই নয়—আরম্ভ করেছিলেন তড়িৎবাবুরই মতন, নিজে চালিয়ে—সব গল্প করলেন তো সেদিন…"

তড়িতের দৃষ্টিটা আপনা হতেই গিয়ে মল্লীর ওপর পড়ল। মল্লীর উদ্বিগ্ন দৃষ্টিটা ছিল ওর বাপের ওপর, ঘুরিয়ে এনে তড়িতের ওপর ফেলে বলল—"কিন্তু কোথায় ছিলেন এতদিন আপনি বললেন না তো।"

তড়িৎ বুঝল ওর বাবার কথাটা থামিয়ে দিল মল্লী। আর একবার যেন আপনা হতেই ওর দৃষ্টিটা অন্য এক জায়গায় গিয়ে পড়ল; প্রিয়রতনের মুখের ওপর। ওর দৃষ্টিও মল্লীর মতোই উদ্বিগ্ন। চোখাচোখি হয়ে যেতে তড়িৎ উত্তরটা তাকেই দিল; বলল—"হঠাৎ একটু দেশে চলে গিয়েছিলাম।"

উদ্বেগটা নেমে গেল প্রিয়রতনের দৃষ্টি থেকে, প্রশ্ন করল—"খবর ভালো তো?"

তড়িৎ বলল—"হ্যাঁ, খবর ভালোই। হঠাৎ একটু দরকার পড়ে গিয়েছিল।"

প্রিয়রতন একটু হেসে বলল,—"আরও দিনকতক কাটিয়ে এলে পারতেন, রাঁচির চেয়েও ভালো জায়গা বলে মনে হচ্ছে।…না নলিনাক্ষ?"

নলিনাক্ষ একটু হেসে বলল—"মনে তো হচ্ছে।"

মল্লী অনুযোগ করল ঠোঁট দুটো একটু জড়ো করে—"আপনারা খুঁড়ছেন ওঁকে—দুজনে মিলে!"

প্রিয়রতন আরম্ভ করল—"বাঃ, আমরা কোথায় আরও প্রশংসা করছি!…"

কথা শেষ হওয়ার আগেই একবার নিজের দিকে চেয়ে নিয়ে তড়িৎ বলল—খুঁড়ুন না কত খুঁড়বেন—পাথর, খুরপো ভেঙে যাবে।"

একটা হাসি উঠল। মল্লীও উঠল হেসে, তারপর রাগ করেই বলল—"আপনিও যোগ দিলেন—নিজের শরীর নিয়ে—না, এ আমার ভালো লাগে না!"

তড়িৎ বলল—"বাঃ, বলছেন ওঁরা খুঁড়ছেন—দুজনে মিলে—আমি বলে দোব না কত শক্ত কাজ তাঁদের!"

এবার যা হাসি উঠল, বেশ ঘর কাঁপিয়েই।

দেবপ্রসন্ন বললেন—"তোমাদের এটা একটা ভুল সংস্কার, মা মল্লী, খোঁড়া বলে কোন জিনিসই নেই। কারুর স্বাস্থ্যে উন্নতি হয়েছে, সেটা বরং তাকে বলাই ভালো, মনের প্রফুল্লতাটুকু কাজ করে। সাইকোলজির মতে তো কেউ খারাপ থাকলেও, 'বেশ আছে' বললে উপকার হয়; মানে, সাজেশ্চনটায় কাজ হয় আর কি…"

"বাঃ, বেশ আছেন তো তড়িৎবাবু আপনি!"

—মল্লী কথাটা গম্ভীর ভাবে বলতে গিয়ে নিজেই হেসে ফেলায়—ওর উদ্দেশ্যটা বোঝা সবার সহজ হয়ে পড়ল, এবারেও বেশ একটা জোরে হাসি উঠল।

এইরকম হালকা আলাপই চলল সেদিন, অনেকক্ষণ ধরেই; মল্লীর অসুস্থতার জন্য সবাই যেন চেষ্টা করেই এই ধারাটা বজায় রেখে গেল। তড়িৎ একবার উঠতে চাইলে দেবপ্রসন্নই বললেন আর একটু বসে যেতে। যাঁরা মল্লীকে দেখতেই এসেছিলেন তাঁরা একে একে উঠে গেলেন, তড়িৎ যখন উঠল তখন প্রায় দশটা হয়েছে। "চলো তোমায় রিক্শায় তুলে দিয়ে আসি, তড়িৎ।"—ব'লে দেবপ্রসন্নও বেরিয়ে এলেন। গেটের কাছে এসে বললেন—"বেশ একটু বাড়াবাড়িই হয়েছিল তড়িৎ, ডাক্তার মনে করেছিল বুঝি নিউমোনিয়াই।"

একটু চকিতই হয়ে উঠল তড়িৎ; বলল—"সত্যি নাকি!"

"অবিশ্যি তা নয়, তিনজন ডাক্তারকে ডেকে বেশ ভালোভাবে ডায়াগ্নোসিস করিয়ে নিয়েছি; তবে ব্রঙ্কাইটিস্টা বেশ খারাপ টাইপেরই হয়েছিল।"

"এখন কি রকম আছেন?"

"সেফ্ (safe)—এইটুই বলতে পারা যায়। তবে তুমি যতটা ভালো দেখলে ততটা নয়, বুকের ব্যথাটা বেশ রয়েছে। সেই কথাই বলতে বেরিয়ে এলাম, তড়িৎ—বেশি অসুবিধে না হলে এই সময় একবার করে আসতে পারবে কি?—দেখলাম তুমি থাকলে ও যেন বেশ প্রফুল্ল থাকে…"

"অনেকদিন পরে এলাম তো।"

দেবপ্রসন্ন চোখটা তুলে মুহূর্তখানেক যেন কি ভেবে নিয়ে বললেন—"তাও নিশ্চয়। …পারবে আসতে?"

"নিশ্চয় আসব।…মনটায় একটা ধুক্পুকুনি লেগে রইল তো—যেমন দেখলাম তার চেয়ে যখন খারাপ বলছেন।"

"না, সে-চিন্তার কিছু নেই। বেশ ভালো ডাক্তারের হাতেই আছে, ইম্প্রুভ-ও করছে।…বেশ তাহলে এসো।"

সব যেন ওলট-পালট করে দিল মল্লীর এই এক অসুখে।

ওটা লক্ষ্য করেছিল তড়িৎ—ওকে দেখে মল্লীর হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে ওঠা—তারপরও লক্ষ্য করেছিল ভেতরে কি যেন একটা চেপে রেখে সেই উৎফুল্লতা মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। দেখছে এইসব কথাগুলো আজকাল কেমন ক'রে যেন নিজের মন দিয়ে বেশ বোঝা যায়, কোথায় সে-ই মুখ্য হয়ে উঠেছে, আবার কোথায় সে গৌণ।

জ্যোৎস্না, একটা ঝিরঝিরে হাওয়া রয়েছে, আস্তে আস্তে রিক্‌শা চালিয়ে চলেছে তড়িৎ। মনটা ভারাক্রান্ত। যতই এগুচ্ছে ততই যেন পেছ-টানটা বেড়ে যাচ্ছে। মল্লীর শয্যালগ্ন দেহটা ভেসে ভেসে উঠছে মনে, ক্লান্ত মুখটা। মনের সেই রহস্যময় অনুভূতি দিয়ে আর-একটা কথা বুঝতে পারছে—মল্লী যেন তাকে কি বলতে চেয়েছিল—নিশ্চয় আসবারই অনুরোধ—সবার সামনে, বিশেষ করে বোধ হয় বাপ রয়েছেন বলে মুখ দিয়ে বের করতে পারল না কথাটা।...বলতে পারল না বলে যে ওর বুকের বেদনা সেটা যেন নিজের বুকেই বাজছে তড়িতের।

পা দু'টা মন্থর হয়ে এসেছে। ফিরে যাবে তড়িৎ?—যাক্ না, গিয়ে দেবপ্রসন্নকে বাইরে ডেকে নিয়ে বলুক—যদি উনি ভালো বোঝেন তো তড়িৎ না হয় এখানেই এসে থাকে ক'টা দিন, যতটা দেখাশোনা করতে পারে রোগিণীর; তিনি তো একাও।

প্রায় থেমে এসেছিল পা দু'টা, রিক্‌শার মুখটাও একটু ঘুরেছিল, বাঁচালেন মাস্টার-মশাই,—বেশি সেন্টিমেণ্টাল হয়ে যাবে না?

জোর করেই চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিল। যা জানতে এসেছিল তা তো কৈ হোল না, অর্থাৎ তার সম্বন্ধে কতটা জানাজানি হয়েছে না-হয়েছে। মল্লীর বাবার সঙ্গে অখিলের যে কোনও কথা হয়নি তার সম্বন্ধে এটা ঠিক; তাহলে, তিনি অখিলের প্রসঙ্গ যখন তুললেন তখন নিশ্চয় এ-কথাও বলতেন যে, তাঁর কারখানায় একজন বাঙালী যুবকও আছে যে রিক্‌শা চালাচ্ছে আজকাল। হয়ত তড়িৎ-ই সেই যুবক কিনা সে প্রশ্নও করতেন তড়িৎকে। কিছুই করেননি।

তবে মল্লী যে কিছু জানে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না তড়িতের, যেমন রতির সম্বন্ধেও নেই। ওর প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনেছে। যেতেই যে প্রশ্ন করল—কবে এসেছে, সেটা খুবই অর্থপূর্ণ এদিক দিয়ে। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে আবার প্রশ্ন করল—"মানে, কোথায় ছিলেন এতদিন?"

কিন্তু আজ এ জানাজানি সমস্যাটা যেন অনেকটা অবান্তর মনে হচ্ছে। মল্লীর সামনে সব যেন ফিকে।

মল্লী,—রোগশয্যায় তার ক্লান্ত দৃষ্টি নিয়ে ; আবার তড়িৎকে দেখে তার উৎফুল্ল দৃষ্টি নিয়ে। শুধু আজকের মল্লী-ই নয়, কত দিনের কত ভাবে দেখা মল্লী।

তারই মুখখানি মনে প্রতিবিম্বিত করে যখন বাসায় এসে পৌছাল, ছাখে রতি বারান্দার পৈঠায় থামে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে আছে।

"একলা বসে যে এরকম করে ?"—শুধাল তড়িৎ।

হঠাৎ দেখে যেন থতমতই খেয়ে গিয়েছিল রতি ; বলল—"একলা···ওরা সবাই খেয়ে শুলো তো।"

"একলা বলেই নয় ; এমন করে বসে আছ···"

কি ভেবে ও-কথাটা আর শেষ করল না। বলল—"দেরি হয়ে গেল আমার ; এমন আটকে যেতে হোল !"

অপরাধী মনটা নিজে হতেই যেন একটা জবাবদিহি দিল।

(আটাশ)

মল্লী-রতির রহস্যটা তার পরদিন প্রকাশ পেল।

মনটা তড়িতের খুবই খারাপ আছে। অনেকগুলা ব্যাপার একসঙ্গে এসে পড়েছে, কিন্তু কোন দিকেই কিছু ঠিক করে উঠতে পারছে না, একটার ঘাড়ে একটা চিন্তা এসে যেন আরও নিষ্কর্মাই করে দিয়েছে।

অখিলদাদার টাকাটা। এক আধ টাকা নয় তো, গুণে একশোটি। সমস্ত দিন রিক্‌শা চালালেও কতদিনে শোধ হবে ?···পরীক্ষাটা তো আর সত্যই না-দেওয়া যায় না। একেবারেই সামনে ; মাঝখান থেকে ক'টা দিন একেবারে অমনি চলে গেল।··· দুটোই এত দরকারী, কিন্তু না রিক্‌শা, না বই—কোন দিকেই যেন চাইতে ইচ্ছা করছে না।···মল্লী কেমন আছে কে জানে। ইচ্ছা হচ্ছে একবার দেখে আসি গিয়ে ; কিন্তু সন্ধ্যার আগে আর কি করে হবে ? এদিকে মল্লীদের ওখানে গেলে যা-ও দু'এক টাকা উপার্জনের সম্ভাবনা ছিল তাও যায়।

একটা ঠিক করল, সকাল সকাল বেরুবে রিক্‌শা নিয়ে, যতটা পারে কামিয়ে নিয়ে মল্লীদের বাড়ি চলে যাবে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে, ঘড়িতে প্রায় আড়াইটে। একটা কিছু ঠিক হতে মনটা একটু হালকা হোল। এইরকম সবকিছু সাধ্যমতো ঠিক করে আস্তে আস্তে এগুক না—রিক্‌শা,

পরীক্ষা, মল্লী,—অবশ্য, যতদিন সে অসুখে পড়ে আছে।...মল্লী ভালো হয়ে গেলে বিকাল থেকে একটানা রিক্‌শা। সব ঠিক হয়ে যাবে। শুধু ভাবনা নিয়ে বসে থাকলেই চলে ?

বইগুলা গুছিয়ে ফেলুক, সুরু করে দিক পড়াটা।

গোছাচ্ছিল, অলক এসে উপস্থিত হোল; মনে হোল যেন কতকটা সন্তর্পণেই। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একটু দেখল, তারপর বলল—"আমিও গুছিয়ে দিই, তড়িৎদা ?"

"তুমি পারবে ? ছেলেমানুষ, বোঝ না তো কোন্ বই কোথায় রাখতে হবে।... ঘুমোওনি যে !"

"ঘুমিয়েছিলাম তো।"

মুখটা একবার ঘুরে দেখে নিয়ে গোছাতে লাগল তড়িৎ।

"তড়িৎদা !"

তড়িৎ না ঘুরেই প্রশ্ন করল—"কেন ? কিছু বলবে ?"

"হুঁঃ। আপনি বলছেন ছেলেমানুষ। কিন্তু এত কথা আমি জানি !"

"সত্য নাকি ? দু'একটা শুনতে পাই তার ?"

একটু চুপচাপ গেল, তারপর—

"মল্লীদি তো আপনার কথা জিগ্যেস করছিলেন..."

"কে মল্লীদি !"

—একেবারে ঘুরে দাঁড়াল তড়িৎ। মনে হোল যেন উৎসাহই পেল অলক, একটু গম্ভীর হয়েই বলল—"সেই তো সেদিন যিনি ভিজতে ভিজতে এলেন—আমাদের বাড়ি খেলেন। মা রান্নাঘরে ওঁদের জন্যে লুচি ভাজছিলেন তো, পিসী আর মল্লীদি ঘরে বিছানায় বসে গল্প করছিলেন। মল্লীদি জিগ্যেস করলেন পিসীকে—'হ্যাঁ ভাই, আপনাদের আর কেউ আছেন, আপনার ভাই কি ঐরকম কেউ ? নিজে রিক্‌শা চালান।' ...পিসী বললেন—'ও তড়িৎদা !'...মল্লীদি জিগ্যেস করলেন—'কোথায় তিনি ?'... পিসীমা বললেন—'বাড়ি গেছেন।'...মল্লীদি বললেন—'তাই নাকি ?'...তারপর একটু চুপি-চুপি বললেন—'আমি জিগ্যেস করেছি, তাঁকে বোলো না যেন, বলবে না তো ?'"

"তুমি কি করে শুনলে ?"—তড়িৎ প্রশ্ন করল।

"আমি তো পিসীকে ডাকতে এসেছিলাম, মা ডাকছিলেন। পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম মল্লীদি'র। তক্ষুনি বললাম—'তোমায় মা ডাকছেন পিসী, একবারটি শুনে যাও।' "

"আমায় বললে কেন তাহলে ?" একটু হেসে প্রশ্ন করল তড়িৎ।

অলকের মুখটা একটু শুকিয়ে গেল। বলল—"আমায় তো মানা করেননি, পিসীকে করেছেন। আমায় মানা করলে কেন বলতে যাব বলুন ? আপনি যা মানা করেন বলি কাউকে ?"

"বেশ, কাউকে আর বোলো না, বলবে না তো ?"

"গেলাম বলতে আমি ! রুবিদি'র মতন কিনা ?…মাকে ব'লে দিয়েছে।"

"ওকেও বলেছিলে বুঝি তুমি ?"

অলক একেবারে থতমত খেয়ে চুপ করে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল। হাসিই পায়, তড়িৎ গম্ভীর হয়েই বলল—"বলতে নেই সবার কথা সবাইকে।"

ওর অপ্রতিভ ভাবটা কাটাবার জন্যে বলল—"তুমি আমার জন্যে এক গেলাস জল এনে দিতে পারবে ? যাও তো।"

এ-সমস্যাটার কিন্তু আর ধার নেই তড়িতের কাছে। যখন হয়েই গেছে জানাজানি আর উপায় কি ? ক্ষতিই বা কী এমন ? মল্লীকে রতি আসতে বলেছে, সরোজিনীও বলে থাকবেন, হয়তো আসবে। আসুক না। একটা কথা গোপন করবার ইচ্ছা ছিল, সে যে ছাত্র, এম-এ পড়ে। সেটা নিশ্চয় অতি-প্রশংসার ভয়ে, সবাই আরও বড় একজন হিরো (hero) ক'রে তুলে না ধরে ; হয়তো সেটাও টের পেয়ে গেছে মল্লী, না হয় যাওয়া-আসা করলে পেয়ে যাবে টের। যাক্‌, উপায় কি ?…চিন্তার মধ্যে একটা যেন খুব সূক্ষ্ম পুলকও জেগে উঠছে মনে,—জানুকই না মল্লী তার সবটা।

মোট কথা যা সব সমস্যা নিয়ে পড়েছে তার সামনে ওটুকু যেন আর সমস্যাই নয় কিছু, মন আর টানছে না।

বই গুছিয়ে, টেবিল ঝেড়েঝুড়ে সদ্য-সদ্যই আরম্ভ করে দিল পড়া, একটু ঘটা করেই। কিন্তু ক্রমাগত ঘড়ির দিকে চোখ তুলে তুলে আর রোদ কতটা নরম হোল সেদিকে লক্ষ্য রেখে পড়া হয় না। কোনরকমে টেনেটুনে বেলা প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত নিজেকে আটকে রাখল, তারপর বইটা আবার বেশ যত্ন করে র‍্যাকে তুলে রেখে উঠে পড়ল।

অখিল কারখানাতেই ছিলেন। সেদিনকার মতোই প্রশ্ন করলেন—"এতটা দিন থাকতে ?"

তড়িৎ একটু চুপ করে থেকে আমতা-আমতা ক'রে আরম্ভ করল—"আজ্ঞে, একটু বেলাবেলি না আরম্ভ করলে…"

হেসে ফেললেন অখিল; বললেন—"ও, তাও তো বটে, মস্তবড় ঋণের বোঝাটা রয়েছে যে!...নাঃ, বড্ড ছেলেমানুষ তুমি, তড়িৎ।"

তড়িৎ লজ্জিত হয়ে পড়েছে; বলল—"আজ্ঞে না, পরীক্ষাটা সামনে এসে পড়েছে তো, রাত্তিরটায় সময় পাওয়া যায়..."

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েই কি একটা ভাবছিলেন অখিল; বললেন—"এখন ঐটেই তো বড় কথা, যার জন্যে রিক্‌শা আর দাদার ঋণ দুটোই ভুলতে হবে।"

আর একটু কি যেন ভেবে নিয়ে বাইরে আকাশের দিকে দেখে নিয়ে বললেন—"যাক, সে যা হয় দেখা যাবে। এখন কিন্তু তোমার বেরুনো চলে না, অন্তত আর ঘণ্টাখানেক যাক, বড় রোদ।"

কারখানা থেকে বেরিয়ে বড়রাস্তায় পড়েই লোক পেয়েছিল তড়িৎ, ভালো ভাড়াও, দূরের যাত্রী, কিন্তু গেল না। গেল না যে, সেটা বিশেষ কিছু না ভেবেই; একটু রূঢ়ভাবেই বরং 'না'টা বলল লোকটাকে, তারপর প্যাডেল চালাতে চালাতে যুক্তি দিয়ে নিজের কাজটা সমর্থন করতে লাগল—

অখিলদা যখন দেরি করিয়ে দিলেন (দোষটা ওঁর ঘাড়ে চাপিয়ে তৃপ্তিও পেল), তখন সোজা মল্লীদের ওখানে চলে যাওয়াই ঠিক হবে না কি? গেলে অন্তত তাকে খানিকটা নিরিবিলিতে পাওয়া যায়, এখন হয়তো মাত্র দেবপ্রসন্ন কাছে থাকবেন, তাতে ব্যক্তিগত-ভাবে ওকে খানিকটা জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়, কেমন আছে, কোথায় কষ্ট—যা কাল করাই হয়নি—কি মনে করল যে মল্লী!...যদি একেবারেই একা পায় তো, সেদিন এসে তড়িতের সম্বন্ধে কতটা টের পেল সেটাও আকারে-ইঙ্গিতে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।...সবচেয়ে বড় কথা, সকাল-সকাল বাড়ি পৌঁছুতে পারবে, কেমন যেন লজ্জা করে অত রাত করে বাড়ি ফিরতে, রতি যেন থাকবেই বসে একটা ছুতানাতা করে!

তা ভিন্ন পড়বারও সময় পাওয়া যায়। যুক্তিগুলি সবই বেশ অনুকূল। পা দু'টো কখন থেকে বেশ জোরেই প্যাডেল করতে সুরু করে দিয়েছে।

গিয়ে দেখল দেবপ্রসন্ন নেই। তবে মল্লী একলাও নয়, নলিনাক্ষ রয়েছে, মনে হোল ও ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে ওদিকে কোথা থেকে এসে একটা সোফায় বসল।

মল্লী কালকের মতোই প্রফুল্ল হয়ে উঠে ওকে নমস্কার করে বলে উঠল—"এই যে তড়িৎবাবু! আসুন।"

"কেমন আছেন আজ?" প্রশ্নটা করে একটা সোফায় বসল তড়িৎ।

"অনেকটা ভালো।...কাল থেকে ওঁরা সবাই মিলে যেমন 'ভালো আছি' 'ভালো আছি' লাগিয়েছেন, অসুখের একটা চক্ষুলজ্জা আছে তো।"

কালকের সেই খোঁড়াখুঁড়ির তর্ক, তিনজনেই একটু হেসে উঠল। নলিনাক্ষ বলল, —"তাব'লে এমন নয় যে, ওষুধ খেতে চাইবেন না!"

তড়িতের দিকে চেয়ে অনুযোগ করল—"ওষুধ খাওয়ার জন্যে খোসামোদ..."

চুপ করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মল্লী তড়িতের দিকে চেয়েই মুখটা বিকৃত করে বলল— "বড্ড বিট্‌কেল ওষুধ তড়িৎবাবু! তাই বলছিলাম—আপনারা বরং ঘেরে-ঘুরে ব'সে আমায় সাজেশ্চন (suggestion) দিন—'ভালো আছ' 'ভালো আছ'—না হয় পাড়ার কিছু লোক ভাড়া করেও আনুন..."

ওদের হাসির মধ্যে বেয়ারা ট্রে-তে ক'রে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে মাঝের টেবিলটায় রাখল, দুধ ঢেলে তোয়ের করতে যাচ্ছিল, মল্লী বলল—"থাক, আমার টেবিলটা এগিয়ে দাও।"

নলিনাক্ষ একটু আপত্তির স্বরে বলল,—"আপনি তোয়ের করবেন! স্ট্রেন (strain) হবে না—শুয়ে শুয়ে?"

"কিচ্ছু না।"

পাশ ফিরেই ছিল, মাথাটা একটু তুলে বলল—"আপনি বরং আর একটা বালিশ দিয়ে দিন কাঁধের নীচেটায়।"

বালিস দু'টা ভালোভাবে বসিয়ে দিতে দিতে নলিনাক্ষ বলল—"কষ্ট হবে।"

বেয়ারা টেবিল এগিয়ে দিয়েছিল, পটে দুধ ঢালতে-ঢালতে ঠোঁটে একটু হাসি টিপে মল্লী বলল,—"তা তো হবেই। বেটাছেলেদের জন্যে কষ্ট করতেই তো আমাদের জন্ম! তাইতো ভাবছি কাল থেকে—তড়িৎবাবু এলেন এতদিন পরে, কিছুই করতে পারলাম না, কী যে মনে করবেন..."

তড়িৎ বললো—"কষ্ট করে তো অসুখে পড়েছিলেন..."

এমন হেসে উঠল মল্লী যে, চা খানিকটা ছল্‌কে নীচে পড়ে গেল, একটু শাসনের ভঙ্গীতেই তড়িতের দিকে চোখ তুলে বলল—"না, হাসাবেন না আমায় তড়িৎবাবু, দেখুন তো কী কাণ্ডটা হোল!"

এই অবস্থার মধ্যেই দেবপ্রসন্নবাবু এসে প্রবেশ করলেন ঘরে: "বাঃ, এই যে তড়িৎ আজ সকাল-সকাল এসে গেছ।...মল্লী-মা-ই চা করে দিচ্ছ? কষ্ট হচ্ছে না তো?"

নলিনাক্ষ বললো—"কষ্ট করবেন বলেই জিদ ধরেছেন উনি আজ।"

মল্লী সেইরকম চোখ তুলে শাসনের ভঙ্গীতে চাইল ওর দিকে। চা ঢালা হয়ে গিয়েছিল, বালিশে আবার মাথাটা চেপে দিয়ে দেবপ্রসন্নকে বলল—"আর ক্রমাগত—'কষ্ট হচ্ছে' 'কষ্ট হচ্ছে' বললে বুঝি কষ্ট এসে পড়তে পারে না আপনাদের থিয়োরী মতন? দেখুন তো!"

দেবপ্রসন্নবাবু একলা আসেননি। নলিনাক্ষের মোটরে একটু বেড়িয়ে আসতে গিয়েছিলেন, পথে প্রিয়রতন আর তার বোন অতসী আসছিল, তাদের তুলে নিয়ে এসেছেন। অতসীকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল মল্লী।

আজও সকাল-সকাল ফেরা হোল না তড়িতের।

সন্ধ্যার পর আরও কয়েকজন এল। গল্পগুজবে খানিকটা রাত হয়েই গেল। তারপর ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজতে যখন উঠতে যাবে, মল্লী যেন অপেক্ষাই করছিল, বলে উঠল—"বাঃ, উঠলেন যে! আমি অতসীকে ডেকেছি এস্রাজ বাজাবে বলে!"

অতসী বলল—"কৈ, তা লেখনি তো!"

"লিখলে তুমি আসতে যেন! যা গুমোর তোমার!...না, বসে যান একটু তড়িৎবাবু। গুমোর অভিমান দুই-ই আছে আবার অতসীর।"

কালকের মতো অত দেরি না হলেও প্রায় দশটা হয়েই গেল। জ্যোৎস্নায় সেইভাবে রিক্‌শা চালিয়ে আসতে-আসতে একটা কথাই ঘুরে ঘুরে আসছিল তড়িতের মনে—তাকে খানিকটা আটকে রাখবে বলেই মল্লী অতসীর কথাটা আগে ভাঙেনি। বড় অদ্ভুত লাগে এসব।...আচ্ছা, মল্লী কি টের পেল ও এম-এ পড়ে?...আবার সেই একটা সূক্ষ্ম পুলক—না-হয় পাক-ই না।

রিক্‌শা রেখে বাসায় আসতে অনেকটা দূর থেকেই দেখল কে যেন সিঁড়ির গোড়া থেকে তাড়াতাড়ি উঠে ভেতরে চলে গেল।

রতি আজও পথ চেয়ে বসে ছিল।

(ঊনত্রিশ)

আজকাল সকালে তড়িৎ নিয়মিতভাবেই খানিকটা সময় আলাদা করে নিয়ে বিমলকে পড়ায় ; ও বইখাতা নিয়ে ভেতরে চলে গেলে নিজে পড়তে বসে।

পরদিনের কথা। বিমল উঠে যাওয়ার একটু পরে সরোজিনী এসে প্রবেশ করলেন ওর ঘরে। আসেন না বড় একটা, তড়িৎ প্রশ্ন করল—"বৌদি যে? কিছু দরকার আছে নাকি?"

"বিশেষ কিছু নয়।"

তারপর একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বললেন—"রাজী হবে কিনা জানি না, মাঝখান থেকে পড়ায় একটু বাগড়া দিতে এলাম।...বলছিলাম, অনেক কষ্টে এতদিনে ঠাকুরঝির মত করিয়েছি ঠাকুরপো, এখন তুমি যদি সদয় হও।"

ধক্‌ করে উঠল তড়িতের বুকটা, মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ; একটু সেইভাবেই থেকে শুকনো গলায় প্রশ্ন করল—"কী সদয় হওয়া বৌদি?"

"ওকে একটু একটু করে পড়াতে ; যদি সময় হোত।"

বুকে যে হাওয়াটা আট্‌কে ছিল, আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল তড়িৎ। বলল—"এই সদয় হওয়া! তা আমি তো ওকে কতবার বলেছি, দেখেছেন তো, হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে।"

"আমরাও তো বলেছি কতবার। আজকাল যেমন পাত্রই খোঁজ, একটু লেখাপড়া জানা মেয়েই চায়। তা এতদিনে একটু গা হয়েছে, জ্ঞান-বুদ্ধি হচ্ছে তো ক্রমে।"

"হওয়া উচিত তো। তা বেশ তো, পড়ুক-না বৌদি ; আমি তো রয়েছি-ই।"

সরোজিনী মাথাটা একটু হেঁট করে পায়ের নখ দিয়ে মেঝেটা আস্তে আস্তে ঘষতে লাগলেন। একটু অপেক্ষা করে তড়িৎ বলল—"সময়ের কথা জিজ্ঞেস করছেন বোধ হয়। সকাল, বিকেল, রাত্তির—ওর যখন সুবিধে হয়, আপনাকেও একটু সাহায্য করতে হয় তো। আমি তো রয়েছি-ই, সর্বদাই—রিক্‌শার সময়টুকু বাদ দিয়ে..."

একটা যেন সুবিধা পেয়ে সরোজিনী মুখটা তুললেন ; বললেন—"ঐ রিক্‌শার কথা, ভাই। ওটি তাহলে তোমায় ছাড়তে হয়।"

একটু বিস্মিতভাবেই চোখ তুলে চাইল তড়িৎ। সরোজিনী আর সুযোগটা হাত-ছাড়া না ক'রে ব'লেই চললেন—"তোমার দাদার সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি মন্দ কথাও বলছেন না এমন কিছু ; তাঁর কথা হচ্ছে, মাগুনা আর ওর ঘাড়ে কত চাপাবে!..."

"মাগুনাতেই চলছে ?"

"চুপ করো।"—ধমকই দিয়ে উঠলেন সরোজিনী—"ঘর পড়ে রয়েছে খালি, রয়েছে। গেরস্তর সামনে হাত না পুড়িয়ে একমুঠো রাঁধা ভাত খাচ্ছ—ভারি তো!...না ঠাকুরপো —উনি কিছু অন্যায় বলছেন না। তুমি রিক্‌শা ছাড়ো। ঐ সময়টা ঠাকুরঝিকে নিয়ে বোসো—অবিশ্যি সমস্ত সময়টা নয়—রিক্‌শায় তো তোমার প্রায় আড়াই-তিন ঘণ্টা লেগে যায়—তোমার ঘণ্টাখানেক সময় এদিকে দিলেই হবে—তার জন্যে একটা হাতখরচ তোমায় নিতেই হবে—হ্যাঁ, নিতেই হবে।"

শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটু অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলও তড়িৎ। কালকে বিকালে যখন রিক্‌শা নিতে যাবে, অখিলের সেই ঋণের কথা তুলে একটু যেন ভেবে নিয়ে বলা—'সে যা হয় দেখা যাবে'।—সে কথাটার সঙ্গে এ-ব্যবস্থাটুকুর একটা যে সম্বন্ধ আছে, স্বামী-স্ত্রী মিলে কাল থেকে পরামর্শ করে যে এই মতলবটা দাঁড় করিয়েছেন তাতে আর সন্দেহ রইল না মনে। একটু হাসি ফুটল ওর মুখে ; বলল—"কিন্তু বৌদি, এ-ভাবে ঋণ শোধ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে আরও যেন ঋণী-ই করে তুলছেন না আপনারা ?"

সরোজিনী যেন আকাশ থেকে পড়লেন ; বলে উঠলেন—"বাঃ, এর সঙ্গে ঋণশোধের কী সম্বন্ধ আছে ? কী ঋণের কথা বলছ তুমি তাও তো বুঝছি না..."

"বেশ, কত করে দেবেন বলুন। পাওনাদারের তরফ থেকেই শুধিয়ে দেওয়ার যেমন আগ্রহ তাতে তো মনে হয় একমাসেই শোধ হয়ে গেলে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।"

হাসতে লাগল। সরোজিনী বললেন—"ঠাট্টা রাখো। কারবারের ছিরি তো দেখছই, বেশী কোথা থেকে হবে ? বলেছেন, পঁচিশটা টাকা করে দেবেন হাতখরচ হিসাবে।"

"তার মানে চারমাস। বেশ, তাই হবে।"—হাসতেই লাগল।

"তোমায় কিন্তু রিক্‌শা ছাড়তে হবে এবার।"

"দেড়ঘণ্টা দু'ঘণ্টা সময় তো বাঁচবে, আরও কিছু কামিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব না— যাতে আরও তাড়াতাড়ি কর্জটা..."

"কেবল এই এক কথা!"...যেন জ্বালাতনই হয়ে উঠলেন সরোজিনী ; বললেন— "পরীক্ষাটা দিতে হবে তো ? না, আমি গিয়ে দিয়ে আসব ?"

"বেশ তো, তাহলে সেই কথাই থাক্ না বৌদি, পরীক্ষা পর্যন্ত বন্ধ রাখব রিক্‌শা।"

মল্লীদের ওখানে যাওয়া-আসাটা হাতে রাখতে হয় তো। একটু ভেবে নিয়ে বলল—

"তবে একেবারে বন্ধ করতে পারব না, পা নিসপিসও করে তো। তা ভিন্ন শহরে যাওয়া-আসা আছে। তবে ভাড়া এখন আর খাটব না, কথা দিচ্ছি আপনাকে।"

দিনপাঁচ পরের কথা। রাত্রে মল্লীদের বাড়ি থেকে ফিরছিল তড়িৎ।

সবাই বলছে এবার রাঁচির আকাশ যেন বড় খামখেয়ালী হয়ে পড়েছে। ঋতু হিসাবে বর্ষার এখনও দেরি আছে, তবু বৃষ্টির যেন একটু বাড়াবাড়ি চলেছে। তাও মেঘ এল, দু'এক পশলা ঢেলে দিয়ে চলে গেল—পাহাড়ে বৃষ্টির যেমন রীতি, সেরকম নয়। ক'দিন থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে রয়েছে, কখনও হালকা, কখনও ঘন মেঘে—বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে, কখন্ যে এসে পড়বে কেউ বলতে পারে না; কাজকর্ম চলছে অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে।

দিন-দুয়েক বেরুতেই পারেনি তড়িৎ, একদিন ফেরবার সময় বাড়ির কাছাকাছি এসে ভিজেই গেল। পাঁচদিন পরে আজ আবার এসেছিল মল্লীদের বাড়ি।

আজ দুপুরের পর থেকেই আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সকাল-সকালই বেরিয়েছিল, অনিশ্চিত আবহাওয়া ব'লে কেউ আর আটুকে রাখতে চাইলে না। আটটার আগেই উঠে পড়ল।

বাইরে এসে দেখল, খণ্ড খণ্ড যা কিছু মেঘ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল, সেগুলাও অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আকাশ একেবারে পরিষ্কার। বড় ভালো লাগছে।

আরও ভালো লাগছে জ্যোৎস্নাটা। ক'দিন ছিলই না একরকম, তারপর ইতিমধ্যে চাঁদটা একেবারে মাঝামাঝি উঠে এসে বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশটা যেন ঝলমলিয়ে দিয়েছে। এদিকটা বসতি কম, গাছপালাও কম, তাইতে আরও যেন খোল্তাই হয়েছে জ্যোৎস্নাটার।

গাছপালা কম, তার ওপর যা আছে বেশির ভাগ জঙ্গুলে—শাল, পলাশ এইরকম। মাঝে মাঝে শাল-মঞ্জরীর গন্ধ ভেসে আসছে। বড় ভালো লাগছে, রাঁচির এমন রূপটি আর কবে যে দেখেছে মনে পড়ছে না।

এর মধ্যে মল্লীর মুখটা হঠাৎ জেগে উঠল। মল্লী আজ অনেকটা ভালো। ডাক্তার বলেছে কাল পথ্য দেবে। বৈঠকখানায় সোফায় হেলান দিয়েই গল্প করছিল, তারপর তড়িৎ-ও উঠে এল, ও-ও ভেতরে চলে গেল।

ওর বাবা ভালো দেখে চলে গেছেন।

মল্লীর মুখটা জেগে উঠে হঠাৎ বড় বেশি আবিষ্ট করে তুলল তড়িৎকে; রাঁচিকে তার এই রূপে আরও যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে পেতে ইচ্ছা করছে; কী করে হয়?

রাস্তা থেকে হাত-দশেক দূরে একটা বেশ বড় পাথরের চাঁই, ক'দিনের বর্ষায় ধুয়ে রংটা আরও কুচকুচে করে দিয়েছে। রিক্‌শাটা রাস্তার পাশে রেখে তার ওপর গিয়ে বসল। গন্ধে ঘুরে দেখল এখানেও খানিকটা দূরে, জমিটা সেখানে নেমে গেছে, একসঙ্গে পাঁচ-ছটা শালের গাছ রয়েছে দাঁড়িয়ে।

চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ, তারপর চিন্তাগুলা একটু একটু করে দানা বেঁধে উঠতে লাগল।

মল্লী থেকেই আরম্ভ হোল। যাকে ভালো লাগে তার সঙ্গে শুভলক্ষণগুলা মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

লক্ষ্য করছে—মল্লীর ভালো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তড়িতের জীবনের দিক্‌চক্রও কেমন যেন আপনি পরিষ্কার হয়ে আসছে। যে ভাবেই হোক, ঋণ থেকে মুক্তির একটা সুযোগ যেন আপনা হতেই কোথা থেকে এসে গেল। সত্যই মস্তবড় একটা ভাবনা লেগে ছিল; কত যে হালকা বোধ হচ্ছে!—পড়ারও মস্তবড় সুবিধা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

পড়ার কথাটা মনে জাঁকিয়ে বসল। এই যে ক'টা দিন মেঘের জন্যে বাড়িতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তাতে নানা দিক দিয়ে ভেবেচিন্তে ও-সম্বন্ধে একটা ঠিক করে ফেলেছে, মনটা ওদিক দিয়েও হয়ে গিয়েছে বেশ হালকা।

পড়তে হবে বইকি, দিতে হবে পরীক্ষা; পাস তো করতেই হবে; নোট মুখস্থ করেই হোক বা যেভাবেই হোক। সার্টিফিকেটটা তাকে নিতেই হবে। ফাঁকি? সে-কথা আবার কবে ভেবেছিল তড়িৎ। মনে পড়ে গেল এবারে মানপুরের অভিজ্ঞতার কথা। বিছানা সুটকেসসুদ্ধ হঠাৎ গিয়ে পড়ায় দাদার সেই চাপা আতঙ্ক। বার বার ওদিকে চোখ গিয়ে পড়ছে, জিগ্যেস করছেন—'তাই বলছি—পরীক্ষাটা এবার দিচ্ছ তো?' ...বৌদিদির কথায় কথায় সেই মা-মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকা—তিনটে পাস দিয়ে চারটে দিতে যাচ্ছে দেওর।...গয়না ছাড়িয়ে আনবার কথায় সেই—'আমার আশা কি এইখানেই শেষ ভেবেছ ঠাকুরপো?'

সত্যই, কত আশা নিয়ে ওঁরা চেয়ে আছেন ওর দিকে! পরীক্ষা দেওয়াই ছেড়ে দেবে তড়িৎ! এসব সংকল্প, না, দুর্বল মুহূর্তের চিন্তা-বিলাস?

আরও একটা কথা মনের কোন্ অতল থেকে যেন আস্তে আস্তে ওপরে উঠে আসছে। অতি সূক্ষ্ম, অতি সংগুপ্ত—যেন নিজের কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখা। আজ রাত্রে এই মুক্ত প্রাঙ্গণে বসে এই মুক্ত জ্যোৎস্নালোকে ওটাকে যেন আর অস্বীকার করা চলছে না।

কথাটা মল্লীকে নিয়ে। দশদিনের বিচ্ছেদ, তারপর এখানে এসে নিবিড়তর মিলনে—উদ্বেগে, আশায়—এ সত্যটা কি আর ঠেলে রাখা যায় যে, মল্লী ছাড়া জীবন তার কাছে অচিন্ত্যনীয়ই হয়ে দাঁড়াচ্ছে দিন দিন ?

আরও একটা ব্যাপার হয়েছে ইতিমধ্যে যা তার সংকল্পে চিড় খাইয়েছে। মল্লীর বাবা বেরিয়েছিলেন ওর জন্য পাত্রের অনুসন্ধানে ; কলকাতায় গিয়েছিলেন, রাঁচি হয়ে ফিরলেন।

রিক্‌শাটাও সরে গেল বেশ আপনা-আপনি, নির্ঝঞ্ঝাটে। আশা করে ওটা বোধহয় ফিরে আসবে না।

বিচ্ছেদের একটা বেদনা রয়েছে বৈকি ; অনেক-কিছু দিল রিক্‌শা, পথের জিনিস কিন্তু অনেক মূল্যবান স্মৃতিই জড়ানো ওর সঙ্গে। একটা বিদায়-বেদনা রয়েছে বুকে, তবু, কেন ঠিক বুঝতে পারছে না, যেন একটা বিরাট মুক্তি। যেন কোন এক দূর বিদেশে যাত্রা করেছিল—বনবাসই যেন—আবার ফিরে এল নিজের ঘরে।

আবার জেগে উঠেছে মল্লীর মুখ। নির্জনতায় অর্ধস্ফুটভাবে তড়িৎ কয়েকবার নামটা উচ্চারণ করল নিজের মনেই—মল্লী—মল্লী—মল্লী···রূপে-গন্ধে একটি মল্লিকার মতোই মিলে যাচ্ছে এই গন্ধাপ্লুত জ্যোৎস্নার সঙ্গে।

তারপরই হঠাৎ একটা পরিবর্তন হয়ে গেল ; চিন্তার আলোড়নে কখন কী-যে উঠে পড়ে !

একটা আতঙ্ক জাগিয়ে মল্লীর পাশে রতির মুখখানি ফুটে উঠেছে।

আজ সরোজিনী যখন রতিকে পড়াবার কথা তুলতে যাচ্ছিলেন, যে-আতঙ্কটা হঠাৎ তড়িতের বুকে এসে ধাক্কা দিয়েছিল। ওটা ছিল আন্দাজের ভুল, সরোজিনী গোড়াতেই কথাটা স্পষ্ট করেননি বলে।

কিন্তু যদি, যা আশঙ্কা করেছিল সেই অনুরোধই করে বসেন কোনদিন, রতির জন্য তাকে চেয়েই বসেন !

—এদিকে ঋণ পরিশোধ করতে তো আরও আষ্টেপৃষ্ঠে ঋণের দায়েই জড়িয়ে যাচ্ছেন।

(ত্রিশ)

পড়াতে সুরু করে দিয়েছে রতিকে।

রতির মধ্যে যে একটা পরিবর্তন এসে পড়েছে এটা মানপুর থেকে এসেই লক্ষ্য করেছে তড়িৎ। ও ছিল চপল, কৌতুকময়ী, খানিকটা হাস্যমুখরাও। অভ্যাসগুলা একেবারে যায় না, তবু বেশ বোঝা যায় ধীরে ধীরে সব-কিছুর ওপরই একটা যেন গাম্ভীর্যের প্রলেপ পড়ে যাচ্ছে। মানপুর থেকে এসেই সেই প্রথমদিনের কথাটা মনে পড়ে। বেশ হাসি-চপলতার মধ্যে দিয়েই গল্প করতে বসল রতি, কৌতুকছলে তড়িতের রাঁচির টানের কথাও তুলল—এখন বুঝতে পারছে সেটা মল্লীকে নিয়েই; তারপর তড়িৎ যেই মল্লীর সঙ্গে সই-গঙ্গাজল পাতাবার কথা তুলল, গম্ভীর হয়ে গেল, উঠে যেতে চাইল।

ক্রমে দেখছে শুধু গাম্ভীর্য নয়, একটা যেন আতঙ্কও ঘিরে থাকে ওকে। পড়া নিয়েই আজকাল ওর সঙ্গে বেশি সম্পর্ক ব'লে, পড়ার সময়েই সেটা চোখে পড়ে বেশি। একটু কিছু ত্রুটি হলে, তড়িৎ একটু টুকলে যেন অসহায় হয়ে পড়ে একেবারে। "হ'ল না? —হচ্ছে না?—পারব না তড়িৎদা।"—এ তো ওর মুখের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তড়িৎ ধারণাটা মন থেকে সরিয়ে দেওয়ারই চেষ্টা করে; বলে—"হবে না কেন? অনেক ছেলেমেয়ে পড়িয়েছি তো, তোমার না হলে বরং আশ্চর্য হওয়ারই কথা। তবে একটু মনটা বেশি করে দিতে হবে তো।"

"তা তো দিই।"

"দাও না। দিলে এরকম ছোটখাট ভুলগুলো হয়? এগুলো তো জান না বলে নয়, মন থাকে না বলে।"

এইরকম করেই চলছে। একেবারেই নিরক্ষর ছিল না, খাটেও, এগিয়ে যাচ্ছে ভালো রকমই, তবে ঠিক রাখবার বেশি সাবধানতায় জন্যই ওর যেন ও-দোষটুকু আর যাচ্ছে না।

একদিন এইরকম একটা ছোট ত্রুটি দেখে তড়িৎ একটু হেসেই বলল—"কী ভাবো বলো দিকিন অষ্টপ্রহর? অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবো তুমি।"

"অমনি অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে দেখলেন!"—আগেকার মতো একটু মুখ-ঝামটাই দিয়ে উঠল রতি।

ভালোই লেগে থাকবে তড়িতের, ওর এই আগেকার ভাবটা ফিরে আসা। হেসে, আগেকার মতোই কথা-কাটাকাটির ভঙ্গীতে ভুলটার নীচে আঙুল টিপে খাতাটা এগিয়ে

ধরে বলল—"এই ছাখো না রতি, প্রমাণটা তো আমারই হাতে। এ উদাহরণমালা প্রায় শেষ হয়ে এল, এখনও এ-ধরনের ভুল..."

উল্ট ফল হোল। "আপনি আমার কিছু ভালো দেখতে পান না—কিসে দু'কথা শোনাতে পারেন সেই চেষ্টায়..."

আর এগুতে পারল না, টেবিলের দু'টা হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এক এক দিন আগেকার রূপ বেশ ভালোভাবেই ফিরে আসে, যেমন এই ব্যাপারটুকু নিয়ে সেইদিন বিকালেই হোল।

অখিল কখনই এসব দিকে বড় একটা খোঁজ রাখতেন না, আজকাল আরও নয়। কারখানা বাড়াবার একটা কি বড় প্ল্যান হাতে নিয়েছেন, তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। সরোজিনী কিন্তু খোঁজ নেন মাঝে মাঝে। সেদিন বিকালে চা-জলখাবার খাওয়ার সময় প্রশ্ন করলেন—"তোমার ছাত্রী কিরকম পড়ছে বলো, ঠাকুরপো?"

আহারের সময়টা রতি থাকেই, এ বিষয়ে ভব্যতার অঙ্গ হিসাবে সরোজিনীরই নির্দেশ আছে। তড়িৎ বলল—"রতিকেই জিগ্যেস করুন না; আমি যদি ভালো বলি সে তো নিজের প্রশংসাই করা হবে।"

রতি বলল—"বাঃ, তা কেন! ভালো পড়ছি, এগুচ্ছি সে তো নিজের মেহনতের জন্যে, তাতে আপনার প্রশংসার কি আছে?"

"শুনুন বৌদি, শুনলেন তো? অথচ বিমলকে জিগ্যেস করুন, সে সমস্ত যশটা আমাকেই দেবে।"

"বোকার মতন।"

সরোজিনী হেসে কি বলতে যাচ্ছিলেন, রতি বাধা দিয়ে বললো—"বাঃ, তা না তো কি? আমি যতটা পড়ি তার মধ্যে হয়তো ঘণ্টা-দুয়েক থাকেন উনি। এ-দু'টি ঘণ্টার যশ নিন না উনি, কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব ক'রে দিতে রাজী আছি।"

সরোজিনী হেসেই বললেন—"ঐ দু'ঘণ্টাই তো আসল, ঠাকুরঝি; ব'লে দেওয়া, দেখিয়ে দেওয়া, ভুল বুঝিয়ে দেওয়া..."

তড়িৎ বাধা দিয়ে বলল—"তা বুঝি জানেন না? সেখানে আরও অপযশ আমার; আমি নাকি বকি, আমি নাকি শাসনে রাখতে চাই..."

"বলে যান, থামলেন যে?"

"বানানো কথা নয় তো যে বানিয়ে বানিয়ে সাপাড়ে বলে যাব। তবে যদি বলবে তো—আজ সকালেই…"

হঠাৎ থেমে যেতে সরোজিনীর দৃষ্টিটা আগে রতির ওপরেই গিয়ে পড়ল, একটু চোখ পাকিয়েই চেয়ে আছে তড়িতের দিকে। ঠোঁটের কোণে একটা হাসি চেপে বললেন—"শাসনের তত্ত্ব অত বুঝি না, কে কাকে যে করে। একটা এতবড় সুবিধে, পড়ে যান ভালো করে, তাহলেই। এদিকে ইচ্ছে তো কলেজ পর্যন্ত…"

"তোমায় কানে ধরে বলতে গেছি।"—ধমক দিয়েই থামিয়ে দিল রতি; বলল—"না বাপু, আমি যাই, দুজনে দু'ধার থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি মিথ্যে এনে হাজির—আমায় নাজেহাল করবেন।"

হনহন করে চলে গেল বাইরের দিকে।

এ-রূপ কিন্তু কমে আসছে দিন-দিনই। আগে এই সময়টা—বা অন্য কোন সময়, যখন সরোজিনী রয়েছেন কাছে, অনেকটা চেষ্টা করেও প্রফুল্ল থাকত, এখন যেন একটা বিষণ্ণতাই থাকে লেগে সর্বক্ষণ। একদিন ওর অবর্তমানে তুললেন কথাটা সরোজিনী—"একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ ঠাকুরপো?—আজকাল ঠাকুরঝির ভাবটা?"

"কী ভাব?"—ব'লে একটু চকিতভাবেই চাইল তড়িৎ।

"এই কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকে না সর্বদাই?"

"অতটা লক্ষ্য করিনি, তবে থাকে যেন একটু। আপনি বলায় মিলিয়ে দেখে মনে হচ্ছে বটে।"

একটু থেমে বলল—"কারণটা কি? পড়ার চাপ পড়েছে কি বেশি? তাহলে না হয় কমিয়ে আনি।"

"না, পড়ার চাপ আর কি? আর পড়লেও, সে তুমি কমাতে পারবে? কী উৎসাহ যে, তোমায় জানতে দেয় না। সেদিন কি আমি মিথ্যেকথা বলেছিলাম যে তাড়াতাড়ি স্কুলের পাসটা দিয়ে কলেজে যেতে চায়?…আমায় ধমকে উঠল বটে।…তুমি ছিলে তো সামনে?"

"আমি পথ আগলে দাঁড়াব?"—একটু হাসল তড়িৎ।

"তা নয়, চাপা মেয়ে তো। বয়েস হয়ে আরও ও-ভাবটা বেড়েছে।…অনেক কিছুই চেপে রাখতে চায়।"

"হুঃ",—ক'য়ে শুধু একটু হাসলই তড়িৎ।

দুজনেই একটু চুপ করে রইল, একসময় সরোজিনীই আবার বললেন—"আমার এক এক সময় কি মনে হয় জান ঠাকুরপো ?—ওর যেন একটা হারাই-হারাই ভয় লেগে থাকে সর্বদা:..."

"কী হারাই-হারাই ! হারাবে কি এমন ?"

"এই তোমাকে···মানে, ভালো একজন মাস্টার হিসেবে আর কি। তুমি ছেড়ে দিলে এমনটি তো পাওয়া যাবে না।"

"ছেড়ে দোব মানে ?···বলেছে নাকি এমন কথা আপনাকে ?"

"না, বলে না কিছুই। বললাম তো, যা চাপা মেয়ে!···আমার নিজেরই আন্দাজ, তার কারণ···আচ্ছা ঠাকুরপো, একটা কথা জিগ্যেস করি ?—দোষ হবে না তো।"

"করুন না, দোষ আর কি এমন ?" একটু হেসে বলল—"তেমন দোষের হলে আপনিই কি জিগ্যেস করবেন ?"

"জিগ্যেস করছিলাম—করো নাকি আরও টিউশনি কোথাও ?—এক এক দিন একটু রাত হয়ে যায় কিনা, তাই বলছি।"

আবার একটু হেসেই বলল তড়িৎ—"না, টিউশন করলে তো একটা বাঁধা সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত, নয় কি ? এ এক জায়গায় বসি গিয়ে সন্ধ্যের সময় কখনও কখনও। গল্পগুজবে এক এক দিন দেরি হয়ে পড়ে।"

এর পরেও যেন কিছু প্রশ্ন লেগে রইল সরোজিনীর দৃষ্টিতে—নিশ্চয়, জায়গাটা কোথায়, সঙ্গটা কাদের, কি রকম। কিন্তু মুখ ফুটে ও-বিষয়ে আর কিছু জিগ্যেস করলেন না। বললেন—"অনেক আবোল-তাবোল কি সব বকে গেলাম ভাই, দোষের যদি কিছু হয়ে থাকে তো বড় ভাজ বলে মাফ করতে হবে।"

খুবই অর্থপূর্ণ ছিল আজকের প্রশ্নগুলা সরোজিনীর, প্রত্যেকটিতেই উত্তরের অপেক্ষায় মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে রেখেছিলেন। ইঙ্গিতগুলাও করেছেন খুব সূক্ষ্মতার সঙ্গেই —"চাপা মেয়ে তো···অনেক-কিছুই চেপে রাখতে চায়।"···"ওর যেন হারাই-হারাই ভয়···তোমাকে···" (সামলে নিয়ে)···"ভালো মাস্টার হিসাবে আর কি।"

রতি কলেজ পর্যন্ত এগুতে চায় এ-কথাটা সেদিন থেকে এই দু'বার জানিয়ে দিলেন। মল্লীর কথাটা অলক থেকে রুবি, রুবি থেকে সরোজিনী পর্যন্ত যে চারিয়ে গেছে এতে আর সন্দেহের অবসর কোথায় ?

না, দোষ ধরে না তড়িৎ মোটেই। অনেক দিক থেকেই স্বাভাবিক এ-কৌতূহল সরোজিনীর পক্ষে। এ কথা তো নিজের কাছেও অস্বীকার করতে পারে না তড়িৎ যে, পাত্র হিসাবে সে পরম বাঞ্ছনীয়ই এঁদের পক্ষে। একরকম হাতের মুঠোর মধ্যেও, নিতান্ত দৈবযোগেই। এ মুঠো যদি একটু সুনিশ্চিত করতে চান তো দোষ দেবে কি করে? এর সঙ্গে আছে স্নেহ-প্রীতির বন্ধন, সেটা যে অকৃত্রিম এটা তো নিজের মন দিয়েও বোঝে তড়িৎ; এ বন্ধন যদি আরও দৃঢ় করতে চান সরোজিনী তো তাতেই বা দোষের কি থাকতে পারে?

ধরা যাক মল্লী আসেনি তার জীবনে, এ-অবস্থায় তড়িতের মনের ভাবটাই বা কি হোত? এখনও কি মনের ভাবটা খুব স্পষ্ট? এ কয়দিনে—মানপুরের সেই সন্ধ্যাটির পর থেকে, মল্লী হঠাৎ যেন অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে, নৈলে, ক'টা দিন আগেও কোথায় মল্লী, কোথায় রতি ঠিক কি বুঝতে পারত?

দোষ দেয় না সরোজিনীর। তড়িতের শুধু এই আশঙ্কা—তিনি যার ইঙ্গিত দিলেন আজ, তা যদি রতির অন্তরের কথাও হয় তাহলেও তো সর্বনাশ।

(একত্রিশ)

এর পর তিনটে মাস তড়িতের একেবারেই অন্য ঝোঁকে কেটে গেল যেন। একটি লক্ষ্যই রইল ধ্রুব হয়ে, পাস করতেই হবে যে-কোন রকমে। কড়া রুটিনের মধ্যে বেঁধে ফেলল নিজেকে—সকালে ঘণ্টা তিন ওদের ভাইবোনকে পড়ানো, এক এক করে, তারপর সমস্ত দিন নিজের বই। সন্ধ্যাটা একটু বেড়িয়ে আসবার জন্যে রেখেছে, রিক্‌শাটা আস্তে আস্তে ছেড়ে যাচ্ছে আপনা হতেই, সাইকেল নিয়েই বেরোয় বেশির ভাগ, সেখানেও এবারে বর্ষা ওকে বাধা দিয়ে সাহায্য করল পড়ার দিকে। সমস্ত দিনই চলেছে, না হয় সন্ধ্যার সময় নামল। বাড়িতেই সবার সঙ্গে গল্পগুজব করে, কিম্বা ছাতা মাথায় দিয়ে কারখানা থেকে খানিকটা ঘুরে আসে, তারপরেই আবার বই। যতিহীন বর্ষার সঙ্গে তাল রেখে ওর সাধনা চলেছে। পাস করতেই হবে। রাত্রির আধখানা ঐদিকেই যায় চলে।

এই তিনমাসের স্মৃতি একটানা এই সাধনারই স্মৃতি।

ব্যতিক্রমও আছে, তার মধ্যে একটির গুরুত্ব তড়িতের কাছে খুব বেশি, বিশেষ করে যে-নূতন সংকল্প নিয়ে আবার আরম্ভ করেছে।

পড়তে পড়তে যেখানে সংশয় উপস্থিত হয়, নোট করে রাখে, 'ফাদার-এম্‌-এর (Father M—) কাছে গিয়ে বুঝে নেবে। অনেকটা দূর, রোজ যাওয়া যায় না।

'ফাদার এম্‌' এখানকার মিশনারী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক। ওর—নিজের কলেজের না হলেও বেশ হৃদ্যতা হয়ে উঠেছে, খুব স্নেহ করেন।

দর্শনশাস্ত্রে ওঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে, তার ওপর চরিত্র-মাধুর্যের কথাও শুনেছিল তড়িৎ, পরিচয় করবার ইচ্ছা ছিল, তারপর একদিন দৈবযোগে হয়েও গেল। আর হোল যে, তাও ঐ রিক্‌শার মাধ্যমেই। শহরের বাইরে কোথায় গিয়েছিলেন, রিক্‌শা না পাওয়ায় হেঁটেই আসছিলেন, তড়িতের রিক্‌শাটা দেখতে পেয়ে ডেকে ভাড়া করলেন।

আগে চেহারা দেখা ছিল তড়িতের, সারা পথ বুকটা টিপটিপ করতে লাগল, সাহস সঞ্চয় করছে, এ সুযোগটা হাতছাড়া করবে না, কোনমতে পরিচয়টা করবেই। ভাবতে লাগল।

উনি বাসায় এসে নেমে ভাড়াটা দিতে গেলে বিনয়ের সঙ্গে শুদ্ধ ইংরাজীতে বলল— "আপনাকে বয়ে নিয়ে আসাটা জীবনে আমি একটা স্মরণীয় দিন বলে মনে করি ; যদি নিতান্তই জিদ না করেন তো ভাড়াটা না-নেওয়াই ইচ্ছা আমার।"

একেবারেই নাটকীয় ব্যাপার তো, খুবই বিস্মিত হয়ে পড়লেন, 'ফাদার-এম্‌' ; পরিচয় নিলেন। সংক্ষেপে সমস্তটুকুই দিল তড়িৎ, এখানে তো গোপনের কোন প্রয়োজন নেই। করমর্দন করে অভিনন্দিত করলেন 'ফাদার-এম্‌'। বললেন—"তুমি যে কলেজেরই ছাত্র হও, আমি যে-কলেজেরই শিক্ষক হই, সম্বন্ধটা আমাদের গুরু-শিষ্যেরই, বিশেষ করে তুমি যখন দর্শনের ছাত্র। বেশ, তুমি যখন তাই চাও, পয়সা দিয়ে তোমার এই সেবাটুকুর মর্যাদা হানি করব না, তবে এসো আমাদের সম্বন্ধটা পাকা করে নিই।"

ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে চা, টোস্ট, কেক খাওয়ালেন ভালো করে, অনেকক্ষণ গল্পসল্প করলেন। সময় পেলেই আসবার জন্যে ঢালা-নিমন্ত্রণ দিয়ে রাখলেন ; বললেন, যদি পড়াশোনার দিকেও কিছু প্রয়োজন থাকে তো উনি সাধ্যমতো সাহায্য করবেন।

ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে তড়িতের মনে হোল এখানেও যেন সে মানপুরের মাস্টারমশাইকে পেয়ে গেছে।

খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে, সুবিধা পেলেই যায়।

এবারেও কিছু প্রমাণাদি সংগ্রহ হলে, বেশ পরিষ্কার একটা দিন দেখে বিকালে উপস্থিত হোল। কলেজ বন্ধই রয়েছে, তবে 'ফাদার এম্' তাঁর বাসাতেই রয়েছেন। অনেকদিন পরে দেখা, খুব আহ্লাদ করে ডেকে বসালেন।

সংশয়গুলা মিটিয়ে নেওয়ার পর খানিকক্ষণ গল্পসল্পয় কাটল, চা-টোস্ট-ফল এল। কলেজ নেই, অনেকটা নিঃসঙ্গ জীবন, ওকে পেয়ে খুব খুশী হয়ে উঠেছেন।

ওঠবার সময় বললেন—"আর একটু বসেই যাও না-হয় তড়িৎ। একটা কথা তোমায় বলব কিনা ঠিক করতে পারছিলাম না, তারপর ভেবে দেখছি, বলে দেওয়াই ঠিক, তাতে তোমায় আরও তোমার চেষ্টায় উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে (May stimulate you to greater effort)। কথাটা হচ্ছে দর্শনের জন্য আর একজন প্রফেসার নেওয়ার কথা ভাবছি আমরা, আমি প্রিন্সিপ্যালের কাছে একটা প্রস্তাব দিয়েছি।"

ঠিক যেন বুঝতে না পেরে মুখের দিকে চেয়ে রইল তড়িৎ। উনি বলে চললেন—"তুমি যদি ভালো করে পাশ করতে পার তো তোমার জন্যে চেষ্টা করবার আমার ইচ্ছা আছে।"

তড়িৎ একটু ম্লান হেসে বলল—"অবস্থাগতিকে আমার সময় অনেক নষ্ট হয়ে গেছে, ফাদার (Father), যদি কোন রকমে পাসটা করে যেতে পারি তো নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব। তবু আপনার এই স্নেহ ও সহানুভূতির জন্যে কি করে ধন্যবাদ জানাই বুঝতে পারছি না।"

"কোনরকমে সেকেণ্ড-ক্লাসটা পাবে না? তাহলেও আমি লড়ব তোমার জন্যে—ভালো দরখাস্ত সব তো নিশ্চয় আসবে। আমি লড়ব তবুও। তোমার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তো রয়েছে আমার।"

উৎসাহের চোটে উঠে পড়েছেন, ঘরটায় পায়চারি করতে করতে বললেন—"আমি করব চেষ্টা। আর তুমি পাবেই।...এমন কি থার্ড-ক্লাস হলেও চেষ্টার ত্রুটি করব না আমি—তবে সেকেণ্ড-ক্লাস যদি একেবারে না পায় কেউ এবার।"

তড়িৎ দাঁড়িয়ে উঠেছে, হঠাৎ কাছে এসে ওর কাঁধের পেশীটা মুঠিয়ে ধরে বললেন—"কেন, তোমার তো চমৎকার স্বাস্থ্য রয়েছে। তোমাদের জাতি হিসাবে অপূর্ব স্বাস্থ্যই বলতে হবে, খেটে যাও।"

সেদিন ওর পড়ার রুটিনটা বেশ ব্যাহত হয়েছিল। ভেবেছিল অনেকদিন যতীদের ওখানে যায়নি, কলেজ থেকে ঐদিক হয়েই ফিরবে দেখা-সাক্ষাৎ করে। নূতন যে, একটা উৎসাহ পেল তাতে এ-লোভটা কাটিয়ে উঠল—কী জানি, যদি আটকা পড়ে

যায়, গল্পগুজবে কিবা আকাশের হঠাৎ পরিবর্তনে। মোক্তাই ফিরে এল বাবার। কিন্তু ঐ-উৎসাহেই মনটা এত চঞ্চল করে তুলল যে, অনেকক্ষণ পর্যন্তই বই নিয়ে বসতে পারল না—কত আশা, কত রঙীন স্বপ্ন, রামপুর নিয়ে; মল্লী-ই কী নেই সে-ভবিষ্যতে?

তারপর যখন রসমও পড়তে জোর করে, মন বসাতে পারল না একেবারেই। রাত্রিটা রঙীন স্বপ্নেই গেল কেটে।

আর একটা দিন। তার সঙ্গে আগের রাতটাও ধরে নেওয়া চলে।

দিন পনরো যায়নি মল্লীদের বাড়ি। অনেক দূর, আবহাওয়াও সেইরকম অনিশ্চিত, তার ওপর পড়ায়ও মনটা বেশ ভালোরকম বসে এসেছে। কিন্তু সেদিন ক্ষান্ত-বর্ষণ অপরাহ্নে এতদিনের অদর্শনটা হঠাৎ মনটাকে বড় ভারাক্রান্ত করে তুলল। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়ল তড়িৎ।

গিয়ে ত্যাখে দলের সবাই উপস্থিত। অর্থাৎ হুডরু-জোনহা-রামগড়ের সাথী যারা। সুতপার ভাইঝির অন্নপ্রাশন ছিল, অনুপের সঙ্গে সে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। মল্লী একটা পার্টি-ই দিয়েছে আজ। আকাশ পরিষ্কার থাকায় বাড়ির সামনে লনটাতেই দু'টা লম্বা টেবিল জুড়ে তার চারিদিকে বসেছে সবাই—প্রিয়রঞ্জন আছে, অতসী আছে, নলিনাক্ষ আছে। দেবপ্রসন্ন নেই, তিনি এই সময়টা একটু বেড়াতে বেরোন—নলিনাক্ষর গাড়ি থাকলে একটু দেরিই হয়ে পড়ে। একটা খালি চেয়ার একটু আলাদা করে রাখা হয়েছে।

তড়িৎকে পেয়ে সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। মল্লী অবশ্য বেশিই সবচেয়ে, আর সেই জন্যই বোধ হয় তার উল্লাসটা হঠাৎ একটু যেন হোঁচট খেয়ে গেল, প্রথম সম্ভাষণের পরই মুখটা গম্ভীর করে নিয়ে প্রশ্ন করল—"কিন্তু আপনি রোগা হয়ে গেছেন, তড়িৎবাবু—অসুখ-বিসুখ করেনি তো এর মধ্যে?"

ওদের সবার দিকে চেয়ে নিয়ে বলল—"হননি?"

ওর দিকে সবার নজর গিয়ে পড়ল। তড়িৎ বলল—"কিন্তু এখানে তো রোগা বলা নিষেধ বলেই জানি।...সেই সাহসে এলামও?

একটা হাসির মধ্যে কথাটা ঐখানেই শেষ হয়ে গেল।

মল্লী বেয়ারাকে আর একটা প্লেট এনে দিতে ফরমাশ করে বলল—"এড়িয়ে যান, কিন্তু আপনি এবারে বড্ড দেরি করেছেন, তড়িৎবাবু।"

সুতপা বলল—"আমাদের ক্লাবে বেশিদিন অ্যাব্‌সেন্ট থাকলে একটা দণ্ড দেওয়ার নিয়ম ছিল না মল্লী ?"

বেয়ারা প্লেট নিয়ে এল। তড়িৎ দাঁড়িয়েই খালি চেয়ারটার পিঠে হাত দিয়ে গল্প করছিল। নলিনাক্ষ নিজের চেয়ারটা একটু সরিয়ে বলল—আপনি আমার এখানটায় এসে বসুন, তড়িৎবাবু।···বেয়ারা, প্লেটটা এখানে দিয়ে দাও।"

মল্লী একেবারে ডুকরে হেসে উঠল ; বলল—"ঠিক হয়েছে, এর চেয়ে বড় দণ্ড কল্পনাই করা যায় না ; মহুয়ার অঙ্ক কষুন পাশে বসে এবার !"

যতক্ষণ দেবপ্রসন্ন না ফিরলেন ততক্ষণ এইরকম হাসি-তামাসা, এইরকম মুক্ত উল্লাসের মধ্যে দিয়ে কাটল। ক'দিন পরিষ্কার আকাশ, তার সঙ্গে এদের নিশ্চয় খানিকটা মুক্ত অবকাশ দেওয়ার ও ইচ্ছাটা রয়েছে ; উনি ফিরলেন বেশ দেরি করেই। বেয়ারা আর-একখানা চেয়ার রেখে গিয়েছিল, বসতে বসতে বললেন—"তোমার গাড়িটার আজ খুব সদ্ব্যবহার করা গেল, নলিনাক্ষ—কী ব'লে যে তোমায় আশীর্বাদ করব !"

নলিনাক্ষ বলল—"এইটেই তো মস্তবড় আশীর্বাদ, আপনার সেবায় লাগাতে পারছি।"

"ওটা যেন আমার দিকে এসে পড়ল না—অবশ্য তুমি যে এতে একটা অকৃত্রিম আনন্দ পাও সেটা বুঝি···"

"তাহলে আর একটা ভালো আশীর্বাদ হতে পারে জ্যাঠামশাই।"—মল্লী বলল।

"কি মা ?"

"বলুন—তোমার ব্যবসা সফল হোক !"

দেবপ্রসন্ন থাকার জন্য হাসিটা আর সেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারল না, সবার টেপা ঠোঁটের মধ্যে খানিকটা আবদ্ধ হয়েই রইল। খোলাখুলি ভাবে বরং দেবপ্রসন্নই হেসে উঠলেন, তারই মধ্যে বললেন—"তা হবেই সফল, দেখো তোমরা। নলিনাক্ষ হোল, তড়িৎ হোল—এরা আর সবার মতন বাঁধা পথ ধরে যাওয়ার মানুষ নয়, এরাই শেষ পর্যন্ত—"

নলিনাক্ষ ভয়ের অভিনয় করে উঠল—"ওকি করছেন আপনি ! মল্লী দেবী এক্ষুনি বলবেন—এইজন্যেই তড়িৎবাবুকে দলে টানতে চাই আমি—পার্টনার করতে চাই—ডেকে পাশে বসাই।"

সবার চাপা হাসিটাকে ওই করে দিল মুক্ত।

আরও খানিকটা এ-গল্প সে-গল্পর পর তড়িৎ উঠতে চাইলে মল্লী বাধা দিল—সুতপা নূতন সব কীর্তন শিখে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে, শুনতে হবে না? আকাশের অবস্থা তো ভালোই আজ। খোলা জায়গায় গান জমবে না, ওরা সবাই বৈঠকখানায় গিয়ে বসল।

বেশ জমে উঠল আসর। সুতপা প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় নিয়ে একটা বৈঠকী কীর্তনই গাইল। মল্লীও বেশ খানিকক্ষণ ধরে একটা মালকোশ বাজাল; তারপর অতসী একটা রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেষ করে আধুনিক গান ধরবে, এমন সময় বাইরে হঠাৎ গুড়গুড় করে একটা শব্দ উঠল। সবাই মুখ ঘুরিয়ে কান পাতল, আবার উঠল আওয়াজটা।

"নাঃ, জালালে! দেখি একবার"—ব'লে তড়িৎ উঠে গেল। ফিরে এসে বলল—"পূব দিকে বেশ খানিকটা উঠে এসেছে কখন। আমাদের তো অনেকখানি দূর; বেরিয়ে পড়ি।"

সুতপা বলল—"এবার যেন জিদ লেগে গেছে রাঁচির আকাশের; করবেই সব পণ্ড।"

বিরক্তিতে ভরে গেছে মল্লীর মুখটা; বলল—"তাই না তাই! আমি কোথায় একটা মতলব ঠাউরেছিলাম, কাল রামগড়ে দামোদর দেখতে যাব।...তা আমারও জিদ, যাবই আমি, আকাশ ভেঙে পড়লেও মাথার ওপর।...এরকম কুনো হয়ে বসে থাকা অসহ্যি হয়ে উঠেছে।"

দেবপ্রসন্নর অনুমতির জন্য তাঁর মুখের দিকে চেয়ে জিদের ভঙ্গিতেই বলল—"হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, যাব।"

দেবপ্রসন্ন হেসে বললেন—"তা যাবে; বর্ষা নামলেও যদি উৎসাহটা থাকে।"

"থাকবে।...আর কে কে যাবেন আমার সঙ্গে?"

অনুপ বলল—"আমি তো যাবই। রাঁচির বর্ষা দেখলাম, কিন্তু বর্ষার রাঁচি দেখা হয়নি আমার।"

সবাই যাবে, শুধু তড়িৎ কী ছুতা একটা বের করবে মনে মনে ভাবছিল, মল্লী প্রশ্ন করল—"আপনি তড়িৎবাবু?"

"সেরকম বৃষ্টি হ'লে..."

"এখান থেকে না-হয় গাড়িটা পাঠিয়ে..."

—নিশ্চয় আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল মল্লী, তড়িৎ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—"কিন্তু আপনি তো বাসা চেনেন না আমার।"

"ও, তাও তো বটে!"—ব'লে খানিকটা থতমত খেয়েই দৃষ্টি নত করল মন্টী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যখন তুলল, তড়িৎ বেশ সহজভাবেই বলল—"তা না-হয় আসব একটা রিক্‌শা করে নিয়ে। কখন বেরুবেন?"

"এগারটা—কি বলেন?"—নলিনাক্ষ, অনুপ আর প্রিয়ব্রতনের দিকে চাইল মন্টী।

(বত্রিশ)

প্রায় সমস্ত দিনটাই লেগে গেল, রুটিনের প্রায় সবটুকুই নষ্ট হোল। সকালের দুটো কাজ—ওদের দুজনকে পড়ানো যে কোন রকমে সারল তার কারণ একেবারে অন্য। বাইরে যেতে হবে, সমস্ত দিন হয়তো বাইরে-বাইরেই কাটবে—এ কথাটা রতির কাছ থেকে লুকিয়ে কোনরকমে বেরিয়ে পড়তে পারলেই যেন ভালো। ভয়, কি কুণ্ঠা, কি অন্য কিছু বুঝতে পারা যায় না; অথচ ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে, অখিল বা সরোজিনী যখন জানবেন তখন একটা প্রশ্ন করবেনই, বৃষ্টির সম্ভাবনার মধ্যে সমস্ত দিন বাইরে থাকায় মৃদু আপত্তিই করতে পারেন, রতি কিন্তু সে-সব কিছুই করবে না। হয়তো বেরুবার সময় দোরের পাশে কিম্বা থামের আড়ালে হঠাৎ নজর পড়ে যেতে দেখবে রতি মুখটি চুন করে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে রাজ্যের উদ্বেগ আর ভয়। একজন ভয় করবে, তার জন্য ভয়—একটা সম্পূর্ণ নূতন অনুভূতি বৈকি।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরনের কিছু হোল না। ওদের পড়ানো পর্যন্ত কথাটা ভাঙল না তড়িৎ, তারপর সরোজিনীকে যখন বলল রতি সেখানে দাঁড়িয়েই ছিল। যেন কতকটা ও থাকার জন্যই অনেকখানি খুলেই বলল—কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে দামোদর দেখতে যাবে, ফিরতে দেরি হয়ে যেতে পারে। একটু আপত্তিও করলেন সরোজিনী—বর্ষায় আট-দশ মাইল পাহাড়ের গা বেয়ে যেতে হবে, দামোদরও উদ্দাম এবার, পরে গেলে হোত না?

রতির সঙ্গে আপনা থেকেই চোখোচোখি হয়ে গেল। বেশ সহজ ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, যেমন শোনবার আগে তেমনি শোনবার পরে। তড়িতের মুখ থেকে যেন আপনিই প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল—"রতি কিছু বললে না?"

রতি একটু হেসে বলল—"বলে ফল? যেমন বৌদির কথা শুনবেন না, তেমনি আমার কথাও শুনবেন না, শুধু মুখ নষ্ট করা বৈ তো নয়।"

"তবু শুনি না।"

"সঙ্গে নেবেন ?…তা বৈকি, আমাদের যেন ওসব ইচ্ছা করতে নেই। ঘরের মধ্যে পচে মরো তোমরা।"

এই কথাই যে বলতে চেয়েছিল এটা অবশ্য বিশ্বাস করতে পারল না তড়িৎ। আজ পড়ানোর মধ্যে অন্যমনস্কতা থেকেই ও যেন সন্দেহ করেছে, কিছু একটা আছে, দূরে থেকে যেন ঘুরেছে সঙ্গে সঙ্গে সেই কিছুটা যে কি সেটা আবিষ্কার করবার জন্য। তারপর যখন হোল আবিষ্কার, ও নিজেকে সামলে নিল। অনেকক্ষণের সন্দেহ বলেই পারল সামলাতে—মনটা প্রস্তুতই ছিল তো।

এ যেন আরও করুণ, এই আত্মগোপন, এই অভিনয়। ওর এই অভিনয়, এই কান্না চেপে হাসির স্মৃতিটুকুই মনে নিয়ে বেরুল তড়িৎ। সমস্ত পথই ঐ চিন্তা—সত্যই কি রতি এত দূর এগিয়ে পড়েছে ? আরও এগিয়েই যাবে নাকি এই ব্যর্থতার পথ ধরে ? কিন্তু তড়িৎই বা কি করে ? কি ক'রে বোঝায় ওর পথ একেবারেই অন্য দিকে ? ও যে কত অসহায় সে কথা কি করে জানিয়ে ওকে সতর্ক করে দেয় ?

বহুক্ষণই লেগে রইল চিন্তাটা। মল্লীদের বাড়িতে এসেও। হাসি-আলাপের মধ্যে, যাত্রার প্রস্তুতির মধ্যে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক করে দিতে লাগল; বেরিয়ে পড়বার পর পথের মধ্যেও। তারপর একসময় মল্লীর একটা কথায় মনটা সচেতন হয়ে উঠল; মল্লী একটা ভুল উত্তরের সুযোগ নিয়ে বলল—"আজ তড়িৎবাবু যেন শুধু শরীরটাকেই নিয়ে বেরিয়েছেন, মনটা পেছনে রেখে।"

হঠাৎ ওর চোখের ওপর চোখ ফেলতে তড়িতের যেন মনে হোল ওর কথাটার ভেতর আর একটা কথা আছে।

অনুপ কিছু না জেনেশুনেই বলল—"যদি ভালো হাতে জমা রেখে এসে থাকেন তো ভালোই তো।"

নাই জানুক, কথাটা কিন্তু এত স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আরও সতর্ক করে দিল তড়িৎকে। এরপর পাহাড়ে অঞ্চলটা এসে পড়তে ওরা একটা অন্য জগতেই প্রবেশ করল; এদিককার সব মুছেই গেল একরকম।

বর্ষাপুষ্ট অরণ্যানী নিবিড়ভাবে পাহাড়ের গা ফেলেছে ঢেকে। হালকা থেকে আরম্ভ করে গাঢ়তম সবুজের সমারোহ চারিদিকে, তার মধ্যে দিয়ে সর্পিল গতিতে পিচঢালা পথ বেয়ে চলেছে ওদের মোটর। কখনও দুদিকেই উত্তুঙ্গ পাহাড়, কখনও একদিকটায় মিলিয়ে গেল। হাত কয়েক পরেই গভীর খাদ, নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা, এত নিবিড় যে রাত্রের অন্ধকারকে যেন আটকে রেখেছে ভেতরে, যেন অজানা রহস্যে

গেছে মিলিয়ে। একবার খানিকটা চক্র দিয়ে—ওরা একবারে ফাঁকার মধ্যে এসে পড়ল। ডান দিকটায় খাদ, পাহাড়, জঙ্গল আর কিছুই নেই, যে পাহাড়টার গা বেয়ে যাচ্ছে সেটা একেবারে শেষ হয়ে গেল। মাঝ আকাশ দিয়ে চলছে যেন ওরা, ডান দিকটায় দু'চার হাত পরেই আর কিছু নেই। নীচের দিকে চাইলে মাথা ঝিমঝিম করে—অনেক নীচে ঢেউ-খেলানো প্রান্তর—একটা বোধ হয় সত্তর-আশি মাইলের বৃত্ত নিয়ে একেবারে দিক্‌রেখা পর্যন্ত চলে গেছে—কোথাও পাহাড়, ছোট-বড় সবুজের স্তূপ, কোথাও গ্রাম, কোথাও জলধারা, সূর্যের কিরণ পড়ে চিকচিক করছে—একটি বিরাট ক্যানভাসে যেন একখানি ছবি বিছিয়ে রেখেছে কে।

ওরা নামল এখানটায়। রাস্তার কিনারা পাথরের নীচু দেয়াল দিয়ে বাঁধানো। গিয়ে বসল। উঠে হেঁটেই চলল খানিকক্ষণ। সমস্তটুকুর মধ্যে কেউ একবার একটা কথা বলল না। কী একটা বিরাট সত্তা নিজের অসীমত্বের ইঙ্গিত দিয়ে যেন সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। একটা বাঁকের পর আবার ডানদিকে পাহাড় এসে পড়ল। সেই ক্ষণদৃষ্ট অসীম-অপ্রমেয় নিজের ওপর অবগুণ্ঠন দিল টেনে। ওরা মোটরে এসে বসল আবার।

দামোদর দেখে কিন্তু সবাই নিরাশ হোল, কিম্বা, অন্যভাবে বলতে গেলে, দামোদর ওরা দেখতেই পেল না। এখানে নদীটা একটা অপ্রশস্ত আর অগভীর শিলাময় খাতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত, অস্বাভাবিক বর্ষায় সেটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে ঢেকে গেছে। এপারে রামগড় শহরটা, তার অনেকখানি পর্যন্ত ডুবিয়ে একটা বিরাট জলরাশি প্রবল বেগে চলেছে বয়ে। নদী দেখা আর বন্যা দেখা এক কথা নয়; ওরা জল থেকে খানিকটা তফাতে মোটর থেকে নেমে বন্যাই দেখল খানিকটা। আজ আর অন্যদিনের মতো রেঁধে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়নি, তোয়ের খাবার আর ফ্লাস্কে চা রয়েছে—প্ল্যান ছিল শহর থেকে একটু সরে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে আসবে, তা নিরিবিলি জায়গা বন্যায় আর রাখেনি কোথাও। আসবার সময় সেই ফাঁকা জায়গাটার পরেই যে পাহাড়টা দেখেছিল তার কোলে খানিকটা সমতল ভূমি আছে, রাস্তার পর থেকেই বেশ খানিকটা ভেতর পর্যন্ত। ঠিক হোল সেইখানেই বনভোজনটা সারবে। মোটর ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

ফেরবার পথে নূতন দেখার নেশা যখন মিটে এসেছে, দীর্ঘ শফরের ক্লান্তিতে সবার মুখরতাও এসেছে কমে, তড়িতের মনটা ধীরে ধীরে আবার অন্তর্মুখী হয়ে উঠল এবার কিন্তু আর রতির কথা নিয়ে নয়; মল্লীকে নিয়ে। অনেকদিন পরে বেরিয়েছে,

প্রস্তাবটা তারই, অভিযানটা মোটের ওপর বেশ সফলও হয়েছে,—মল্লী আজ বেশি উচ্ছ্বসিত ছিল অন্যদিনের চেয়ে। প্রথমত গোড়াতেই গাড়িতে বসার ব্যবস্থাটা একটু রদ-বদল করে দিল। অন্যদিন ছিল এক মোটরে মেয়েরা, অন্য মোটরে পুরুষেরা, আজ ঠিক করল ওদের মোটরের একজনকে সরিয়ে অনুপ বসবে। বলল—"পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্যে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ দেখবার জায়গা আছে, আপনি নতুন মানুষ মিস্ (miss) করে যেতে পারেন। কে নামবে তাহলে ?"

নিজেই বলল—"সুপা-ই তবে নিজের জায়গাটা দিয়ে চলে যাক ও-গাড়িতে।"

সুতপা একটু কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কি একটা বলল। প্রগল্ভও হয়ে পড়েছে মল্লী, সবাইকে শুনিয়েই অনুপকে বলল—"বলছে, কেড়ে নিবি নাকি ?... কি করি তাহলে ?...আঁচলের হীরেই তো।"

অনুপ বলল—"হীরে আঁচল থেকে যদি মুকুটে জায়গা পায় তো, তার তো আপত্তি থাকতে পারে না।"

ওটা ঠিক হয়ে গেলে, মল্লী একটু কুণ্ঠিতভাবেই তড়িতের দিকে চেয়ে বলল—"আপনারও তো দেখা নেই এদিকটা তড়িৎবাবু।"

তড়িৎও একটু কুণ্ঠিতভাবেই উত্তর করল—"পাস (pass) করেছি একবার, তবে সে সন্ধ্যের পর..."

"তাহলে আপনিও আসুন। অতসী দাদার গাড়িতে যাবে ?"

এ-গাড়িটাই বড় আর আরামের। তড়িৎ বলল—"কি দরকার ? আমি সামনের সীটে বসি না, খালিই রয়েছে তো।"

মল্লী বলল—"তাহলে তুইও থাক্. সুপা ; ওদিকে তোরও ধুক্পুকুনি এদিকে অনুপবাবুরও ধুক্পুকুনি, কাজ কি ?—একটা শুভযাত্রায়।"

অনেক রূপেই দেখল আজ মল্লীকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে—পথের মধ্যে যখন দেখিয়ে দেখিয়ে যেতে লাগল—কী সূক্ষ্ম, দুর্লভ কবি-দৃষ্টি ওর! এক এক সময় নিজেকে যেন ভুলে যাচ্ছে, ভাষা হয়ে উঠছে উচ্ছল, মুখে একটা আলো ফুটে উঠছে। ফাঁকা জায়গাটায় এসে সবার সেই যে নীরবতা, তাও যেন অত উচ্ছ্বাস থেকে মল্লী মৌন হয়ে উঠেছে বলেই। মল্লীই যেন একটা মৌন উপাসনা পরিচালনা করে নিয়ে গেল।

তারপর রামগড়ে পৌছে ওর মুখের সেই নিরাশা, সমস্ত দিনটাই যেন তার ব্যর্থ করে দিল দামোদরের বন্যা।

ফেরবার সময়ও বসবার ঐ ব্যবস্থাই রয়েছে। মল্লী যখন কিছু দেখিয়ে দিচ্ছে, ঘুরে চাইছে তড়িৎ, কথা হচ্ছে; যখন নীরব রয়েছে, ওর সমস্ত দিনের বিচিত্র রূপ জুড়ে বসছে মনটা।

ওরা পৌছাল সন্ধ্যার একটু আগেই। বেয়ারা চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল। চা শেষ হলে প্রিয়রতন উঠতে যাচ্ছিল, নলিনাক্ষ বলল—"একটু বসবে না? কাল অনুপবাবু তো চলে যাচ্ছেন।" প্রিয়রতন বসল আবার।

তড়িৎ বলল—"আমার কিন্তু যেতে হবে।"

"একটুও বসবেন না?"

মল্লী বলল—"না, ওঁকে ছেড়ে দিন। এমনিই হয়তো অনেকটা ক্ষতি করিয়ে দিলাম আজ।"

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল রতিকে নিয়ে; ফিরছে, তার স্থানে মল্লী। সবচেয়ে শেষের রূপটি রয়েছে মনে টাটকা। আগে এই কথাটিই মল্লী বলতো একটু ঠাট্টার আকারে, মেয়েলি 'ঠেস' দিয়ে। আজ কিন্তু তা বলেনি। মুখে সত্যই একটু যেন অনুতাপ লেগেছিল, সত্যই ওকে যেন বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্যই বলল কথাটা। ওকে ছেড়ে দিল।

তাহলে সেদিন ওদের বাসায় এসে সত্যই কি এ-কথাটাও জেনে গেছে যে তড়িৎ এম এ.-র পরীক্ষার্থী?···জানুক—জানুক। না জেনে থাকে, নিজেই জানাবে একদিন এবার। মল্লীর কাছ থেকে তার আর কী গোপনীয় থাকতে পারে?

ফিরল যখন, সন্ধ্যার ছায়া একটু একটু নেমেছে। ছেলেমেয়েরা বাইরে ছিল না। তড়িৎ নিজের ঘরের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, রতি ভেতরে কি করছিল, বেরিয়ে এসে চৌকাঠে দাঁড়াল। ধক করে একটা আঘাত লাগল তড়িতের বুকে; রতির চোখে-মুখে সেই ভয়, যার আশঙ্কা করেছিল তড়িৎ, যা রতি বেরুবার সময় লুকিয়েছিল। এই ভয় বুকে করে সমস্ত দিনটা কাটাতে হয়েছে ওকে।

মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড, তারপর মুখখানা আলো করে হাসি ফুটে উঠল।

এ-হাসি তখনকার মতো অভিনয় নয়। বলল—"আপনি আজ খুব সকাল-সকাল এসে গেছেন তড়িৎদা; যাক!"

"ভাবছিলে নাকি?"—তড়িতের মুখ দিয়ে একরকম নিজেই বেরিয়ে গেল কথাটা।

আগেকার মতো একটু মুখনাড়া দিয়েই জবাব দিল রতি—"বড় দোষ ভাবনার! বর্ষা-বাদলের দিন—তাঁর গেছেন পাহাড় ডিঙিয়ে দামোদর দেখতে—যত আদাড়ে কাণ্ড!

(তেত্রিশ)

এইটেই ছিল সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম, সময়ের দিক থেকে, আবার মনের দিক থেকেও। এ ছাড়া ছোটখাট ব্যাঘাতও এসে পড়েছে মাঝে মাঝে, যা অনিবার্য, কিন্তু তার দরুণ যা ক্ষতি শেষ পর্যন্ত সেটাও গেছে পুষিয়ে।

কঠিন পরিশ্রমে মাঝে একবার একটু অসুস্থও হয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে ছিল, রতিকে আলমারি থেকে একটা বই বের করে দিতে বললে, সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—"পড়বেন নাকি।"

"শুয়ে শুয়ে করি কি? বিশেষ তো কিছু হয়নি।"

"সমস্ত দিন এক গেলাস বার্লি খেয়ে আছেন শুধু।"

"তুমি দাওনা ঐ মোটা বইটা।...কিছু না হোলেও দাদা-বৌদি যদি বার্লিরই ব্যবস্থা করেন; হাত আছে কিছু?"

রতি মুখটা ভার করে বইখানা এনে বিছানায় রেখে দিল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তড়িৎ দরজা পর্যন্ত তাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করে, একটু মুখ টিপে হেসে বইটা খুলল।...কাল সন্ধ্যায় অসুখের সূচনা থেকেই ওর ভাবান্তর দেখা দিয়েছে এইরকম।

একটু পরে সরোজিনী এসে উপস্থিত হলেন। "কি রকম আছ?"—বলে একটা চেয়ার টেনে মাথার কাছে বসে কপালে হাত দিয়ে বললেন—"কম একটু।... তা আজকের দিনটাও পড়ায় কামাই যাবে না? একে তো ক্রমাগত বইয়ে মুখ গুঁজে থেকেই এটি হয়েছে।"

তড়িৎ একটা পাতা ওলটাতে ওলটাতে প্রশ্ন করল—"রতি বুঝি পাঠিয়ে দিলে আপনাকে?"

"তা কি করবে? ছাত্রী হয়ে বাধ্য হতে হয়েছে; নিজে তো কিছু বলতে সাহস হয় না আর।"

"বলল বুঝি আপনাকে ঐ কথা?"

"থাক্‌, কি বলল না বলল সে-কথা।...সাহসের কথায় মনে পড়ে গেল ঠাকুরপো। ঐ সাহস হচ্ছিল না বলেই এতদিন বলি বলি করেও বলিনি, আর কিন্তু না-বলা ঠিক হয় না। বাড়াবাড়ি করতে করতে শরীর একটু একটু করে কাহিল হয়ে আসছে তো। তাই তো এসে পড়ল অসুখটা ?"

মাথাটা ঘুরিয়ে চাইল তড়িৎ; বলল—"অসুখের ব্যাপারটাই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি বৌদি ? কালও এরকম শুকিয়ে রাখতে চান তো আমি হেঁশেল থেকে ভাত-ডাল চুরি করে এনে খাব।"

একটু হেসে বলল—"আমার বাধ্য ছাত্রী আছে।"

সরোজিনীও হাসলেন। একটু যেন সময় নিয়ে বললেন—"চুরি শেখাও চোর হবে, আমরা হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি।...থাক ওসব ঠাট্টার কথা; শোন ঠাকুরপো—একসঙ্গে রয়েছি এতদিন, কিন্তু এখনও যেন পর করেই রেখেছ, তাই বলতে সাহস হয়নি। কিন্তু, ঐ তো বললাম, এবার শরীরের ওপর এসে পড়ছে। কথাটা হচ্ছে—আমার একলার নয়, তোমার দাদারও এই কথা—পরীক্ষাটা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এদের দুজনকে পড়ানো বন্ধ রাখতে হবে তোমার। আর কি, বোধ হয় মেরে-কেটে মাসখানেক আছে, বন্ধ রেখে ঐ ঘণ্টা তিন রাত্তির জাগা কমিয়ে আনতে হবে ওদিকে। একটা মাস বৈ তো নয়।"

"আমার ধার শোধের পঁচিশটা টাকা কমে যাবে যে।"

"বলিনি ?—পর ভাবো বলেই তো কথাটা মুখ থেকে বের করতে পারলে ঠাকুরপো। সাহসের কথা এইজন্যেই বলছিলাম। টাকাটা নেবে না, এর পর বলবে—পড়াই না যখন, তখন হোটেলেই খেয়ে আসব, হয়তো বলবে বাড়িতেই বা থাকি কেন ?—পর বলেই তো ?..."

পড়ছিল না তড়িৎ, আস্তে আস্তে পাতা উল্‌টে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বলল—"এবার আমি একটা কথা বলি বৌদি ?"

"বলো।"

"যদি বিশ্বাস করেন যে আপন ভাইপো জেনেই বলেছি। বিমলের এটা পরীক্ষার বছর, একটু আধটু যা দেখে যাচ্ছি রোজ ওটা চলতে দিন। তবে, কথা দিচ্ছি, যেটুকু নেহাত দরকার তার বেশি দোবো না সময়।"

"ঠাকুরঝির ?"

তড়িতের বুকটা ধুকধুক করে উঠল। এইমাত্র সরোজিনী যে সঁপে দেওয়ার কথা

বললেন, (যদিও, যেন ছাত্রী হিসাবেই) সেটা কানে লেগে আছে, তার সঙ্গে অনেক দিনের এই ধরনের আরও কথা, আরও ইঙ্গিত। যে আশা নিয়ে এই সব, তার ওপর একটা মৃদু আঘাত দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া উচিত নয় কি? বেশ একটু নিষ্ঠুর হয়, কিন্তু উপায়ই বা কি? এমন একটা সুযোগও তো আসেনি এতদিনে।

তবে নিষ্ঠুরতা বলেই একটু যেন বেধে গেল, বিমলের মতো একেবারে অতটা কাছে টানতে পারল না; বলল—"আপনার ঠাকুরঝির সম্বন্ধেও ঐ কথা, বোনের মতনই তো। নতুন আরম্ভ করেছে, ক্ষতিই হবে। তবে কারুর বোন যদি অবাধ্য হয়—বলবে কাজ আছে, মাথা ধরেছে, কি করবেন আপনি?"

এবার আর ঘুরে মুখের দিকে চেয়ে বলতে পারেনি, দেখতে পেল না—যে কাজের জন্য এসেছেন তাতে সফল হয়েও সরোজিনীর মুখটা কিরকম একটু বিবর্ণ হয়ে গেল।

সকালের ও-সময়টাও পড়ায় গেল। অবশ্য তার জন্য রাত্তির থেকে কিছু যে কাটা গেল তা নয়; বরং ওদিকেও গেল বেড়েই। আর ক'টা দিনই বা? আর সব কিছুই মিটে গিয়ে একটা লক্ষ্যই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; পাস করতেই হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে মিলে রয়েছে একখানি মুখ। পাস করা আর মল্লী যেন একার্থক হয়ে উঠেছে তড়িতের কাছে। পাস করতে হবে এই বছরই।…মল্লীর বাবা ওর জন্য সম্বন্ধ করতে এসেছিলেন। কি হোল একটা উদ্বেগ লেগে রয়েছে।…পরীক্ষাটাকে যদি এগিয়ে আনা যেত! পরীক্ষার ফল বেরুতে সেইরকম বিলম্ব হবে এবারও?

একদিন আবার দেখাও করল ফাদার 'এম্'-এর সঙ্গে। কতকগুলো প্রশ্ন জড়ো করেই। তবে উদ্দেশ্যটা—কতদূর কি হোল তাঁর প্রস্তাবের। উৎসাহই নিয়ে এল সঙ্গে করে!

পরীক্ষা এসে পড়ল।

একদিন পরীক্ষা দিয়ে ফিরছে, বড় রাস্তা থেকে ঢুকতেই ছাখে দু'খানা মটর-ট্রাক চলেছে সামনে কারখানার দিকে, দু'খানাতেই দেবদারু কাঠের বাক্স বোঝাই করা।

পরীক্ষা ভালো হচ্ছে, আজ অর্ধেক হয়েও গেল, ক্লান্ত থাকলেও মনটা আছে প্রসন্ন; রিক্‌শা থেকে নেমে কারখানাতেই চলে গেল। মাল আসার সঙ্গে অখিলও এগিয়ে এসেছেন, প্রশ্ন করল—"একেবারে অনেক প্যাকিং-বক্স যে অখিলদা?"

"আজ তোমার কেমন হোল ?"

তড়িৎ বলল।

অখিল বললেন—"তোমায় সেই বলিনি যে, বাড়াব কারখানাটা ? লোক পাচ্ছিলাম না, এতদিনে একজনকে পেয়েছি। অবশ্য নিজের লোক ট্রেন করে নিলেই ভালো হোত, তুমি একবার বলেওছিলে বিমলের কথা, কিন্তু বড্ড ছেলেমানুষ তো। আর ভেবে দেখলাম—অন্তত কলেজটা ছুঁয়েও আসুক একবার ; ব্যবসায় একটু উঁচুর দিকে গেলে আজকাল দরকার হয়,—দেখছ না, মাড়োয়ারীরাও তাদের ছেলেদের কলেজ ঘুরিয়ে আনছে আজকাল।"

কম কথারই মানুষ, বোধ হয় মালপত্র এসে যাওয়ার উৎসাহের মুখে খানিকটা বলে গেলেন। মুখটাও বেশ দীপ্ত হয়ে উঠেছে, অস্তগামী সূর্যের আলোয় আরও দীপ্ত দেখাচ্ছে।

তড়িৎ প্রশ্ন করল—"এ লোকটা ?"

"কাজ জানে ভালো, বাজার বেশ বোঝে। বাঙালী।...এবার তো রিক্শা ভাড়া দেওয়াই নয় শুধু...রিক্শা তোয়ের করবার প্ল্যান, তারই সরঞ্জাম সব। পেছনের জায়গাটা কিনে নিলাম, ওখানেই নতুন কারখানাটা তুলবো—টিন লোহা সব এসে গেছে...চলো না, দেখবে ?"

পা বাড়িয়ে আবার থেমে গিয়ে বললেন—"তুমি আগে বাড়ি গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে জলটল খেয়ে নাও। সব শুনবে। একটা বড় রিস্ক্ (risk) নেওয়া গেল, না হলে হয় না। এতে এগুবার পথ অনেক।"

বাসায় যেতে যেতেই একটু ঘুরে দেখল—রাজমিস্ত্রীর কাজও আরম্ভ হয়ে গেছে, কয়েকটা লোহার থামও খাড়া হয়েছে। ও একেবারেই ডুবে ছিল নিজের পড়া-পরীক্ষা নিয়ে, লক্ষ্য করেনি।

বেশ এগিয়ে চলেছে পৃথিবীটা। অখিলদার উৎসাহ-দীপ্ত মুখটা বড় ভালো লাগছিল, অতটা উচ্ছ্বসিত উনি বড় একটা হন না। আরও ভালো লেগেছিল নিজের মনটাও ভালো রয়েছে বলে। সেও তো এগিয়ে চলেছে!

কিন্তু ঠিক এক ধরনের এগুনো কি ? একটা সংশয়-কীট আবার প্রবেশ করে মনের মধ্যে।

ওঁদের এগুনোর পায়ের শব্দে যেন চকিত হয়ে ওঠে চারিদিক। ওঁদের এগুনো সৈনিকের এগুনো, বীরের এগুনো, প্রতি পদক্ষেপে ওঁরা দুর্মদ সাহসের সঙ্গে রিস্ক্

নিচ্ছেন। ওঁদের পরাজয় বিজয়কেই করে আরও উদ্রিক্ত—আবার রিস্ক্, আবার রিস্ক্ তার পর…

ও যেবারে বি. এ. পাস দিল, একটি কথা বেশ মনে আছে। ওর সঙ্গীদের মধ্যে হেমন্ত করল ফেল্, যতীন আর ও পাস করল। রেজাল্ট দেখে হেমন্ত দূরে সরে গিয়ে একজায়গায় নিঝুম হয়ে বসে ছিল, যতীন তড়িৎকে কতকটা টেনে নিয়ে গিয়েই তার পাশে বসল। ও ছিল খানিকটা দার্শনিক প্রকৃতিরই।

প্রশ্ন করল—"কি ভাবছিস্?"

হেমন্ত বলল—"ভাবছি, কি হোল! কি হবে!"

"ওটা তো আমাদের ভাবনা; চোখে সর্ষেফুল দেখছি। সাড়ে সাত হাজার পরীক্ষা দিয়েছিল, চার হাজার বেরিয়ে এসেছে। কি করতে জানিস?"

"কি করতে?"

"সরস্বতীর বরপুত্র তো, কাজেই তাঁর সতীন মা-লক্ষ্মী হাড়ে হাড়ে চটা। সব পথ বন্ধ করে একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন। খেয়োখেয়ি করে মরুক নিজেদের মধ্যে—পঞ্চাশ, আশী, হদ্দ শতখানেকের জন্যে। একটা ব্ল্যাক-হোল-ট্রাজেডি বলতে পারিস—একটা কি দুটো জানালা দিয়ে যে হাওয়াটুকু আসবে, তার জন্যে কাড়াকাড়ি করে মরা।"

তিনজনেই হেসেছিল, তড়িৎ আর যতীনের হাসিতে কিছু বেশি জলুসও ছিল না।

দু'টা বিরুদ্ধ চিত্র সামনা-সামনি হয়ে আজ অনেকদিন পরে আবার এ-ধরনের কথা হঠাৎ মনে জেগে উঠল তড়িতের। অবশ্য, ক্ষণিক।

(চৌত্রিশ)

যেমন হয়ে থাকে, পরীক্ষার পর একটা মস্তবড় অবসাদের সময় এসে পড়ল।

প্ল্যান ছিল বেশ বড়রকমই। এই যে দুজনের পড়ার ক্ষতিটা হোল, সকাল-বিকেল পড়িয়ে পুষিয়ে নেবে। রিক্শা চালানোটাও বেশি করে দিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু টাকা তুলে ফেলুক। ফেলে, অখিলদার টাকাটা শোধ করে দিক। পাস যদি করেই তো জীবনের গতি কোন্‌দিকে কে জানে? অন্তত ঝাড়া-হাত-পা হয়ে থাকুক তো।

শুরু করে দিল। কিন্তু যেন মন বসাতে পারছে না। অষ্টপ্রহর বই নিয়ে অত ঘাঁটাঘাটি করার পর, বইয়ের দিকে আর চাইতেই ইচ্ছে করছে না। অবশ্য ওদের

জানতে দেয় না সেটা, বরং পাছে টের পায় ব'লে বাইরে বাইরে বেশিই উৎসাহ দেখায়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনটা ক্লান্ত হয়ে থাকে।

রিক্শা নিয়েও তাই। নিজের ওপর একটা কর্তব্য চাপিয়েছে—এতখানি অবসর বৃথা যেতে দেওয়া তার মানায় না; বোঝে সব, চালিয়েও যাচ্ছে, কিন্তু মন নেই।

রিক্শা নিয়ে ইদানিং ওর মনের মধ্যে একটা পরিবর্তনও অনুভব করছে। এটা যে কবে থেকে সূক্ষ্ম আকারে আরম্ভ হয়েছে তা লক্ষ্য করেনি; তবে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আজকাল মল্লীদের ওখানে গেলে মনে হয়—এমন আসরে, যেখানে সবাই বেশ সচ্ছল অবস্থার, কয়েকজন প্রায় অভিজাতশ্রেণীরই—সেখানে একজন রয়েছে যার মাত্র রিক্শা-চালক ব'লে পরিচয়—তা যে যতই বলুক—এটা যেন বেশ গৌরবের নয়। আস্তে আস্তে বেশ যেন একটা হীনমন্যতা এসে পড়ছে। মল্লী হয়তো জানে তার আসল পরিচয়টা, কিন্তু তাতে বেশ সান্ত্বনা পাওয়া যায় না।

তাই ওখানে যাওয়াও আস্তে আস্তে কমে এসেছে, ঠিক যখন ভেবেছিল, মুক্ত অবসর পেল, মল্লীর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ ঘটল আরও।

নিতান্ত অশান্তির মধ্যে দিয়ে কাটছে দিনগুলা। নিরানন্দ অবসর যেন একটা ভার হয়ে উঠেছে।

এই সময় একদিন বিকালে রিক্শা বের করতে গিয়ে অখিলের সঙ্গে কারখানায় দেখা হয়ে গেল।

অখিল আজকাল খুবই ব্যস্ত। একসঙ্গে অনেকগুলা কাজ চলছে। টিনের বড় শেড্‌টা উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে রিক্শা-তৈরির কাজও চলছে—বডি (body) তোয়ের করা, চাকা ফিট্‌ করা, রং করা—সব কিছু। কিছু কলকব্‌জাও হচ্ছে বসানো। এদিকে রিক্শা খাটতে দেওয়া, তার হিসাব রাখা, সে-সব রয়েছেই। যে লোকটিকে পেয়েছেন—নাম লোকেনবাবু—তিনি বাজার দেখে বেড়াচ্ছেন। দূরের কাছের শহরে যান, অর্ডার যোগাড করে আনেন, আবার চলে যান।

ক্রমে তোয়ের রিক্শাও বেরুতে লাগল, বিক্রয় আরম্ভ হোল, বাইরে চালানও। অখিল একরকম একাই। ফুরসৎ নেই একেবারে, যেতে আসতে ক্বচিৎ দেখা হোল তো হোল। যদি কোনদিন একসঙ্গে খেতে বসবার সুযোগ হোল তো হেঁট হয়ে চুপচাপ করে খেয়ে তাড়াতাড়ি আবার ছুটলেন। সমস্ত কারখানাটা মাথার মধ্যে ঘুরছে।

প্রায় নূতন শেডেই কাটে, কাজ সব এদিকেই। তড়িৎ নিজেই জমার খাতাটায় নামটা বসিয়ে বের করে নিয়ে যায় রিক্শা, সেদিন গিয়ে ভাখে অখিল রয়েছেন। একটা

খাতা খুলে কি লিখছিলেন, ওকে দেখে একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—তড়িৎ ?…একটু বোসো, একটা কথা আছে।"

শেষ করে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"রিক্‌শা নিতে এসেছ, না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—তড়িৎ উত্তর করল।

"আমি ক'দিন থেকেই বলব বলব মনে করছি ; ভুলে যাই। তুমি ওটা ছেড়ে দাও। আর তো বরাবরের জন্যেই ছেড়ে দেওয়া উচিত, ভগবানের ইচ্ছেয় পাস করে যাবেই। তা সে পরের কথা পরে, অন্তত এখন দিনকতকের জন্যে দাও ছেড়ে। কথা হচ্ছে, স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে জিনিসটা তো ভালো নয় ; তোমার শরীরটা এদানি বেশ পড়ে গেছে। একটু সামলে নাও আগে।"

এত মনের মতো উপদেশ অনেকদিন শোনেনি তড়িৎ। অবশ্য, কেউ ওকে বাধ্য করেনি রিক্‌শা চালাতে, তবে এ যেন আপনা হতেই বন্ধ হয়ে গেল বেশ। নিজের কাছে নিজের যে একটা দায়িত্ব ছিল সেটা আর রইল না। নিজেকে যেন বলা যায়—কি করব ? মানা করছেন, গুরুজনের মতোই তো।

বলল—"কি করি তাহলে বসে বসে ? কিছু টাকাও পাচ্ছিলাম।"

তারপর কতটা যেন ভেতরের উল্লাসেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"যদি বলেন তো কারখানার কাজ একটু একটু দেখি।"

অখিলের মুখে যেন একঝলক আলো এসে পড়ল ; বললেন—"সত্যি দেখবে তুমি ? আসবে ?"

"এক এক বার তো মনে হয় শিখি না-হয়।" বেশ উৎসাহের সঙ্গেই কথাটা আরও একটু বাড়িয়ে বলল তড়িৎ।

অখিল ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু ভাবলেন, তারপর সেই আলোটা আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে গিয়ে মুখটা আবার সহজ হয়ে এল, যেন একটা লোভকে সংযত করে নিয়েছেন। বললেন—"শিখতে চাও, শিখো, মন্দ কাজ নয় তো। তবে আমি যা একটা কথা মনে করছিলাম—একঘেয়ে পড়া গেছে, দিনকতক একটু বেড়িয়ে এসো-না কোথাও থেকে। শরীরটাও শুধরে যাবে, মনটাও থাকবে ভালো। তোমায় যেন মনমরা দেখি আজকাল একটু। লিখেছ তো ভালোই ?"

"মন্দ হয় নি তেমন।"

"যাবেই পাস করে, ভেবোনা অত।…ঐ যা বললাম, বেড়িয়ে এসো একটু। না হয় দেশ থেকেই ঘুরে এসো।"

"ওদের দুজনের ক্ষতি হবে। অন্তত বিমলের।"

"নাঃ, সত্যিই তোমায় পারা গেল না, তড়িৎ। তোমার বৌদি যে বলে—এতদিন আছ তবু পরের মতন ছাখো, সেটা ঠিক। আরে, না হয় আরও কয়েকটা দিন হোল ক্ষতি: মনে করো তোমার পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি।…যাও, ভেবে ছাখো।…না, রিক্‌শা আজ থেকেই বন্ধ, ইস্যু-ই (issue) করব না আমি।"

তড়িৎ উঠেছে, একটু হেসে জমার বইটা টেনে নিলেন কাছে। বললেন—"আর একটা কথা—পর ভাবার কথায় মনে পড়ে গেল। বেরোও যদি তো টাকার কথা ভাববে না মোটেই।…বেশ তো, পাস করলে তোমার টুইশন-ফি'টা অন্তত ডবল হয়ে যাবে তো, শুধিয়ে দিয়ো। যাও।"

কোন কিছুতে মনস্থির না হলে যেমন হয়—বেরুবার ঠিকঠাক করতে করতেও কয়েকটা দিন কেটে গেল, পরীক্ষার পর প্রায় একমাস গেল বেরিয়ে, তারপর বাইরে যাওয়ার একটা স্থবিধা হোল, আর ভালো জায়গাতেই।

পূজার সময় আসছে সামনে, এই অবসরে রিক্‌শার চাহিদাটা চারিদিকেই বেড়ে যায় এক ঝোঁক। শহরের লোকের যাতায়াত বাড়ে, বাইরে থেকেও লোক আসে প্রচুর, বিশেষ করে রাঁচি, হাজারীবাগ, কেডারমা—এইসব অঞ্চলে।

কারখানার নাম হয়েছে ছোটবড় সব শহরে, কাজ হচ্ছে বেশ, এই সময় বাইরে থেকে ঘুরে এসে লোকেনবাবু একটা প্রস্তাব করলেন। কলকাতায় গিয়ে বাজার দেখে-শুনে যদি স্থবিধায় মাল যোগাড় করা যায় তো, এই একটা স্বর্ণ-সুযোগ।

তড়িৎ ছিল কাছে কথাটা যখন ওঠে। যেমন কোন কিছুতেই ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারে না, তেমনি কারখানার কাজেও নয়, তবু আসে মাঝে মাঝে; দেখাশোনা করে। লোকেনবাবু চলে গেলে, অখিলকে বলল—"দাদা, একটা কথা বলি?…আপনি তো একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসতে বলছিলেন, আপত্তি না থাকে তো কলকাতা থেকে ঘুরে আসি লোকেনবাবুর সঙ্গে?"

"খুব ভালো কথাই তো তড়িৎ, এতে আপত্তির কি থাকতে পারে? তুমি বেরুচ্ছ না—জিজ্ঞেস করব করব করে ভুলে যাই। এ বরং ভালোই হবে।"

—বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

"হ্যাঁ, অনেকদিন দেখিনি কলকাতা। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কাজও হবে।"

অখিল হেসে পিঠে হাত দিলেন; বললেন—"তড়িতের পদে পদে হিসেব, দাদার খরচ করিয়ে দিচ্ছি, লোকসান করিয়ে দিচ্ছি।…তোমায় সেখানেও কাজের চিন্তা নিয়ে

থাকতে হবে না, একটু মনে ফূর্তি এনে দেখেশুনে বেড়িয়ো। কাজের লোক আমি ভালোই পেয়েছি, দেখছ তো।···বেশ, ওঁর সঙ্গেই ঘুরে এসো তাহলে। উনি বোধহয় কালই যাবেন সন্ধ্যের গাড়িতে।”

কাজের লোক-ই লোকেনবাবু। তড়িৎও হিসাবটা রেখেই গেল, ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরল বাজার দেখে দেখে। বেশ দেখিয়ে বুঝিয়েও দিতে লাগলেন লোকেনবাবু। ঘুরে দেখেশুনে একজায়গায় মাল সরবরাহের চুক্তিও হয়ে গেল নিয়মমতো।

ওদিককার কাজ সারা হয়ে গেলে একটু শহর দেখার পালা। বাজারের কাজ যেন সাধ্যমতো ট্রাম-বাসেই সারলেন লোকেনবাবু। শেষ হলে, পরদিন একটা ট্যাক্সিই ডাকিয়ে আনালেন।

তড়িৎ মৃদু আপত্তি করল। বলল—“এটা তো কতকটা বাজে খরচই লোকেনবাবু, আমার শখ। সারা যায় না ট্রাম-বাসে ? অবিশ্যি, আপনার হয়তো অসুবিধে হবে একটু···না হয়, একলাই যাই না আমি, একেবারে অজানা নয় তো···”

লোকেনবাবু একটু হেসে বাধা দিলেন ; বললেন—“থামুন থামুন, বুঝেছি। আপনি নিশ্চয় ভেবেছেন ফার্মের খরচ করিয়ে দিচ্ছি। ফার্মের যা খরচ তা একরকম হয়ে গেছে ; বাকি শুধু হোটেলের বিল আর ফেরবার ভাড়া···সে আপনি সেখানে গিয়ে আমার বিলটা দেখলেই বুঝতে পারবেন।”

“তাহলে, এটা ? আপনি দেবেন পকেট থেকে ?”

“দিলামই বা, দিতে নেই ? একসঙ্গে এলাম, রইলাম সাত-আট দিন একসঙ্গে, বয়সেও আপনি ছোটভাইয়ের মতন—যেমন ওঁর কাছে তেমনি আমার কাছেও তো ; একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে শহরটা একটু দেখিয়ে আনছি—মস্তবড় ইয়ে করছি ?···নিন্, উঠুন।”

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রেও খানিকটা গল্পসল্প হোল কাজের কথার বাইরে। ঘরের সামনের বারান্দায় দু’টা চেয়ারে মুখোমুখি ব’সে, একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন—“এবার একটু আপনার পরিচয়টা শুনি ভালো করে। একসঙ্গে রয়েছি, কিন্তু যা কাজের চাপ গেল—সে তো দেখলেনই স্বচক্ষে।”

ওঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মধ্যেই দিল পরিচয় খানিকটা তড়িৎ মানপুর থেকে আরম্ভ ক’রে এম-এ. পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত। বেশ দরদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করা—যেখানে সহানুভূতি দরকার, সেখানে অভিনন্দন।···“বা ; চমৎকার এম্ (aim) জীবনের, এই তো

চাই…আর ওরকম রামচন্দ্রের মতন বড়ভাই…নিজের চেষ্টাতেই তাহলে এতটা এগিয়ে এসেছেন! সাবাস।"

এরপর চেয়ারের পিঠে গলা উলটে দিয়ে খানিকটা চুপচাপ করে ভাবলেন, তারপর প্রশ্ন হোল—"এরপর তাহলে ব্যবসায় ঢুকে পড়বেন পার্টনারশিপে (partnership)? বেশ ভালো কথা, আসুন, আসুন…"

"তেমন কিছু ঠিক করিনি।" তড়িৎ বলল।

"ঠিক করেননি!"—বেশ একটু চকিতই হয়ে উঠলেন লোকেনবাবু; বললেন—"তাহলে যে অখিলবাবু আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন এভাবে?"

প্রশ্নটা যেন কানে একটু বাজল তড়িতের, হঠাৎ এত বিস্মিত হওয়াটাও ঠিক বুঝতে পারল না। কথার ধারাটা একটু বদলে দিয়ে বলল—"উনি ঠিক পাঠাননি। আমি ভাবলাম—দেখি না কাজের ধরন-ধারণটা; যদি তেমন বুঝি তো নেমেই পড়ব। পাস করি বা ফেল্ করি, এবার তো একটা কিছু করতে হবে।"

শোনার সঙ্গে কয়েকবারই চোখ তুলে তুলে সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখলেন লোকেনবাবু, শেষ হলে বললেন—"আপনাকে তো বিশ্বাসও করেন খুব।"

"অবিশ্বাসের এখনও তো কোন কারণ হয়নি।"

"হতে দোব কেন বলুন? লোকটির টাকা আছে। রোল (roll) করে তা তা থেকে অনেস্ট (honest) উপায়ে কিছু বের করে আনতে পারি, ওঁরও লাভ, আমাদেরও লাভ। অবিশ্বাসের কারণ হতে দোব কেন?"

—সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তারপর—

"টাকা ভালোরকমই আছে ভদ্রলোকের, নয় কি? আপনি তো সঙ্গেই থাকেন।"

"মনে তো হয়।"

"বের করবেন?…বলছিলাম—বিশ্বাসী লোক রয়েছে দেখলে। আমি হাজার হোক নোতুন তো।"

দৃষ্টি সেইরকমই চলেছে।

তড়িৎ বলল—"বিশ্বাসটা একবার পাকা করে নিতে পারলে, না বের করার কারণ তো দেখি না।"

হঠাৎ ওঁর কথাবার্তার ধারাটাও বদলে গেল, ভঙ্গিও; বললেন—"সেকি কথা, বিশ্বাস আগাগোড়াই পাকা থাকবে বৈকি, আমরা দুজনে রয়েছি! আসুন আপনি, নিশ্চয় আসুন। নেমে পড়ুন।"

...উঠে পড়ে বললেন—"আরও হবে কথা এরপর। চলুন, রাত হয়ে গেছে, ক্লান্তও আছেন।"

(পঁয়ত্রিশ)

কথাগুলো যেন কেমন-কেমন লাগল; অবশ্য লোকেনবাবু এমন ভাবে চালিয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত যে একটা অস্পষ্টতাও থেকে গেল যে, হয়তো ভালো মনেই বলছেন সব। দোমনা হয়ে রইল তড়িৎ। একবার মনে হোল অখিলকে বলে, আবার ভাবল, গোড়াতেই একজন বিশ্বাসভাজন লোকের ওপর সন্দেহ এনে ফেলাটা ঠিক হবে কি? হয়তো অখিলই অন্যভাবে নিতে পারেন। ব্যবসার কথাবার্তার ধরন-ধারণ ও নিজে অত বোঝেও না তো।

কথাগুলো কিন্তু মনে খচ-খচ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্থির করল ঠিক সেভাবে না ব'লে, সুবিধা বুঝে একদিন কথাচ্ছলে আভাস দিয়ে যাবে, তা থেকে যা বুঝে নেন অখিল।

বলা কিন্তু হয়ে উঠল না। ফিরতে অখিলের সঙ্গেই দেখা হোল প্রথমে; কারখানায়। বললেন—"তোমার একটা টেলিগ্রাম এসেছে বাড়ি থেকে পরশু সন্ধ্যেয়...না, ভাবনার কিছু নেই। টেলিগ্রাম বলেই খুলেছিলাম আমি, তেমন দরকারী হলে কলকাতায় তোমায় টেলিগ্রাম করে দোব বলে। বোধ হয় চিঠি-ফিটি দাওনি, লিখেছেন—Wire welfare (কুশল জানাও), আমি টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, ভালোই আছে।...দাওনি চিঠি অনেকদিন, নয়?"

শুধু সে দেয়নি তা নয়, চিঠি এসেছিল, তার উত্তরও দেওয়া হয়নি।

তড়িৎ লজ্জিতভাবে বলল—"দেব দোব করছিলাম...হঠাৎ কলকাতায় চলে গেলাম তো।"

"আমি আর একটু জানিয়ে দিয়েছি, তুমি যাচ্ছ।"

"এই তো সেদিন এলাম দেশ থেকে..."

"ছেলেমানুষের মতন কথা বোল না, তড়িৎ। আমি বলি আজই রাত্তিরের গাড়িতে চলে যাও। বেশি ক্লান্ত আছ কি?...থাকলেও সমস্ত দিনটা পাবে। কথা হচ্ছে—পাড়াগাঁয়ের টেলিগ্রাম—হয়তো বীটের ব্যাপার, পৌঁছুতে দেরি হবে।...পোস্টাফিস তোমাদের গ্রামের নামে নয় তো।"

"গাঁয়েই। জমিদার পাড়াটার ওঁরা নবগ্রাম নাম রেখেছেন। টেলিগ্রাম পৌঁছে গেছে।"

"গেছে, ভালোই। তুমি কিন্তু যাও। আজই। যাচ্ছে লিখেছি, না গেলে আরও ভাবিত হয়ে পড়বেন।...যাও বাড়িতে, ভালো করে জিরিয়ে-টিরিয়ে নাও গে।"

সরোজিনী বললেন—"ভাবানো তোমার কেমন যেন একটা রোগ, ঠাকুরপো। তাঁরা আবার দূরে থাকেন তো।"

রতি ছিল। তড়িৎ তারও মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এসে বলল—"ভাবাটাই একটা রোগ, বৌদি। তবে আমার ধারণা ছিল সেটা শুধু মেয়েদেরই বুঝি, এখন দেখছি দাদারও আছে।"

রতি সেই আগেকার মতো হেসে বলল—"কেন, বৌদি বেচারি তো রয়েছেন সেখানে, রমা রয়েছে, দোষ চাপানোই যখন ইচ্ছে, তাঁদের ঘাড়েই সবটা চাপিয়ে দিন না।"

লক্ষ্য করছে, ও যাচ্ছে তাতে রতি যেন খুশী, না হলে এ ধরনের কথা আর কৈ বলে? এভাবে হাসেই বা আর কৈ?

রতি খুশী তড়িৎ মল্লীর থেকে দিনকতক দূরে থাকবে বলেই কি?

দেখল মানপুরে এতদিন না এসে ভুলই করেছে। সেবারের মতো এবারও মানপুর যেন গায়ে হাত বুলিয়ে সব বিক্ষোভ আবার মুছে নিল। প্রথমেই, সেই যে অনেক কিছু করতে হবে অথচ একটা কিছুতেও মন দিতে পারা যাচ্ছে না বলে অশান্তি—সেটা গেল দূর হয়ে। তারপর পরীক্ষাটাও সামনে আর বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে নেই, পল্লী-জীবনের যা শান্তি সেটা বেশ অভঙ্গভাবেই আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়ল।

পল্লীর রূপও বদলেছে। সেবারে এসেছিল খর-দীপ্ত নিদাঘের মধ্যে; এবারে বর্ষা। বর্ষা এবারে নেমেছেও ভালো, কৃষক-পল্লীই তো মানপুর, ধানের দোলায় সমস্ত গ্রামখানি যেন দুলছে।

ভালো দিন থাকলে সুঁতির ধারে যায় মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে, নয়তো বাড়ি কিম্বা তাঁর বাড়ি; নিবিড়ভাবে গল্প কিম্বা নিবিড়ভাবে পড়াশোনা, আলোচনা। বাইরে অবিরাম বৃষ্টি। স্কুল ছেড়ে অবধি বাড়ি বড় একটা আসতে পায়নি, ছুটি-ছাটাগুলাও টুইশনে কাটাতে হোত সামনের কথা ভেবে, বহুদিন পরে মানপুরকে পেল এ ভাবে।

সেবার তমালিনীর অত সতর্কতা সত্ত্বেও সংসারের ছিদ্রপথে কৃচ্ছ্রতা উঁকি মারতই মাঝে মাঝে, সেটা চরমে গিয়ে গয়না-বন্ধকের ব্যাপারে আত্মপ্রকাশও করে ফেলল ; এবার কিন্তু বেশ একটি স্নিগ্ধ সচ্ছলতা ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। এটিও একদিন যেন চরমে এসেই আত্মপ্রকাশ করল।

সেদিন সমস্ত দিনই বর্ষা গেছে। বাড়ি থেকে বেরুতে পারেনি তড়িৎ, চারজনে একরকম মুখোমুখি হয়ে গল্প করে কাটিয়েছে। এত মিষ্টি করে, বাইরে থেকে আলাদা হয়ে এমন ভাবে, এতক্ষণ ধরে সবাইকে একসঙ্গে আর কবে পেয়েছে মনে তো পড়ে না।

বিকালের দিকে একটু ধরনের মতো হতেই "এক্ষুনি আসছি" ব'লে জিমূত একবার বেরিয়ে গেলেন একটা ছাতা নিয়ে। প্রায় আধঘণ্টা পরে যখন ফিরলেন, বেশ ভিজে গেছেন, হাতে সের পাঁচেকের একটা মাছ, ডিম-ভরা। বললেন—"আজ খিচুড়ি করো, আর মাছের যা-যা জানো।"

আহ্লাদ নানা কারণেই, তবু তড়িৎ একটু ক্ষুব্ধভাবেই বলল—"এরকম করে ভিজলে দাদা, বড় অত্যাচার হোল যে!"

"নেঃ, চাষাভূষো মানুষ, আমাদের ভিজলে আবার অত্যাচার! নবগ্রামের বড়পুকুরে সুঁতির জল ঢুকেছে, জেলেরা জাল পেতেছে, একটা নিয়ে এলাম।"

তমালিনী বললেন—"তা এত বড়! ভাই তো মস্তবড় খাইয়ে!"

"যাওয়ার সময় কি মনে হোল, নটাই চৌকিদারকে বলে দিলাম খেতে, তাই একটু বড় দেখেই নিলাম, আদ্দেক তো ঐ সাবড়ে দেবে।"

"তা ভালো করেছ। অনুগত মানুষ, আর ঠাকুরপোর নাম প্রায়ই করছে—ছোটদাদাঠাকুর পাস করবেন, দারোগা হবেন…"

তড়িৎ বলল—"তাহলে প্রথমে তো ও-ই বাঁধা পড়বে, হুঁশ নেই ?"

—একটা হাসি উঠল। নটাই বারকয়েক চুরির জন্যে জেল খেটে এদিকে এসে চৌকিদার হয়েছে ; গ্রামের জমিদারবাবুরা গান্ধীপন্থী, তাঁদেরই চেষ্টায়।

মাছ কুটতে বসে গেলেন তমালিনী। রমাকে বললেন—"তাড়াতাড়ি উনুনে আঁচটা দিয়ে দে, নয়তো রাত হয়ে যাবে।…আগে চায়ের কেটলিটা চড়িয়ে দিবি।… ভেজারও একটা সীমা আছে। নাঃ, চাষাভূষো মানুষের অসুখ-বিসুখ তো করতে নেই ; পীর!"

একটি আনন্দ-চঞ্চলতার মধ্যে রান্নার কাজ এগিয়ে চলল। সবচেয়ে বেশি আহ্লাদ যেন তমালিনীর। ছোট বাড়ি, ঘর বারান্দা ছেড়ে আজ তু'পা যাওয়ার উপায় নেই নেমে, যোগাড়-যন্ত্রের মধ্যে সমস্তটুকু যেন পূর্ণ করে ফিরতে লাগলেন। সব ঠিক-ঠাক করে নিয়ে রাঁধতে বসে তড়িৎকে কাছে ডেকে নিলেন। বললেন—"বোসো ঠাকুরপো।"

রমাও রয়েছে; বলল—"কদ্দিন পরে কাকামণি আবার রান্নাঘরের দোরে বসলেন সেইরকম করে মা!"…

"তা নয়?…মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে একদিন কোমর বেঁধে ঝগড়া করে আসব। অ্যাদ্দিন পরে এলেন যদি, সন্ধ্যে হোল তো বাড়ির সঙ্গে আর সম্বন্ধ নেই…"

"মাস্টারমশাই জিগ্যেস করছিলেন—সকালবেলাটা ফুরসৎ থাকে না তড়িৎ?"

কথাটার মধ্যে কি ছিল, তমালিনী ভালোভাবেই হেসে উঠলেন, তারপর আবার গম্ভীর হয়ে গিয়ে, কতকটা রাগের ভান করেই বললেন—"ঐ নাও, সাধ করে বলি? পেয়ারের ছাত্র, অষ্টপ্রহর কাছে থাকলেই…"

"কাকামণিকে আগের মতো গরম গরম মাছভাজা দাও না মা।"—রমা আর সঙ্গতি রেখে কথা বলতে পারছে না, একটা জুগিয়ে গেলে আর চেপে রাখতে পারছে না নিজেকে।

তমালিনী বললেন—"দোবই তো, নামলেই দিচ্ছি। এম. এ. হোতে যাচ্ছেন তো মাতব্বর হয়েছেন নাকি তোমার কাকামণি? আমার কাছে সেই ঠাকুরপো।"

"তারপর?…" তড়িৎ হেসে প্রশ্ন করল।

"তারপর আবার কি? খাওয়ার সময়ও যেমন খাওয়ার তেমনি খেতে হবে। অমনি মেহনৎ করছি নাকি?…না ভাই, সত্যিই আমার রান্নার হাত বড় খারাপ হয়ে গেছে না রেঁধে রেঁধে। কার জন্যেই বা রাঁধি ভাই? রেঁধে খাওয়াবার মতন তো ঐ তু'টি মানুষ। তার মধ্যে একজন তো আবার সদাশিব, মুখে তার আছে কোনও? —যা সামনে ধরে দাও তাই অমৃত…"

"অন্নপূর্ণার হাতের বলেই বোধ হয়…"

—ঠাট্টা করে না, তবে কথাটা বলতে বড় মিষ্টি লাগল, ঠাট্টার চেয়ে পূজার ভাগটাই বেশি তো। তবে শেষ না করেই একটু হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। তমালিনীও নিলেন অন্যদিকে ঘুরিয়ে। অবশ্য একটু হাসি নিয়েই; যে সমীহ করে বলে না কিছু, তার মুখ ফস্‌কে একটা কথা বেরিয়ে গেলে মিষ্টই লাগে তো।

একটু চুপচাপ গেল, রমা শুধু বিশেষ কিছু না বুঝে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুজনের দিকে চাইল ক'বার। তারপর এ তরফের জবাবটাও এসে গেল। তমালিনী কড়ায় খুন্তি নাড়তে নাড়তে বললেন—"যা বলছিলাম,—কার জন্যে রাঁধি বলো? তা এবার আমার ঘর আস্তে আস্তে ভরবে। পাসটা করতে দেরি, তারপরেই নিয়ে আসছি টুকটুকে দেখে একটি…"

ঠাট্টাটা করে একটু সঙ্কুচিতই হয়ে পড়েছিল, তড়িৎ বলল—"তাহলে তাকেই কাছে বসাও মনে মনে, আমি উঠি…"

জিমূত হুঁকা হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় বসলেন; বললেন—"বোসো তড়িৎ, আমিও এলাম, একা একা ভালো লাগছে না ঘরে। কী বৃষ্টিটাই নেমেছে!"

•

আজও পরিবেশনের সময়ই নজরে পড়ল তড়িতের। সেদিন হেঁট হোতে আঁচলটা সরে গিয়ে দেখেছিল গলা খালি, আজ হেঁট হোতে দেখল পান্নার দুল দু'টি সামনে এসে পড়েছে, যে দু'টি নাকি বন্ধক দেওয়া ছিল। আজই কখন পরেছেন, হয়তো একটু আগেই, কেননা বিকেল পর্যন্ত সাদামাটা সোনার দুল জোড়াটাই দেখেছিল কানে।

খেয়ে-দেয়ে একটু নিভৃতে পেয়ে প্রশ্ন করল—"দুল জোড়াটা ছাড়িয়ে নিয়েছ বৌদি?"

—মুখটা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। তমালিনী একটু যেন লজ্জায়ই পড়ে গেছেন, বললেন—"হ্যাঁ ভাই, তোমার ছাড়িয়ে দেওয়ার পয় আছে। মুগ-কলাইয়ের ফসলটা তো ভালোই হোল এবার—তাগা-জোড়াটাও খালাস হয়েছে; এই ত্যাখো না।"

কি মনে হোতে তড়িৎ হঠাৎ হেঁট হয়ে প্রণাম করল, উঠে বলল—"কিন্তু আমার টাকায় ছাড়ানোর কথা ছিল বৌদি, নিতে হবে টাকাটা একসময়।"

তমালিনী বিস্ময়ের ভান করলেন—"ওমা, তুমি এটুকু দিয়েই রেহাই পেতে চাও নাকি? ত্যাখো ফাঁকিবাজির মতলবখানা একবার!"

মানপুরে সময়টা যে কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেল যেন টেরই পাওয়া গেল না। বর্ষার হিড়িকটা কমে এলে একটু বাইরে থেকেও ঘুরে এল। দিন তিনেক বর্ধমানেও কাটিয়ে এল, যাঁদের ওখানে টুইশন করত। চিঠিপত্র চালিয়ে গেছে এবার, দেবপ্রসন্নর

কাছ থেকে মল্লীর হাতের লেখায় চিঠি এসেছিল, সরোজিনীর কাছ থেকে এসেছিল রতির হাতের লেখায়।

বর্ধমান যাওয়ার কিছু আগে ফাদার 'এম্'-কেও চিঠি লিখেছিল একটা। আর সব কথার সঙ্গে পরীক্ষার ফলের সম্বন্ধেও প্রশ্ন ছিল—কবে বেরুবে। অন্ধ্র য়্যুনিভার্সিটি, বাংলার কাগজে খবর পাওয়া যায় না।

ফিরে এসেই চিঠি পেল। লিখেছেন, আর দিন দশ-বারো আছে, চলে আসুক। এ সময়টা সামনে থাকাই ভালো।

মানপুরে প্রায় মাসখানেক কাটিয়ে রাঁচি ফিরে এল তড়িৎ।

(ছত্রিশ)

দেখল রাঁচি একরকম ফাঁকা।

পূজার ছুটিতে মল্লী বাড়ি চলে গেছে। নলিনাক্ষ গেছে কাশ্মীর বেড়াতে, প্রিয়ব্রতনও গেছে তার সঙ্গে। ফলে দেবপ্রসন্নর বাড়ির আড্ডাটা ভেঙেই গেছে বলতে গেলে। 'ফাদার 'এম্'ও ছোটনাগপুরের আরও অভ্যন্তরে তাঁর এক মিশনারী আত্মীয়ের কাছে পূজার ছুটিটা কাটিয়ে আসতে গেছেন। বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম, যা দু'একজন আছে তারাও বাইরে, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা জেনে শুনেই করেনি তড়িৎ। বেহারী দু'একজন আছে মাত্র।

এবার মানপুরে অনেকদিন কেটেছে, আর বেশ ভালোভাবেই, এক দিকে সেই স্মৃতি, অন্যদিকে এই নিঃসঙ্গতা, নিজেকে নিয়ে দিনগুলা যেন অচল হয়ে উঠতে লাগল!...যতই সময় এগিয়ে আসতে লাগল, পরীক্ষার ফলের চিন্তাটাও ততই প্রবল হয়ে উঠছে এদিকে।

নিয়মিত রুটিনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে কোনরকমে যেন চালিয়ে যাচ্ছে তড়িৎ। সকালে ওদের দুজনকে পড়ায়, সমস্ত সকালটাই দেয় ওদের। দুপুরে খানিকটা ওদের পড়াবার চেষ্টা করে, খানিকটা নিজে কিছু পড়বার চেষ্টা করে, খানিকটা কাটায় কারখানায়। একটু শেখবার-বোঝবার ইচ্ছাও হয় মাঝে মাঝে। তবে সে বোধহয় হাতে কোন কাজ নেই বলেই। মনে মনে একটা যেন দ্বিধা লেগে থাকে, একটা ভয়ই—ওর মনটা আবার রিক্শা-পর্বে ফিরে আসছে না তো!

এইটাই হয়ে পড়েছে ওর চিন্তার মূল সূত্র। দুটো পথের সামনা-সামনি এসে ও যেন থমকে দাঁড়িয়েছে—কোন্ পথে যাবে ?

সন্ধ্যা থেকে খানিকটা রাত পর্যন্ত নিয়মিতভাবেই কাটে দেবপ্রসন্নর বাড়িতে। ওঁর ইচ্ছানুযায়ীই। বলছিলেন—"তুমি এসেছ যেন বাঁচা গেল তড়িৎ, একেবারে একা পড়ে গেছি। যদি অসুবিধা না হয় তো এই সময়টা একবার করে এসো।"

এই সময়টা থাকে আরও কেউ কেউ। ওঁর ওখানের আলোচনা সাধারণতঃ উঁচুস্তরেরই হয়ে থাকে, সুতরাং খানিকটা বিরসও, আজকাল মনে হয় যেন আরও ; মল্লী, কিম্বা সুতপা, কিম্বা অতসীর সঙ্গীতের যাদু নেই তো। মল্লীর থাকাটাই যে ছিল একটা সঙ্গীত।

সব মিলিয়ে জীবনটা যেন বড় বিস্বাদ লাগছে।

এই সময় একটা ব্যাপার হোল।

এসে পর্যন্ত বাড়িটাও যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল। অবশ্য সবাই থেকেও, শুধু অখিল বারকয়েক কারখানার কাজে যা বাইরে গেছেন দু'একদিনের জন্য, তার মধ্যে একবার কলকাতাতেও। কিন্তু তার জন্য নয় ; ফাঁকা লাগছিল, বাড়িতে যেন একটা থমথমে ভাব লেগে রয়েছে। লক্ষ্য করল সেটা বিশেষ করে তিনজনের মধ্যেই—অখিল, সরোজিনী আর কিছুটা রতি। কথার অংশ কম, একটা যেন দুশ্চিন্তা লেগে রয়েছে সদাই। তড়িতের মনেও ছায়াপাত করছে। একটি আদর্শ পরিবার, মনে মনে সম্পূর্ণ মিল, সেখানে কিছু হোল নাকি ?

পারিবারিক কথা, জিজ্ঞাসা করাও চলে না ; এ নিয়েও বেশ খানিকটা অশান্তি লেগে রয়েছে মনে।

শেষ একদিন একটু ছুতা পেয়ে রতির কাছেই পাড়ল কথাটা একটু ঘুরিয়ে, ছুতাটুকু একটু বড় করে নিয়েই পাড়ল।

পড়াশোনা নিয়ে রতি এত উঠে-প'ড়ে লেগেছে যেন সত্যই তার তাড়াতাড়ি ম্যাট্রিকটা শেষ করে কলেজে না ঢুকে পড়তে পারলে চলছে না। একটা মাস যে ছিল না, বিমলের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আশ্চর্যরকম এগিয়ে গেছে, ঠিক যেন তড়িৎ ফিরে এলে তাকে আশ্চর্য ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রাণপণে খেটে গিয়েছিল। এখনও সেই খাটুনিই চলেছে। আদর্শ ছাত্রী।

তবু ইচ্ছা করলে একটা খুঁৎ বের করতে দেরি হয় না। সেইরকম একটি সূত্র ধরে, একটু টেনে বাড়িয়ে বলল—"এরকম ভুল এখনও করছ ?"

রতির মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এমন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, যেন যে-মন্ত্র দিয়ে দেবতার পূজা করছে, তা অশুদ্ধ হয়ে গেছে, দেবতা হয়েছেন বিরূপ।

আজকাল রতির জীবনের যা কিছু লক্ষ্য সব তো বোঝে তড়িৎ, তার কারণও বোঝে, তার নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণতিও বোঝে, তাই ওকে নিয়ে বেদনায় ভরে থাকে মনটা। কড়া করে বলেনি, তবু আরও নরম হয়ে গেল; বলল—"বলছিলাম, আজকাল বড় অন্যমনস্ক থাকো, কেন বল তো?" এর সঙ্গে ওঁদের দুজনের কথাও টেনে আনল, অত উচিত-অনুচিত না ভেবে। বলল—"শুধু তুমিই নয়, দাদা-বৌদিও যেন বড় অন্যমনস্ক থাকেন দেখছি।"

একটু হেসে কথাটা যেন হালকা করে দিয়ে বলল—"বাড়ির হাওয়াই যেন বদলে গেছে।"

রতির ফ্যাকাশে মুখটা হঠাৎ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মনে হোল এই প্রশ্নটা যেন অনেকদিন থেকে ওর কাছে প্রত্যাশা করে আসছে। একবার দরজা দিয়ে পিছন দিকে চেয়ে নিয়ে, কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

তড়িৎ বলল—"কিছু বলবে?…অবশ্য, যদি না চাও তো…"

"বলতে বারণ করেছেন।…বলব?"—মুখটা আবার মলিন হয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্নটা করল পরম নির্ভরতার সঙ্গেই। বিবেকে বাধছে তড়িতের। কৌতূহলটা এদিকে অদম্যই হয়ে উঠেছে, তারপর বেশ একটা কথা মনে পড়ে গেল, বিবেকই যেন ছাড়পত্র তুলে দিল হাতে। বলল—"বারণটা দুটো কারণে হতে পারে তো; এক, সংসারের গোপনীয় কথা, আমি বাইরের লোক, কেন শুনব; আর এক, আমি বাইরের লোক, শুনলে তেমন ক্ষতি না হলেও কেন আমায় অশান্তির মধ্যে ফেলেন তাঁরা।"

আর একটু ভেবে বলল—"হয়তো কিছু করবার হাত থাকতে পারে, তাতে ওঁদের মতে অযথা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে পারি পরের ছেলে। এ ধরনের যদি কিছু হয় তো বলতে দোষ দেখি না। অশান্তি-ঝঞ্ঝাট তো লেগেই আছে সবার জীবনে।"

উৎকর্ণ হয়ে প্রত্যেকটি কথা শুনছিল রতি, আর একবার সেইভাবে চকিতে পেছনে চেয়ে নিয়ে বলল—"ব্যবসাটা ফেল্ করেছে; কি হবে তড়িৎদা?"

বলতে-বলতেই চোখ দুটো ডবডব করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে মাথা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রতি।

একটা চোট লাগল, কিন্তু কলকাতার অভিজ্ঞতায় মনটা ভেতরে ভেতরে বোধ হয়

একটু প্রস্তুত ছিল, খানিকটা নীরব থেকে তড়িৎ রতির মাথায় হাত দিয়ে বলল—"চুপ করো।"

পরদিন সকালে তিনখানা লরি এসে নূতন কারখানাটার সামনে দাঁড়াল। কল্-কব্‌জা থেকে নিয়ে রিক্‌শার সাজসরঞ্জাম যা কিছু প্রায় সবই বোঝাই হোল, তারপর জায়গাটা খালি করে বেরিয়ে গেল লরি-গুলা। খালি শেড্‌খানা রইল দাঁড়িয়ে।

এরা সবাই বাড়ির বাইরের বারান্দা থেকে দেখছিল। সরোজিনী আর রতি মাঝে মাঝে আঁচলে চোখ মুছছে, ছেলেমেয়ে তিনটে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তড়িৎও রয়েছে দাঁড়িয়ে, বুঝছে অখিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেই যেন ভালো, কিন্তু পা উঠছে না কোনমতেই।

তারপর লরি তিনটে চলে যেতে আস্তে আস্তে এগুল। অখিল তখনও কারখানার কাছে দাঁড়িয়ে, এদিকে পেছন করে। তড়িৎ পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ঘুরে চাইলেন, বললেন—"তড়িৎ?"

তড়িতের মনটা কেমন উদ্বেল হয়ে চোখদুটো ছলছল করে উঠল। অখিল ঘুরে দাঁড়ালেন, পিঠে হাত দিয়ে বললেন—"ওকি, বেটাছেলের চোখে জল আসতে আছে? যা হওয়ার তা তো হয়ে গেল, আর কি? স্কুলের সংস্কৃত বইয়ে পড়েছিলাম—তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যম্ যাবৎ ভয়মনাগতম্—এসে গেল, এখন আর ভয় কি? চলো আফিসের দিকে।"

আসতে আসতে বললেন—"চিনতে পারিনি লোকটাকে। বাঙালী, সেই একটা মোহেও পড়ে গিয়েছিলাম—কলকাতার অনেক টাকা জমা হয়নি, এদিকে চারিদিকে এত যে বিক্রিটা হোল, দূরে কাছে, তার বেশি টাকাই আত্মসাৎ করেছে। যাক, কি আর হবে? একটা অভিজ্ঞতা তো হোল, এই মূলধন নিয়েই আবার এগিয়ে যেতে হবে, কি বলো?"

—শেষে একটু হেসেই বললেন। প্রশস্ত বুকখানা যেন আপনিই চিতিয়ে গেছে, মুখখানায় দীপ্তি গেছে ছেয়ে।

এরপর কণ্ঠস্বর একটু স্তিমিত হয়ে গেল; বললেন—"একটু আপসোস শুধু—বিমলটাকে ম্যাট্রিকটা পাস করিয়ে নোব ভেবেছিলাম, সেটা আর হোল না…"

"ছাড়িয়ে নেবেন এ-ক'টা মাসের জন্যে?"—চকিত হয়েই প্রশ্নটা করল তড়িৎ।

আবার পিঠে হাত দিলেন অখিল, আবার একটু হেসে বললেন—"এই ছাখো, তুমিই তো বলেছিলে, ভুলে গেছ? ভেবে দেখলাম তোমার কথাই ঠিক; নিজের লোক চাই এসব কাজে। একখানা সার্টিফিকেট বৈ তো নয়, কী দরকার এত মোহ?"

(সাঁইত্রিশ)

সেই বিষাদের ভাবটা আরও কয়েকদিন লেগে রইল। বরং কারখানা-ঘটিত দুর্বিপাকের জন্য বেড়েই গেল আরও। তারপর অনেকগুলি ব্যাপার পিঠোপিঠি এসে পড়ে সমস্ত আবহাওয়াটাই একেবারে পাল্টে গেল।

পরীক্ষার ফলটা বেরিয়ে গেল। দর্শনশাস্ত্রে ফার্স্ট-ক্লাস কেউই পায়নি, তবে তড়িতের নামটা সেকেণ্ড-ক্লাসে বেশ উঁচুতেই আছে।

চাকরিটা একরকম হয়েই গেল। বাসায় গিয়ে দেখা করতে ফাদর 'এম্' উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন; বললেন—"সর্বান্তঃকরণে তোমায় অভিনন্দিত করছি, তড়িৎ। আমাদের মিটিংটা পরের সপ্তাহেই হচ্ছে, প্রিন্সিপাল পূর্ণভাবেই সহানুভূতি-সম্পন্ন তোমার ওপর, নিযুক্ত হয়ে গেছ বলেই ধরে নিতে পার তুমি (You are almost as good as appointed)।"

এর কয়েকদিন পরেই মল্লী এসে পড়ল হঠাৎ। ছুটি থাকতে থাকতেই। অদ্ভুত যোগাযোগ, যেন ঘটনার গতি কোন্ দিকে তা দেখিয়ে দিচ্ছে—

একা আসেনি মল্লী, তার বাবা বসন্তবাবু সঙ্গে এসেছেন, এবং তার যা পরিণতি সে-সবও এই পরিস্থিতিতে বেশ কৌতুকজনক। কলকাতায় মল্লীর একজায়গায় সম্বন্ধ চলছিল। পাত্রের পিতা লিখেছিলেন রাঁচিতে সপরিবারে বেড়াতে আসছেন, এখানেই কন্যা দেখবেন। দেবপ্রসন্নর ঠিকানা দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসে বসন্তকুমার দেখলেন, টেলিগ্রাম এসেছে—ওঁরা এলেন না, অধিকন্তু কোনও ব্যক্তিগত কারণে এ-সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া হোল বলেই যেন ধরে নেওয়া হয়। বসন্তবাবু একটা দিন থেকে ফিরে গেলেন।

এর পাশেই রয়েছে ওর পাস করার খবরটা।

আশ্চর্য লাগছে তড়িতের; সফলতা এমনভাবে, এত সুনিশ্চিত পদক্ষেপে চারিদিক দিয়ে ঘিরে আসেও নাকি জীবনে! এক এক সময় বিস্ময়ে আনন্দে এরকম অভিভূত করে ফেলে, বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে স্বপ্ন কি সত্য।

দিনগুলি যেন এক কল্পলোক থেকে বেরিয়ে আর-এক কল্পলোকে মিলিয়ে যাচ্ছে। যা ছাখে, যা শোনে, যা করে সবই বড় সুন্দর, বড় ভালো। ওদের দুজনকে যে পড়ায় তাও এতো ভালো লাগে যে, যেন ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না। বিকালে অনেকক্ষণ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। তারপর মল্লীদের বাড়ি, সে তো স্বর্গই হয়ে উঠেছে; এত ভালো, এত সুন্দর এর আগে আর কখনও হয়ে ওঠেনি।

এইসব দিক দিয়ে ভালোর পাশে এক এক বার একটা দুর্বলতাও এসে উঁকি মারে, তা এত প্রবল যে, তাকে নিরোধ করা অসম্ভবই হয়ে পড়ে। মনে হয় দাঁড়াই গিয়ে অখিলদার কাছটিতে; এতবড় সর্বনাশ, তার সামনে ওর মনের এই ভাব, এ যেন একটা অমার্জনীয় বিলাসিতা।

অখিল শান্ত, বাইরে বিশেষ কিছু বোঝবার উপায় নেই, এক এই ছাড়া যে কথাবার্তা আরও এসেছে কমে; কিন্তু ওঁর ভেতরটা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়।...একজন ভারী বোঝা নিয়ে রিক্‌শা ঠেলে খাড়া চড়াইয়ের মুখে উঠছে, কপালের শিরাগুলা দপদপ করচে, মুখে কথা নেই, শুধু নাসারন্ধ্র দিয়ে তপ্ত নিশ্বাসের ঝড় বয়ে চলেছে। মনোগত এই চিত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকে তড়িৎ। অখিল যেন এই।

কিন্তু ভয় করে ওঁকে, ওঁর প্রতি এই শ্রদ্ধা, এই সহানুভূতির জন্যই ভয় করে; কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে ওর নিজের পক্ষে যা এত ভালো এত সুন্দর তার সবটুকু ভাসিয়ে সত্যই পাশে গিয়ে না দাঁড়ায়! কারখানার দিকে যায় না বড় একটা, গেলে গা'টা যেন ছমছম করে; একটা কিছু যদি প্রশ্নই করে বসেন, তার মধ্যে থাকেই যদি কোন অনুরোধের ইঙ্গিত, যদি করেই দেয় দুর্বল তড়িৎকে!

বিকালে পড়াবার পরই চলে যায় মল্লীদের ওখানে। এখানে যে ব্যাপারটুকু চলছে —যে রোমান্স, সেটাকে বেশ সূক্ষ্মতার সঙ্গেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তড়িৎ। যা এসেই গেছে, সম্পূর্ণ করায়ত্ত, অযথা চঞ্চল হয়ে তাতে রসাভাস ঘটায় কেন? নিপুণ শিল্পীর মতোই, একজন নিপুণ সঙ্গীতকারের মতই ধীরে ধীরে চরমটুকুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এতে কতকটা সাহায্য করছে দেবপ্রসন্ন আর মল্লীর একটা বিষয়ে অজ্ঞতা। তড়িৎ দেখল ওর পাসের খবরটা কারুরই জানা নেই। কিছুই আশ্চর্য হোল না; এম. এ. পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে কারুরই ঔৎসুক্য থাকবার বিশেষ কারণ নেই। দেবপ্রসন্ন কলকাতার কাগজই পড়েন। যখন ফল বেরুল, মল্লী তখন নেই রাঁচিতে; কনভেণ্টের মেয়ে হিসাবে স্থানীয় কলেজের ফলাফল সম্বন্ধে হয়তো যে-কৌতূহলটা জাগতে পারত, সেটা জাগবার অবসর পায়নি। প্রিয়রতন আর নলিনাক্ষ বাইরেই এখনও।

মল্লী যে জানে না, এ থেকে আর একটা সন্দেহ বেশ ভালো করে মিটে গেল। একসময় ওর দু'একটা কথায় মনে হয়েছিল, ও যখন অখিলের বাড়ি গিয়ে পড়ে তখন ওর কলেজে পড়ার খবরটাও পেয়ে থাকবে। পরে আবার ওর দু'একটা কথায় সে-ধারণাটা অনেকটাই কেটে গিয়েছিল, এখন একেবারেই নির্মূল হয়ে গেল।

না, জানে না। জানলে, এতবড় খবরে ওকে অভিনন্দিত না করেই পারত না, গোপনতাটুকু রক্ষা করা অসম্ভব হোত ওর পক্ষে।

তড়িৎও জানাল না। জানবার জন্যে যে শুভলগ্ন, যে চরম মুহূর্তটি, সেটিকে সযত্নে তুলে রেখেছে। মিশনারি কলেজের মিটিঙের আর তিনটি দিন আছে। তার ওপর আফিসের কায়দা-মাফিক সব ঠিকঠাক হোতে তারও তিনটে দিন। আরও একটা দিন হাতে রেখেছে তড়িৎ—সব মিলিয়ে পুরোপুরি এক সপ্তাহ—বেশি করে ধরেই। তারপর একসঙ্গে দুটি খবর দেবে,—একটির গায়ে একটি, নিয়োগপত্রটা বাড়িয়ে ধরে বলবে—"এই ত্যাখো, কাজও পেয়ে গেলাম একটা মল্লী, এখানকার মিশনারি কলেজেই।"

মল্লীর ডাগর চোখদুটির বিস্মিত পুলকিত দৃষ্টি যেন দেখতে পায় তড়িৎ।

থাক না, এত ত্বরা কিসের ?

এর মধ্যে কাছে এসে পড়ছে দুজনে—আরও কাছে, আরও কাছে।

অনেকখানি একলা পায় মল্লীকে আজকাল।

এরজন্যই কি মল্লী বেশ খানিকটা বেলা থাকতেই বাইরের লনে গাড়ি-বরান্দার ছায়ায় এসে হাতের কাজ নিয়ে থাকে বসে ? ঋতু-পরিবর্তনের জন্য শরীরে প্রায়ই খুঁতখুঁতানি লেগে থাকে একটু—তা ভিন্ন শরতের অনিশ্চিত আকাশ, কখন্ কোন্ দিক থেকে হৈ-হৈ করে একটা মেঘ এসে একপশলা বৃষ্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস ছড়িয়ে যাবে, তাই দেবপ্রসন্ন বেরোন কম; বেরুলেও সকাল সকাল ভেতরে চলে যান। ওদের দুজনের গল্প চলতে থাকে। একদিন একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে উঠল—"আপনি আজকাল সাইকেলেই আসেন তড়িৎবাবু, রিক্‌শাটা ছেড়ে দিলেন নাকি ?"

ওদের এই ব্যক্তিগত প্রশ্নোত্তরের মাঝখানে একটা ক্ষীণ পর্দা থাকে, মল্লী যে ওর সম্বন্ধে অনেক-কিছুই জানে, এটা গোপন করে রেখেছে তো।

তড়িৎ একটু ভাবল, তারপর প্রশ্ন করল—"রিক্‌শাটাকে কি চিরকালই ধরে রাখতে হবে ?—মানে, রিক্‌শা, তারপর ঐ ধরনের অন্য কিছু, তারপর আবার অন্য কিছু..."

মল্লীর মুখটা একটু ম্লান হয়ে গেল সহসা। তখনই সামলে নিয়ে হেসে বলল—

"না, না, আমি কি তাই বলছি ?—যে, রিক্‌শার পরে টমটম হাঁকান্, তারপর মোটর-লরি, তারপর..."

বেশ ভালোভাবেই হেসে উঠল।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও বেশ উঠেছিল কথাটা। দু'দিন পরেই যা প্রকাশ করে দেবে তার জন্যে পথটা তোয়ের করে রাখবার একটা যেন সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল তড়িৎ। উত্তরটা সেইভাবে আরম্ভও করেছিল—কিন্তু মল্লী মাঝপথেই মোড় ফিরিয়ে দিল।

তড়িৎ লক্ষ্য করে, এইরকম যেন হচ্ছে আজকাল। ওর চেষ্টা, যেভাবে যে প্রসঙ্গই উঠুক; আস্তে অস্তে সেই একটি চরম প্রশ্নের দিকেই তাকে চালিয়ে যাওয়া—কী ভাবে চায় মল্লী ওকে ? কতটা চায় ? যেটুকু পরিচয় পেল তড়িতের—ওর জীবনে Dignity of labour-এর যে মর্যাদা দিয়েছে তা তো রইলই, তারই বুনিয়াদের ওপর নিজেকে মল্লীর আরও কত উপযোগী করে তো তোলা যায়, সেই ইঙ্গিতটাই চায় দিতে। তারপরেই তো করবে আত্মনিবেদন। মল্লী খানিকটা পর্যন্ত যেন এগোয়, ওকেও দেয় এগিয়ে আসতে, তারপরেই এগুবার পথটা একেবারেই দেয় বন্ধ করে।

তড়িৎ ভাবে, এই কি নিয়ম ?—পুরুষ যাবে সতর্ক-পদে এগিয়ে, নারী করবে পদে পদে বাধার সৃষ্টি, অন্তত অভিনয় করে যাবে তার। ওটা যেমন পুরুষের আর্ট (Art), এটা তেমনি নারীরও আর্ট-ই নাকি ? অনাদিকাল থেকে চলে আসছে ?

একদিন আরও এগুল একটু। মল্লী বলল—"পরশু আমার জন্মতিথি, তড়িৎবাবু—নেমন্তন্ন করে রাখছি। পরশু সন্ধ্যেয়।"

"পরশুই ? মঙ্গলবার ?"—মনে মনে একটু হিসেব করে নিয়ে বলল—"আর দুটো দিন পরে হোলে আপনাকে চমৎকার একটা উপহার দিতে পারতাম। খালি হাতেই আসতে হবে।"

"খালি হাতই কম উপহার নাকি ?"

কথাটা বলেই সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে পড়ল মল্লী, অতটা অর্থ ভেবে বলেনি। কিন্তু বুদ্ধিমতী, সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিল। বেশ একটা মুক্তহাসির স্রোতে ভাসিয়েই দিল যেন কথাটা; বলল—"ও তড়িৎবাবু, দু'দিন পরে, সে-যে হোত একেবারে বেস্পতিবারের বারবেলা, জন্মাতাম কি করে ?—জানেন তো ডি. এল. রায়ের মানা আছে!"

হাসি থামলে আবার সহজ হয়ে বলল—"না, আসবেন নিশ্চয়। আপনি আবার বিনা নোটিসে হুট করে চলে যেতে ওস্তাদ, তাই দু'দিন আগে থাকতেই বলে রাখছি। একে তো কেউ নেই, দেখছেনই।"

তড়িৎ বলল—"অত করে বলতে হয় ? একে তো অমন একটা নেমন্তন্ন বাদই গেল কপালগুণে।"

"বাদ গেল !"

"একটা বলি কেন, দুটো। একটা পাকা দেখা, তারপর একটা—"

"বেশ চমৎকার ! এমন না হলে শুভার্থী ! আমি কোথায় ভাবছি মস্তবড় একটা ফাঁড়া গেল ..."

"ফাঁড়া !"

উৎকর্ণ হয়ে উঠল তড়িৎ। মল্লী এবারেও সামলে নিল ; বলল—"ফাঁড়া নয়তো কি ? কোথায় বছর ঘুরলেই পাসটা করে নোব আশা করে আছি !...সে আবার শুনছিলাম, একেবারে ভট্টচায্যি পরিবার..."

মুখ টিপে হাসতে লাগল।

এরপর কিন্তু আর যেন সামলানো গেল না।

জন্মতিথির দিন। এরা নেই, তবু অনেকগুলি লোক হয়েছিল মেয়ে-পুরুষে। সুতপা অতসী এদের ডেকে নেয়, আজ একা পড়ে গিয়ে বেশ মেহনৎ গেছে। দিনটাও খারাপ, বৃষ্টি নেই, তবে মেঘের যাওয়া-আসা হঠাৎ আবার আরম্ভ হয়ে গেছে অনেকদিন পরে। রাত না এগুতে অভ্যাগতদের বিদায় করবার জন্ত তাড়াহুড়া করতে হয়েছে। দেবপ্রসন্ন আবার এ-বিষয়ে বড় নার্ভাস। কলকাতার কাগজের রিপোর্ট—আবহাওয়াটা একবার হঠাৎ বিগড়ে ওঠবার সম্ভাবনা আছে।

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় হোলে তড়িতও উঠতে যাচ্ছিল, মল্লী বলল—"আপনি একটু বসবেন না ?" মিনতিভরা দুটি চোখ !

তড়িৎ উত্তর না দিয়ে বাইরের দিকে চাইল একবার। দেবপ্রসন্ন ওর সহায়তা করলেন ; বললেন—"রাতটা যে বড় খারাপ, মা।"

অভিমান হোল মল্লীর ; বলল—"তাহলে যান। আজ যেন কাউকেই পাওয়া গেল না ; শুধু খেটে মরতে হোল। চমৎকার জন্মতিথি বটে !"

দেবপ্রসন্ন তড়িতের দিকে চেয়ে বললেন—"কি করবে ? একটু বসেই যাবে তাহলে ? ক্ষতি হবে ?"

"ক্ষতি এমন আর কি ? শুধু আকাশের অবস্থা..."

"তেমন তেমন হয়, না হয় থেকেই যাবে। ঘরের তো অভাব নেই, লোকেরই অভাব।"

আজ হঠাৎ কি করে আলোচনাটা বড় গুরুতর হয়ে উঠল। ঠিক আলোচনা বলা যায় না, দেবপ্রসন্নই প্রায় একতরফা বক্তা। হঠাৎ কিরকম যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, শ্রোতা যে একজন রিক্শাওয়ালা, আর একটি কনভেন্টের ছাত্রী, সেটা হুঁশ নেই। ডিগনিটি-অব্-লেবার থেকে—বড় বড় আধুনিক তত্ত্বকথা সব—Revaluation of values (মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন), আরও কত কি। তড়িৎকে বুঝেও সব না-বোঝার ভান করে বসে থাকতে হোল, মল্লী আলোচনার মাঝামাঝি বোনার সরঞ্জাম নিয়ে এসে বসল।

দেবপ্রসন্ন একসময় হঠাৎ উঠে ভেতরে চলে গেলেন। একতরফাই তো, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। মল্লী একটু মুখ টিপে হেসে তড়িতের দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল—"ডেকে বসিয়ে একি তাড়াবার ব্যবস্থা জ্যাঠামশাইয়ের আজ!"

"উঠি তাহলে আজ।"—একটু গা নাড়া দিয়েই বলল তড়িৎ।

"বাঃ, আমার জন্যে কৈ আর বসলেন!...অবশ্য যদি নেহাৎই না বসতে চান..."

আজ বড় অপরূপ দেখাচ্ছে মল্লীকে। নিজেকে গোছাতে পারেনি ভালো করে, যেটুকু হয়তো পেরেছিল তাও শিথিল হয়ে গেছে; ক্লান্ত, কথায় কথায় অভিমান, যেন কত অসহায়, যেন কী নির্ভরতা খুঁজছে...

তড়িৎ একটু লজ্জিত হয়ে বলল—"না, সেজন্যে নয়; এতক্ষণ যখন কাটল..."

"কী ভাবে কাটল সেটাও তো দেখলাম বসে বসে।"—আবার বোনার কাজ থেকে সেই ভাবে চোখ তুলে একটু হেসে চাইল।

তড়িৎ বলল—"বেশ তো, দেখলেন যখন, শুধরে দেওয়াও তো উচিত..."

"কি করে?"—চকিত হয়ে প্রশ্ন করল মল্লী।

"এস্রাজটা..."

"আপনি শুনবেন এস্রাজ!!"

—এমন করে বলে উঠল, যেন জন্মতিথির সব সাধ নিঙড়ে এই একটি সাধেই এসে ঠেকেছিল ওর।

অথচ আজকের সন্ধ্যায় যে একটু আসর বসেছিল গান-বাজনার, তাতেও কয়েকজনের অনুরোধ সত্ত্বেও বাজাল না, শরীরটা বেশ ভালো নয়, সুর আসছে না বলে কাটিয়ে দিল। অবশ্য তড়িৎ করেনি অনুরোধ।

এস্রাজটা নিয়ে এল গিয়ে। সোফায় বসে বলল—"তাহলে একটু চা করুক; কি বলেন?"

আবার এত শীঘ্র চা কেন ?—তবে আপত্তি করল না তড়িৎ। খুশি কোনরকমে আবার প্রকাশ করবে তো নিজেকে। পাচক-ঠাকুরকে ডেকে বলে দিল মল্লী।

সুর বেঁধে তারে ছড়ের গোটাকয়েক টান দিয়ে থেমে গিয়ে বলল—"হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল একটা কথা জিজ্ঞেস করি ?"

"করো।"

ভাষার এই হঠাৎ পরিবর্তনে একটু যেন থমকে গেল মল্লী ; একমুহূর্ত, তারপর বলল, —"আমার পাওনাও আছে শোনাটা ; একদিন বাইরে থেকে বাজনা শুনে, আমারই বাজনা জেনে ভেতরে এসেছিলেন আপনি। কি করে জানলেন আমার বাজনা জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন একদিন বলবেন সে-কথা। যদি আপত্তি না থাকে তো…"

আজই তো বলবার দিন। তবুও তড়িৎ একটু আপত্তি তুলল—"দেরি হয়ে যাবে না ?"

"তার ব্যবস্থা তো করে দিলেন জ্যাঠামশাই ; থেকে যাবেন। নিন, বলুন।"

সেই বর্ষারাতের 'দেশ' রাগিণী।…শহরের বাইরে থেকে রিক্‌শা চালিয়ে আসতে আসতে। যেন চিরন্তন হয়ে লেগে রয়েছে কানে। সুরের মধ্য দিয়ে মল্লীকে সেই প্রথমদিনের পাওয়া, কে ভাবতে পেরেছিল যে, তা আজকের প্রায় সেই রকম একটি রাতে এভাবে সার্থক হয়ে উঠবে ? সমস্তটুকু বলে গেল তড়িৎ, বেশ খানিকটা আবেগময় হয়ে গিয়েই। মল্লী হেঁট হয়ে শুনছিল, শেষ হোলে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে ছড়ে টান দিল আবার।

'দেশ'-ই বাজাল। তড়িৎকে বলতেও হোল না। সমস্ত প্রাণ ঢেলে 'দেশ'-এর কারুণ্যকে যেন মূর্ত করে তুলল বিলম্বিত, মধ্যম, দ্রুত লয়ের মধ্য দিয়ে।

সঙ্গীত আজ হয়ে উঠেছে ওর মেঘদূত। কার কাছে পাঠাল তাকে ? ওর প্রণয়ী কি বিরহী যক্ষের মতো 'দূরসংস্থ' ? না, সে কাছেই আছে নিবিড় সান্নিধ্যে ?—'কণ্ঠাশ্লেষ' হয়েও বহুদূর ?

বেশ রাত হয়ে গেল, ঘড়িতে প্রায় এগারোটা। এত রাত কখনও হয়নি তড়িতের। উঠে পড়ল। মল্লীই একটু হেসে বলল—"ধন্যবাদ।"

মল্লীর রূপ আবার বদলেছে। ক্লান্তির জায়গায় মুখে ফুটে উঠেছে একটি শান্ত প্রসন্নতা।…'ধন্যবাদ' দিল, নিশ্চয় বসে থাকবার জন্য কৃতজ্ঞতায়, কিন্তু আরও কিছু নেই কি তার সঙ্গে ?

মল্লী কৃতজ্ঞতার কথাই বলল—ওর সঙ্গে গেট পর্যন্ত আসতে আসতে—"বড় খারাপ

লাগছিল আজ, থেকে গিয়ে যে কী উপকার করেছেন, কী করে যে সেটা পরিশোধ করব…”

কেন যে উত্তরটা মুখে আটকে গেল, তড়িৎ নিজেই পারল না বুঝতে।

মল্লী বলল আবার—“নলিনাক্ষবাবুর গাড়িটা থাকলেও না-হয় পৌঁছে দিয়ে আসতাম আপনাকে বাড়িতে। সময় দিলেন, সময় দিয়ে শোধ করা যেত।”

চমৎকার বলা চলত—“কেন, শোধ দেওয়ার কী আর অন্য উপায় নেই মল্লী?” কিন্তু তড়িৎ শুধু ঘুরে চাইল; বলা হোল না এবারেও কিছু। ও গেটের বাইরে গিয়ে সাইকেলে পা দিয়েছে, মল্লী গেট বন্ধ করতে করতে হেসে বলল—“নতুন নয়, জানা আছে। এবার একদিন দেখবেন হঠাৎ গিয়ে উঠেছি।”

—আর ঐ সূক্ষ্ম ব্যবধানটুকু রাখে কেন? লুকোচুরি—সে তো অন্যের কাছ থেকে লুকোনোর জন্য।

(আটত্রিশ)

তড়িতের পাসের খবরটা বাড়ির আর-সবাই উৎফুল্লতার সঙ্গে গ্রহণ করলেও রতি করতে পারেনি। বাইরে বাইরে সে অবশ্য আর-সবার মতোই আনন্দ প্রকাশ করেছে, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সেও খাওয়াবার জন্য ধরেছে কিন্তু যে মনের সন্ধান রাখে তার কাছে কিছুই গোপন থাকে না। তড়িৎ জানে রতি নিরাশ হয়েছে।

দোষ দেয় না, এটা যে হবেই। ওর পাস করার সঙ্গে রতি বুঝেছে, ও একেবারেই নাগালের বাইরে চলে গেল। এমনি পাস করায় ক্ষতি ছিল না, আরও যদি পাস করবার থাকত, ওর সাফল্যের জন্য উল্লসিত হোত রতি, আর-সবার চেয়ে বেশি করেই; কিন্তু মল্লী রয়েছে। এম.এ. হয়ে তড়িৎ অনিবার্যভাবেই মল্লীর হয়ে গেল।

অত যে পড়াশোনা—তড়িতের জন্য অত যে কঠিন তপস্যা তা ছেড়ে দিয়েছে। একেবারে ছাড়া যায় না। সকালবেলাটায় আসে, বসে; কিন্তু আর সে-প্রাণ নেই। রাত্রের সে বিনিদ্র পরিশ্রম নেই, পড়া হয় না, ভুল হয়, তড়িৎ কিন্তু আর কিছু বলে না।

বেদনায় ওর মনটি ভরে থাকে; কিন্তু ওরই বা কি উপায় আছে?

মল্লীকে বৃহস্পতিবারের কথা একদিন বাড়িয়েই বলেছিল তড়িৎ, যদিই নিয়োগপত্রটা পেতে দেরি হয়ে যায়। মিটিংটা বুধবার সকালেই, অর্থাৎ মল্লীর জন্মতিথির পরদিনই।

ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই মনটা চঞ্চল হয়ে রয়েছে, কি হয় কি হয়। কালকে মল্লীদের বাড়িতে যা ঘটল তাতে মনটা যেন আরও উদগ্র হয়ে রয়েছে ; জীবনের একটা অংশ সফল হয়েছে, তাকে পূর্ণতা দেবে আজকের সফলতা। অনেক আশা করে রয়েছে তড়িৎ।

রতি আজ পড়তে আসেনি, মাথা-ধরার নাম করে শুয়ে আছে। ওকে আগে পড়ায়, শেষ হোলে ও কাজে চলে যায়, বিমলকে নিয়ে বসে তড়িৎ। অনেকক্ষণ বিমলকে পড়াবার পর হঠাৎ খেয়াল হোল একবার দেখে আসা দরকার রতিকে। মনটা এতই লেগে রয়েছে নিয়োগপত্রটার দিকে যে, আগে একেবারেই হুঁশ হয়নি। একবার উঠে গেল, ভুল শোধরাতেই। আগেকার মতো হোলে ঠাট্টা করে বলত পড়ায় ফাঁকি দেওয়ার মতলব বের করেছে ; এখন প্রকৃতই যখন তাই, কিছুই বলল না, ঋতু-পরিবর্তনের সময়, সাবধান থাকতে বলে এল।

আকাশের অবস্থাটা আজ যেন আরও একটু খারাপ। এলোমেলো বাতাস, ভাঙা-ভাঙা মেঘের যাওয়া-আসা, ভেবেছে বিকালে একবার যাবে ফাদার 'এম্'-এর বাসায় খবরটা নিতে, যদি বাড়ে তো কি করে হবে? মনটাও এই রকম হয়ে রয়েছে—আশা, উদ্বেগ, তার সঙ্গে আর কি যে, তা ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না, দুটো পথের সামনে এসে সেই দ্বিধা কি?...মোটের ওপর সেখানেও যেন একটা দুর্যোগের পূর্বলক্ষণ।

বড় অস্বস্তিতে যাচ্ছে ; ভালো বা মন্দ যা আসছে তার সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারলে যেন বাঁচে। দুপুরেই বেরিয়ে পড়ত, কিন্তু ফাদার 'এম্' তখন কলেজে যে।

বিকাল হওয়ার আগেই পড়ল বেরিয়ে।

সাইকেলটা বাড়িতেই থাকে, কারখানার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ কি মনে হোল, সাইকেল থেকে নামল। খোঁজ নিয়ে জানল অখিল পেছনের নূতন কারখানায়। সাইকেলটা আফিসের সামনে রেখে ঘুরে শেডের দিকে চলে গেল তড়িৎ।

যা দেখল তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

দেখতে না পেয়ে অখিলদা বলে ডাক দিয়েছে—একটা চাকা-খোলা, বনেট-তোলা মোটরের নীচে থেকে উত্তর এল—"কে, তড়িৎ? বোসো, আসি।"

অখিল বেরিয়ে এলেন। প্রশ্ন করলেন—"কিছু দরকার আছে?"

ওর বিমূঢ় চোখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন—"ও! আমায় দেখে?...হ্যাঁ, আর একটু এগিয়ে গেলাম। রিক্শা রইল, যেমন গোড়ায় ছিল, তার সঙ্গে এবার মোটরও আরম্ভ করে দিলাম। এর অন্ধি-সন্ধি জানা আছে তো তোমার। একেবারেই

গোড়া থেকে আরম্ভ করলাম। দেখি না আবার ল'ড়ে, কতটা এগুনো যায়। হ্যাঁ, কিছু দরকার আছে ?"

অখিলের কোমরে লুঙ্গি, গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জী। সদ্য মেহনতে হাত-পায়ের শিরা-উপশিরাগুলা ফুলে উঠেছে, প্রশস্ত বুকখানা ভারি নিশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে একটু একটু। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তেল-কালিতে মাখামাখি, যেখানে যেখানে নেই, গায়ের উজ্জ্বল রংটা আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। যেন খণ্ড খণ্ড মেঘে ভরা আকাশখানা ; ভেতরে ভেতরে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ।

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারেনি তড়িৎ ; একটু যেন চমক ভেঙেই বলল—"ও, হ্যাঁ···তেমন দরকার কিছু নেই। একটু প্রণাম করতে এলাম।"

"কোথাও যাচ্ছ, বাইরে ?"

"না, একটা কাজে যাচ্ছি ; শহরেই।"

বৃথা কৌতূহল দেখান না, তবে একটু যেন অস্বাভাবিক মনে হওয়ার জন্যই প্রশ্ন করলেন—"কি কাজ, যদি আপত্তি না থাকে···"

একটু ভাবল তড়িৎ ; হেসে বললে—"ফিরেই বলব অখিলদা, থাক এখন।"

প্রণাম করবার জন্যে ঝুঁকলে বললেন—"কিন্তু অবস্থা তো দেখছ। আঙ্গগোছেই সারো প্রণামটা।"

তড়িৎ ভালো করেই পায়ে হাত দিয়ে হাতটা কপালে ঠেকিয়ে চলে গেল। কাছাকাছি গিয়ে বাতাসটা হঠাৎ বেড়ে উঠল, খানিকটা ঝড়ের মতোই। কাছেই একটি বেহারী বন্ধুর বাড়ি পেয়ে কিছুক্ষণ থেমে গেল তড়িৎ। ও-ভাবটা কাটলে যখন ফাদার 'এম্'-এর বাসায় পৌছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

সেদিনকার চেয়ে আরও যেন উল্লসিত হয়ে এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন ফাদার 'এম্' ; বললেন—"এসো তড়িৎ, বোসো। তোমায় আজ আবার অভিনন্দিত করবার সুযোগ পেয়েছি আমি—তুমি পেয়ে গেছ কাজটা। তোমার নিয়োগপত্রটাও নিয়ে এসেছি আমি···"

হঠাৎ কপালের দিকে চেয়ে বললেন—"কিন্তু ওকি ? কালি কেন তোমার কপালে, কোন পুজোটুজো নাকি ?"

তড়িৎ মুছে ফেলতে গিয়ে হাতটা আবার নামিয়ে নিল, একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বলল—"পুজোই ফাদার, শুভদিনে আমরা করিই জানেন তো।"

"বেশ, বেশ, কিন্তু যদি কিছু মনে না করো, তোমায় খুব যেন খুশী

দেখাচ্ছে না আজ, মনে হচ্ছে যেন কোন কারণে দোমনা হয়ে রয়েছ! ঠিক কি?"

"দোমনা, ফাদার, কৈ ...?"

"থাক, বোধহয় আমারই ভুল। আমরা মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিকেরা খুব বেশিরকম খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে মাঝে মাঝে এইরকম ভুল করে বসি। বেশ, বেশ, চাঙ্গা হয়ে ওঠ (Cheerio!)।—কবে কাজে লাগছ?"

"যত শীঘ্র পারি, ফাদার।"

"বেশ, বেশ, তাড়াতাড়ি আরম্ভ করে দাও।"

চা, টোস্ট, ফল এল। অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে গল্প হোল—জীবন নিয়ে, জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে—অনেক নূতন পুরাতন দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে—সেদিনের মল্লীদের ওখানকার Revaluation of values-ও এসে পড়ল, সাম্যবাদও।

তড়িতের মনে হলো কথার সঙ্গে সঙ্গে আজ যেন ফাদার 'এম্' ওকে একটু বেশি লক্ষ্য করে যাচ্ছেন, যেন তলিয়ে ভেতরটা দেখার ভাব কতটা। ফল এই হোল, ও একটু সঙ্কুচিতই হয়ে রইল বরাবর। বোধহয় তাইতেই ওঁর সন্দেহটা পুষ্ট হয়ে থাকবে আরও, এবং সেইজন্যই শেষের দিকে ঐ কথাটা বললেন—

ওঠবার সময় দস্তখৎ দিয়ে নিয়োগপত্রটা হাতে নিয়ে তড়িৎ বলল—"আমি যে কী কৃতজ্ঞ রইলাম আপনার কাছে, ফাদার..."

ফাদার 'এম্' স্নেহভরে পিঠে হাত রাখলেন; বললেন—"ও-কথা একবারে নয়, তড়িৎ। কৃতজ্ঞতা আবার অনেক সময় পঙ্গু করে দেয়, আমি চাই না যে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা তোমায় সেইরকম কিছু করে রাখে।...আচ্ছা, বিদায়। (Not at all, Tarit. Gratitude often paralyses free action. I would not like gratitude towards me should affect you that way....Well, good night.)"

(উনচল্লিশ)

বাইরে বেরিয়ে মনে হোল, যে-হাওয়াটা বইছে তার পিঠে চড়ে যদি যাওয়া যেত মল্লীর কাছে!

কিন্তু হাওয়াটাই হয়ে উঠল অন্তরায়। চ'ড়ে সাইকেলটা অনেক কষ্টে একটুখানি

চালিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখল, অসম্ভব। অত্যন্ত এলোমেলো হাওয়া, তার আরও বেড়েছে, সাইকেল হালকা জিনিস, এক-একটা ঝাপ্‌টা এসে লাগছে, মনে হচ্ছে যেন উল্টে দেবে। তড়িৎ নেমে পড়ল, ওর বেহারী বন্ধুর বাড়িটা বেশি দূরে নয়, সাইকেলটা হাতে করে নিয়েই সেখানে গিয়ে উঠল। রিকৃশার অপেক্ষায় বসে রইল খানিকটা। রিকৃশা এসব পাড়ায় কম, তায় আজ বেরোয়নিও। খানিকক্ষণ বসে থেকে আবার নেমে পড়ল তড়িৎ, সাইকেলটা রেখেই। আর ধৈর্য রাখতে পারছে না।

মল্লীদের বাড়িটা শহরের এদিকেই, তবু মাইল-খানেকের পথ হবে। এগুল।

প্রায় আধাআধি গিয়ে একটা তেমাথায় এসে পড়ল; একটা পথ গেছে মল্লীদের বাড়ির দিকে, একটা পথ গেছে কারখানার পানে। হঠাৎ একটা দ্বিধা উঠল মনে, কোন্ দিকে যাবে?

মল্লীদের বাড়িটা কাছে; আজকের সব সফলতা, সমস্ত জীবনের সফলতা সেইখানেই, তা ভিন্ন সদ্য নিরাপত্তা। আকাশ যে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে বলা যায় না। পা বাড়াল তড়িৎ।

কিন্তু আকাশের ঝঞ্ঝার চেয়ে প্রবলতর এক ঝঞ্ঝা উঠেছে হঠাৎ মনে। আজ এইটুকু পথ বাছার মধ্যে যেন একটা জীবনের মৃত্যু ঘটে গেল।

সে-জীবনে ছিল নব আশা, নব উদ্যম; গতানুগতিকের দাসত্ব নয় সে-জীবন। সেটা ছিল মিশন, ব্রত, তপস্যা; নিজেকে, নিজের সঙ্গে জাতিকে একটা নূতন যুগের, একটা নূতন জগতের উপকূলে নিয়ে যাওয়া।…শোনা যায়, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো কী একটা দীপ্ত মুহূর্তে নাকি মুমূর্ষুর চিত্তে জীবনের একখানি পরিপূর্ণ চিত্র ভেসে ওঠে। তাই উঠল—

—একটি ব্যর্থ, ক্লান্ত সন্ধ্যা, টুইশন খুঁজে খুঁজে—হঠাৎ এল রিকৃশা, আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে—দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে মর্যাদার অর্ঘ্য—দেবপ্রসন্নের, নলিনাক্ষের, মল্লীর, সুতপার, অনুপের, আরও কত সবের দৃষ্টিতে—পুণ্যিপুকুরের ধারে সেই একটি দিন, প্রিয়রতন হানল আঘাত—মরুক্ষুর কুটির—তার আহত মর্যাদা থেকে তুলে ধরল তাকে; মরুক্ষু, রুবাই—মানপুর যেতে সেই নূতন জগতের সূর্যোদয়—কর্মযজ্ঞের জগৎ—ঝরিয়া, বরাকর, কুলটি, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর—মত্তবেগে ছুটে চলেছে গাড়িটি সেই নবীন সূর্য লক্ষ করে—একটি মুগ্ধ যুবা—তার দৃষ্টিতে নবীন স্বপ্ন, বুকে নবীন সংকল্প।…এরই মৃত্যু ঘটতে চলেছে আজ।

এগিয়েই চলছিল তড়িৎ, আবার থমকে দাঁড়াল। আর এক এমনি বিদ্যুৎঝলকে

ভেসে উঠছে আর এক চিত্র—সামনে দাঁড়িয়ে অখিল, যেন পথ আগলেই—দীর্ঘচ্ছন্দ, শক্তিধর পুরুষ—সারা অঙ্গে তেলকালির সেই কৃষ্ণ চন্দন, চোখে অন্য এক লোকের মহিমা।…নিজের কপালে হাত দিয়ে হাতটা চোখের সামনে ধরল তড়িৎ, তাঁর আশীর্বাদ—সেই জয়তিলকটা তখনও বহন করছে সেখানে। অতি সংকীর্ণ, অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে—মল্লী, প্রফেসারি, আর এক গোছা প্রবঞ্চনালব্ধ, অন্তঃসারহীন সার্টিফিকেট নিয়ে এই জীবনটা।

কিন্তু…পারছে কৈ? সব বাধা, সব প্রশ্নের ওপরেই যে আবার সেই মল্লী।

আবার পা বাড়াল। তারপরই সর্ব অঙ্গে শিহরণ জাগিয়ে বহু দূরাগত একটি সংগীত-ধ্বনি—খুব ক্ষীণ, তবু একটু একটু যেন আভাসে শোনা যায়, ঝড়ের দোলায় কখনও লুপ্ত, কখনও প্রকট। রুবাইয়ে সেই গান—

"ওগো আমার বন্ধু, তুমি যদি হও মুঞ্জরিত লতার মতো কোমল—দক্ষিণা হাওয়ার নিশ্বাসে পড় হেলে, আমি তবে কাকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকব?…"

গান এগিয়ে আসছে। রুবাইয়ের গলা। চেনা যাচ্ছে রুবাইকে। ও সামনে, পিছনে আর এক রিক্‌শা। বুক দিয়ে বাতাস ঠেলে সমস্ত শরীটাকে তুলিয়ে তুলিয়ে নিয়ে আসছে রিক্‌শা। বড় আশ্চর্য লাগছে—এই জীবনের গোড়ায় ছিল রুবাই; সেদিন ওর মুখের কথাই মন্ত্র হয়ে ডেকে এনেছিল এই জীবনকে; আজ সেই জীবনের বিদায় নেওয়ার বেলা ওর মুখের এই গান—এ যেন রূঢ় পরিহাসের মতোই কানে এসে বাজছে।—দৃপ্ত পুরুষকার থেকে, কঠোর কর্মজীবন থেকে তপঃভ্রষ্ট হয়ে ভালোবাসার দক্ষিণা হাওয়ায় শিথিল হয়ে পড়া!

কিন্তু উপায়ও তো নেই। আর একটি সংগীত, 'দেশ' রাগিনীর মূর্ছনায় এই বাদল হাওয়াতেই যে ওতপ্রোত হ'য়ে রয়েছে মিশে। মুক্তি কোথায় এ থেকে?

নূতন বিবাহ, বাইরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাইছে রুবাই, বুকে বাতাস ভরে নিয়ে—

"—ঝড়-ঝঞ্ঝা? তাকে কী ভয়? ঝড়-ঝঞ্ঝাতেই তো তুমি হয়ে উঠবে আরও সবল, আরও কঠিন। আমি নিশ্চিত আলিঙ্গনে তোমায় থাকব জড়িয়ে, ওগো আমার দয়িত…"

কাছে এসে পড়ল দুজনে। দুটা রিকশাই খালি। তড়িৎ গান শুনতে শুনতে এগিয়ে যাচ্ছিল, এক মুহূর্তে দেহের সমস্ত পেশীগুলাকে শক্ত করে নিয়ে পড়ল দাঁড়িয়ে, প্রশ্ন করল—"রুবাই নাকি?"

"কে বটে? মিত্তিরবাবু যে! তু ইখানে এমন ঝড়ে?"

"রিক্শা পাচ্ছি না।"

"এই তো রয়েছেঁ রে রিসকা—দু' দুখানা।

"তোমরা তো কারখানায় যাচ্ছিলে, আর আমি যাচ্ছি…"

রুবাই বাধা দিয়ে বলল—"কারখানা ছেড়েঁ্য আর কুথায় যাব রে? দূরে যেয়েঁছিলাম, কামাইছি পাঁচ টাকা করে, আর কত কামাইব? এবার তো রিসকা জমা দিয়ে…"

সঙ্গী ঠাট্টা করে বলছে—"জমা দিয়ে ঘরে যাবে না! নয়া সাদিটি করল—ইরকম ঝড়ের রাত—নয়া বহুটি পথ চেয়েঁ আছে…"

খুব কান ছিল না তড়িতের ওদের কথায়। দৃষ্টিও ছিল সামনেই; ঘুরিয়ে আনল, বলল—"নিয়ে যাবে?"

"কুথায়? তু তো ভিন্ পথে যাবি।…তা চল ক্যানে্ কুথায় যাবি, নয়া বহুটি তো পলাইছেঁ না আমার…"

কান ছিল না তড়িতের; একটা জীবন-মরণ চেষ্টা চলছে ভেতরে। যেন একটা ঘোর থেকে জেগে উঠে বলল—"না রে ভিন্ পথ কেন, কারখানাতেই তো যাব, চল্।"

পা বাড়াল রিক্শার দিকে।

একটা অদ্ভুত আনন্দ, মনটা এক কঠিন দুর্ভেদ্য আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে যেন হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। তাইতেই, উঠতে উঠতে একটু হেসে যেন না বলে পারল না—"কিন্তু ভাড়া পাবে না এক পয়সাও। ভাই-বেরাদারই তো আমরা, নয় কি?"

প্যাডেলে চাপ দিল রুবাই, কটকট করে গোটাকতক শব্দ হোল, চেনটা পিছলে পিছলে যাচ্ছে; বলল—"তু চল ক্যানে। ভাড়াটি নিবে কে যে তু দিবি? ফকীর আছি, না, কাঙাল আছিঁ রে?"

—আরম্ভ করে দিল তার গান।

ঝঞ্ঝা ঘিরে ফেলেছে আরও। ফেলুক, আরও ফেলুক না, তড়িৎ তো নোঙর তুলে ফেলেছে তরণীর, পাল তুলে দিয়েছে। কী যে উল্লাস মুক্তির!

যেতে যেতে এক সময় পকেটে হাত দিয়ে কলেজের নিয়োগ-পত্রটা বের করে নিল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে কি ভাবল।

'ফাদার এম্' বুঝেছিলেন। ওঁরা তো ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি, বুঝেছিলেন; তাই দান করেও না-নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে।

এইটুকুই তো ও-জীবনের সঙ্গে শেষ বন্ধন। যদি আবার কখনও দৃঢ় হয়ে ওঠে, দুশ্ছেদ্য হয়ে ওঠে!

কপালে একবার শ্রদ্ধাভরে ঠেকিয়ে, ছোট ছোট টুকরা করে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিল তড়িৎ।...বাকি রইল বিশ্ববিদ্যালয়ের মানপত্রগুলা।

বেশি রাত হয় নি, অখিল তখনও কারখানাতেই। সেই ভাবই, মোটরের ভেতরকার ব্যাপারটা শেষ করে এদিক ওদিক ঠোকাঠুকি করছেন। তড়িৎ গিয়ে দাঁড়াতে বললেন—"ফিরে এলে তাড়াতাড়ি? বেশ করেছ, আকাশের যা অবস্থা।...হ্যাঁ, কি কাজে গিয়েছিলে, বললে ফিরে এসে জানাবে। হয়েছে?"

"হয়েছে আখিলদা। আমি কিন্তু অন্য কথা বলতে এলাম। বলেছিলেন— বিশ্বাসী লোক, নিজের লোক পেলে কাজে নেবেন। আমায় যদি নিজের মনে করে আর বিশ্বাসী ভেবে নেন—"

(পরিশিষ্ট)

তারপর আবার ভেবে দেখেছে; একটি উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে অত নিরবশেষ করে তো ছাড়া যায় না। তা ভিন্ন জীবনের একটা অংশ থেকে একটা অংশ বাদ দেওয়া, সে তো একটা ডাল কাটা, ফল-কাটাও নয় যে দুটোয় আর সম্বন্ধ থাকবে না। অনেক কর্মক্লান্ত উদাস মুহূর্তে ফিরে ফিরে এসেছে মল্লী।...মল্লী তো ভালবাসত তার এই জীবন, বরং এই জীবনের জন্যই বাসত ভালো তাকে, এই জীবন নিয়েই কি তাকে পাওয়া যেত না?

অনেক ভেবে দেখেছে, সংশয় কাটেনি। অংশত যে-জীবনের জন্য তার শ্রদ্ধা ছিল, পুরাপুরি সে-জীবনকে গ্রহণ করতে পারত কিনা সে-বিষয়ে থেকেই যায় সন্দেহ। শেষের দিকে মল্লী যে অত এগিয়েছিল, অন্তত এগিয়েছে বলে মনে হয়েছিল তড়িতের—তা হয়তো এইজন্যই যে, সে টের পেয়েই থাকবে তড়িৎ এম.এ.-র ছাত্র. ভেতরে ভেতরে খবর রেখে থাকবে সে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ মানপত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছে; ডিগ্‌নিটি-অব্‌-লেবার রইলই, এম. এ হ'য়ে এবার সে তাদের জগতে—যাকে সভ্যজগৎ বলে, সেখানে উঠে আসবে।...নারীর মন তো আরও রোম্যান্স-প্রিয়।...একটা প্রচণ্ড চোট লাগত তার মনে; সে-আঘাত সহ্য করে থাকলেও জীবন কি তার দুর্বহ হয়ে উঠত না?

কে জানে কতটা গভীর হতে পারে নারীর ভালবাসা, কতটা সহ্য করে জীবনের সঙ্গে আপোস করে নিয়ে থাকতে পারে টেঁকে।

এটা গেল, মল্লীর দিকে। তড়িৎ তো জানে নিজের ভালবাসা। তার পক্ষেই কি সম্ভব ছিল তাকে এ আবর্তের মধ্যে টেনে আনা? উচিত হোত কি?

মল্লীর বাবার দিকের বাধাটা আরও দুর্লঙ্ঘ্য।...এক, প্রফেসার হয়ে ওঁর খরচে বিলাত গেলে চলত। কিন্তু ডিগ্‌নিটি-অব্‌-লেবারের পাশে এই ইন্‌ডিগ্‌নিটি (in-dignity), এই চিরজীবনের গ্লানি কি দুঃসহ হয়ে উঠত না? মল্লীর মনই কি একটা আঘাত পেত না অন্তদিক দিয়ে?

এসব কথা মনে হয় কোনও দুর্বল মুহূর্তে, তর্ক হিসাবেই, নয়তো যা করেছে, যে-পথ বেছেছে তার জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই তড়িতের। অখিলের পাশে-পাশে থেকে এগিয়ে চলেছে।

একটা বিরাটতর জীবনের সন্ধান পেয়েছে যেন এরই মধ্যে। মাস চার কেটে গেল, রাঁচির তীব্র শীতে কর্মপ্রবণতা বাড়িয়ে দিয়েছিল, অনেকদূর এগিয়ে গেছে সেই জীবনের দিকে।

পরিপূর্ণ ভাবে গড়ে তুলবে জীবনকে। যে-শিক্ষায় হাতেখড়ি হয়েছিল মাস্টার-মশাইয়ের মতো গুরুর কাছে, তাকে জীবনে ব্যর্থ হতে দেবে নাকি? ভালো একটি লাইব্রেরির পত্তন করেছে বাড়িতে। নিজেকে পূর্ণ করবে। নিজেকে পূর্ণ করবে শিষ্যের মধ্যে দিয়েও। বিমলকে বলে—"জ্ঞানের দিকেই লক্ষ্য রেখে যাবে, সার্টিফিকেট আসে ভালোই, তবে যেন জ্ঞানের পুরস্কার হয়ে আসে, নিতে যেন বিবেকের দংশন-জ্বালা না সহ্য করতে হয়।"...পুরস্কার হয়েই এসেছে যাঁদের হাতে তাঁদের নাম করে—জীবনী শোনায়।

মানপুর—দাদা, বৌদিদি ও রমাকে নিয়ে মানপুর রয়েছে মনের মণিকোটায় সযত্নে সঞ্চিত। আবার হয়ে এল সেদিন, সচ্ছলতার আর একটি আভাস দিয়ে।...কি করছে তার সঙ্কেত দেয়নি এখনও। আরও কিছুদিন যাক, দেবে—ওঁদের আর মাস্টারমশাইকে।

এগিয়ে চলেছে। পরিতাপ কোনদিন ছিল না, আজ নেই, কখনও থাকবে না।...শুধু তাই নয়। একদিন দেখল—সেই যে দুটি পথের মধ্যে একটিকে বর্জন করল সেই ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ রাত্রে, তাতে ছিল কোন এক অদৃশ্য শক্তির আশীর্বাদ। এ আবিষ্কার তাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তাঁর কল্যাণ-বিধানের সামনে তার মাথাটা যেন নুইয়ে দিল—

আরও কয়েক মাস পরের কথা। কারখানাকে অনেকটা ফিরিয়ে এনেছেন

আগেকার অবস্থায় অখিল। ঠিক হয়েছে এবার ওঁরা আবার সেই পুরনো পরিকল্পনায় হাত দেবেন, লোকেনবাবুর প্রবঞ্চনায় যেখানে ছেদ পড়ে গিয়েছিল। তড়িতের কলকাতার বাজারটা দেখা আছে, সে-ই এসেছে আবার যোগাযোগ স্থাপন করতে। এসেছে দিন চার হোল। রাত হয়ে যায় ফিরতে। কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আজ সকাল-সকালই ফিরেছে, সন্ধ্যার একটু পূর্বেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবে, হোটেলের ম্যানেজার আফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন —"আপনার এই একখানা চিঠি আছে।"…রেজেস্টারি-করা চিঠি বড় খামে; রাঁচি থেকে অখিল পাঠিয়েছেন।

ক্লান্ত ছিল, মুখ হাত ধুয়েই নিল তড়িৎ, তারপর বেয়ারেকে ডেকে চা দিয়ে যেতে ব'লে আরাম-চেয়ারটা বারান্দায় -টেনে নিয়ে বসল। চিঠিটা খুলল। একটি নিমন্ত্রণ-কার্ড: অমুকের পুত্র শ্রীমান নলিনাক্ষ রায়ের সঙ্গে অমুকের কন্যা শ্রীমতী মল্লী বসুর শুভ-বিবাহ—অমুক দিন, অমুক স্থান ইত্যাদি।

সঙ্গে অখিলের একখানি পত্র: বহুদিন পূর্বে যে-মেয়েটি সেই বর্ষার দিনে তার বাবার সঙ্গে এসে পড়েছিল, সে আজ সকালে এসেছিল এই চিঠিটা নিজের হাতে দিতে, সঙ্গে একটি যুবা। অতি অবশ্য করে আসতে বলে গেছে।

দুটি পাতায় নিমন্ত্রণ-পত্র, একটা মলাটের আকারে। তার ভাঁজের মধ্যে একটা চিরকুট। লেখা রয়েছে—"নিশ্চয় আসবেন, অতি নিশ্চয়।" নেই দেখে তাড়াতাড়ি ভরে দিয়েছে মল্লী, নীচে দুজনেরই স্বাক্ষর।

গরম পড়েছে, তবে বারান্দায় বেশ দক্ষিণে-হাওয়া। চিঠিটা হাতে নিয়ে গা এলিয়ে দিল চেয়ারে তড়িৎ। অনেক কথা মনে হচ্ছে, অনেক রকম অনুভূতি; তার মধ্যে একটি অনুভূতিই বেশি প্রবল—লজ্জায়-সঙ্কোচে মনটা গুটিয়ে আসছে—সেদিন সেই শেষ-বিদায়ের দিন আর-সব আয়োজনই পূর্ণ ছিল, শুধু দু'বার দুটি সুযোগে তার মুখে কথা গিয়েছিল আটকে—কী একটা লজ্জাই যে সারাজীবনের সাথী হয়ে থাকত!…যে অদৃশ্য-শক্তি সেদিন তার লুব্ধ রসনাকে সংযত করেছিলেন—যিনি ফিরিয়েছিলেন তাকে ও-পথ থেকে, তাঁকে কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে প্রণাম করল তড়িৎ।

চিঠিখানা হাতে করে পড়ে রইল। চিন্তা স্বচ্ছ হয়ে আসছে।…সত্যই তো, এ কেমন আশ্চর্য কথা যে মেয়েরা ভালবাসবে ভালবাসার একটি রূপে; আকৃষ্ট হোলে, সেই এক রূপেই হবে আকৃষ্ট! কোন্ এক চিরন্তন ভুলের অভ্যাসে আমরা তাদের

মনকে এই একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ বলে ধরে নিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।…সঙ্কোচে গা-টা যেন সিড়সিড় করছে।

ধীরে ধীরে মনেও পড়ছে সব ; স্মৃতির কন্দর থেকে এক একটি আলোক-রশ্মির মতো বেরিয়ে আসছে যেন—

পুণ্যিপুকুরের সেই রাত্রি—তড়িৎ যখন বেবিয়ে এল মকৃষ্ণর কুটীর থেকে। দূর থেকে মনে হোল মল্লী যেন শুয়েই ছিল—নলিনাক্ষের কোলে মাথা দিয়ে যদি নাও হয় তো অন্তত গা ঘেঁষে বটেই, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল—মানপুর থেকে এসে যখন অসুস্থ দেখল মল্লীকে, সে শুয়ে ছিল, নলিনাক্ষই তাকে ধরে বসিয়ে দিল। মল্লী আপত্তি করল না, অথচ সে নিজেই পাবত উঠে বসতে—একদিন রাতে নলিনাক্ষ যখন মোটরে ওকে এগিয়ে দিতে চাইল, মল্লী সঙ্গ নিল , ফিরল তারা মাত্র দুজনে…

আর সবগুলায় কিছু অস্পষ্টতা ছিল, কিছু সংশয় ছিল, এটা কিন্তু একেবারে স্পষ্ট, সেদিন অনেকবারই তড়িতেব ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল মাঝে মাঝে। এ কেমন করে সম্ভব হয়!—আরও মনে পড়ে, এখন সে কথা অর্থবান হয়ে উঠেছে।…জন্মতিথির দিন মল্লী কিছু বাজাতে চায়নি আগে, বড যেন বিষণ্ণও ছিল। সেদিন তড়িতের মনে হয়েছিল কান্তিই।…সেদিন নলিনাক্ষ ছিল সুদূব কাশ্মীরে।

আর একটা দিনেব কথা আজ বড বেশি মনে হচ্ছে। একদিন তড়িৎকে একান্তে পেয়ে মল্লী বলেছিল—"বড অসহায উনি, তড়িৎবাবু…বড়মানুষের ছেলেদের বাতিক, কিন্তু ইনোসেণ্ট (innocent) বাতিকই তো…"

কী যে দরদ, কতখানি যে বেদনা মিশেছিল সেদিন ওব এই ক'টি কথায়!

অথচ এই বাতিক নিয়ে মল্লী-ই ওকে সবচেয়ে বেশি ঠাট্টা করত।

কোন একটা বইযে পড়েছিল তড়িং—যে তোমায় ভালবাসে সে-ই তোমার ভুল ধরে বেশি, তোমায় নাকাল করতে চায় কথায কথায়।

যাবে বৈকি তড়িৎ। যাবে নিশ্চয়, এবার মিটিয়ে ফেলবে সেই ভ্রান্তির বিলাস, ভ্রান্তির বেদনা। এতবড একটা সুযোগ!

কিন্তু হবে কি সম্ভব মিটিয়ে ফেলা?

মনে পড়ে বর্ষার অশ্রুতে ভবা প্রথমদিনের সেই রাগিণী 'দেশ'। কে মুছে দেবে সে অশ্রু? সে তো শাশ্বতই হয়ে রইল জীবনে।

রতি পারবে কি?…বড ভালো মেয়েই তো রতি।